ঋত্বিক

সুরমা ঘটক

ঋত্বিক
সুরমা ঘটক

ঋ ত্বি ক

ঋত্বিক

সুরমা ঘটক

অনুষ্টুপ
২ই নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

অনুমতি ব্যতিরেকে এই বই-এর কোনো অংশের মুদ্রণ ও
পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপিকরণ আইন অনুযায়ী করা যাবে না।

Ritwik : An Autobiography of Ritwik
by
Surama Ghatak

© সুরমা ঘটক

প্রচ্ছদ : হিরণ মিত্র।। প্রচ্ছদের আলোকচিত্র শ্রীসত্য সেন
অনুষ্টুপ সংস্করণ : বইমেলা ১৪০২
অনুষ্টুপ দ্বিতীয় সংস্করণ : বইমেলা ১৪১০
অনুষ্টুপ তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ : ১৪১৬
প্রকাশক : অনিল আচার্য
অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯
বর্ণবিন্যাস : কমল পাঁজা, অনুষ্টুপ
মুদ্রণ : বেঙ্গল ফটোটাইপ কোম্পানি
৪৬/১ রাজা রামমোহন সরনী, কলকাতা-৯

মূল্য : ১৫০ টাকা

ISBN : 978-81-85479-55-0

উৎসর্গ

দেশের যুবশক্তিকে

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'ঋত্বিক' বইটির প্রকাশক ছিলেন 'আশা প্রকাশনী'। এই আশা প্রকাশনী বন্ধ হয়ে গেছে। এরপরে বহু বছর পেরিয়ে গেছে। 'ঋত্বিক' বইটির জন্য অনেকে আমার কাছে আসেন, এখনও পাঠক বইটি সম্পর্কে আগ্রহী।

'*ঋত্বিক, পদ্মা থেকে তিতাস*' বইটি প্রকাশ করবার পর 'অনুষ্টুপ প্রকাশনী আবার 'ঋত্বিক' বইটি প্রকাশ করছেন, আমি এজন্য কৃতজ্ঞ ও শ্রীঅনিল আচার্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ঋত্বিককুমার ঘটক আঠাশ-ঊনত্রিশ বছর বয়সে On Cultural Front-এর ওপরে একটি thesis লিখেছিলেন। পার্টি যখন কমিশন বসিয়ে চার্জ এনেছিলেন, তখনই আমার সামনে বসে লেখা। লেখাটি বহু খুঁজেও আমরা এতদিন পাইনি। কয়েক বছর আগে শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেন, তিন জনের সই করা দলিলটি তাঁর কাছে আছে। সম্প্রতি দলিলটি আনুষ্ঠানিকভাবে দেওয়ার পর দেখলাম, এতে সই আছে—

Ritwik Ghatak, Pit 2, Ballygunge Local Committee.

Surama Bhattacharya.

Mumtaz Ahmed Khan.

আমরা তখন বালিগঞ্জ লোকাল কমিটির অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমি গর্বিত, এই ঐতিহাসিক দলিলে আমারও সই ছিল। পার্টির উচ্চ থেকে উচ্চতম সব কমিটিতে দলিলটি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তখন কোনও আলোচনা হয়নি।

সময়মতো দলিলটি প্রকাশ করা হবে। ইতিহাসের অগ্রগতির বাঁকে যেদিন প্রমাণিত হবে 'সংস্কৃতির জন্যই সব' ঋত্বিককুমার বলে গিয়েছিলেন, সেদিন বোঝা যাবে সুস্থ সংস্কৃতিই সবকিছুকে বাঁচাতে পারে। ওই দিনের জন্য আবার বইটি উৎসর্গ করলাম।

১.১.৯৬ সুরমা ঘটক

সাউথ ব্লক, ফ্ল্যাট ১
সি, আই, টি হাউসিং কমপ্লেক্স
৩৩/৩৩/১, চেতলা সেন্ট্রাল রোড
কলকাতা-৭০০ ০২৭, দূরভাষ : ২৪৭৯-৬৯৪২

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে আমার শিলং জেলের ডায়েরি থেকে চোর, খুনি পাগলি ও গণিকা মেয়েদের কথা লিপিবদ্ধ করছিলাম। তখন একদিন সিরাজ আমাকে বার বার বলেছিল, 'বউদি, ঋত্বিকদা সম্বন্ধে লিখুন।' আমি বলেছিলাম লিখব পরে।

ছোটবেলা থেকেই আমার সমস্ত কাগজপত্র গুছিয়ে রাখা অভ্যেস। আমার বাবার কাগজপত্রও গুছিয়ে রাখতাম। গত একুশ বছরের প্রায় প্রতিটি চিঠি ও কাগজপত্র আমার কাছে আছে। ভেবেছিলাম পরে একদিন এই সবকিছুর ভিত্তিতে গুছিয়ে লিখব।...তখন কি জানতাম এত তাড়াতাড়ি লিখবার সময় আসবে? আর যাঁর মনে প্রথম থেকেই খুব ইচ্ছে ছিল আমি লিখি, তাঁর সম্বন্ধে লিখেই আমার জীবনের প্রথম লেখা প্রকাশ হবে, কোনওদিনও ভাবিনি।

১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে 'চিত্রবীক্ষণে'র প্রতিনিধিরা সাঁইথিয়া গিয়েছিলেন। তখন 'চিত্রবীক্ষণ' ঋত্বিকসংখ্যার জন্য আমার যা যা দেওয়া সম্ভব সবই দিয়েছিলাম। 'নাগরিক'-এর গল্পাংশ, স্টিল, পোস্টার ইত্যাদি। 'কত অজানারে'র স্টিল, 'দলিল' নাটকের ছবি ও আরও বহু ছবি। তা ছাড়া কয়েকটি মূল্যবান চিঠিপত্র—যেমন ফিল্মিস্তানের শশধর মুখার্জিকে লেখা চিঠি, পুণার প্রিন্সিপালকে লেখা চিঠি, পুণায় বসে লেখা ছাত্রদের জন্য পুরো ডিরেকশনের কোর্স, পাঁচটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধ, 'ঠাকুরমার ঝুলি' থেকে লেখা Princess Kalabati-র সিনোপসিস, সেই 'বিষ্ণুপ্রিয়া'র সিনোপসিস ইত্যাদি। এরপর ওদের বিশেষ অনুরোধে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমার স্মৃতিচারণাটি লিখেছিলাম। একটি প্রবন্ধের মধ্যে এর বেশি লেখা সম্ভব নয়। ভেবেছিলাম পরে একদিন বিস্তৃতভাবে লিখব।

অকস্মাৎ গত বছর গ্রীষ্মের ছুটির শেষে 'আশা প্রকাশনী'র তরফ থেকে বিস্তৃত লেখার অনুরোধ বিশেষভাবে এল। এত তাড়াতাড়ি লেখার কথা আমি তখন ভাবিনি। কিন্তু বিশেষ অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তাঁদের কথা দিলাম। সুবীরবাবুর [সুবীর ভট্টাচার্য] চিঠি পেলাম : 'আপনি কথা দেওয়ার জন্য আমরা সম্মানিত বোধ করছি।'

এরপর প্রায় একটি বছর অতিবাহিত হতে চলেছে। এই একটি বছর আমি শয়নে স্বপনে, দিন রাত্রে, সময় পেলে, সময় না পেলে নিরবচ্ছিন্নভাবে

একটি চিন্তাই করে যাচ্ছি। আমার মন একটি মুহূর্ত এই চিন্তা থেকে বিরত থাকেনি।

লেখবার আগে বার বারই মনে হয়েছে আমার তো কিছু লিখবার প্রশ্ন আসে না। জ্ঞানীগুণীরাই লিখবেন ও বলবেন। আমি শুধু যে-সমস্ত কাগজপত্র আমার কাছে আছে ও যে-সমস্ত তথ্য ও ঘটনাবলী আমি জানি তারই ভিত্তিতে তাঁর চিন্তাধারার পরিচয় ও সামগ্রিক জীবনের পরিচয় দিতে পারি। তাই সমস্ত চিঠিপত্র, প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার প্রভৃতি থেকে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করে আমি একটি গ্রন্থনা লেখার চেষ্টা করেছি। অনেক ভেবেই লেখার এই মাধ্যমটি নিয়েছি। কারণ নিজের বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গি যেভাবে নিজের লেখা প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার ইত্যাদিতে প্রকাশ পেয়েছে, তা আমি নিজের ভাষায় লিখে সব ব্যক্ত করতে পারতাম না। যে-মানুষটির চিন্তাশক্তি ও দার্শনিক গভীরতা দেখে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলাম; তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কীভাবে সৃষ্টি করে গেছেন; আমার লেখার বিষয়বস্তু এইটাই। এটা শুধু জীবনী বা শুধুমাত্র একটি স্মৃতিচারণ নয়।

আমার সাঁইথিয়ার ছোট্ট বাসাটির একা ঘরে বসে যখনই সময় পেয়েছি লিখেছি। ছেলেমেয়েরা কেউ কাছে নেই। পড়াশোনার জন্য কলকাতায় ও শান্তিনিকেতনে আছে। এই একটি বছরের প্রতিটি মুহূর্ত আমাকে একটি চিন্তাই আচ্ছন্ন করে আছে। আর লিখতে লিখতে মনে হয়েছে, যাঁর সম্বন্ধে লিখছি তাঁর শুভেচ্ছা ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা আমাকে সব সময় ঘিরে আছে।

'আশা প্রকাশনী'র অনুরোধ রক্ষা করতে কতটুকু সফল হয়েছি জানি না, তবে চেষ্টার ত্রুটি করিনি। লিখবার সময় 'চিত্রবীক্ষণ' ঋত্বিক সংখ্যা থেকে অনেক উদ্ধৃতি সংগ্রহে সাহায্য পেয়েছি। আমার কাছে অনেক প্রবন্ধ ইত্যাদি থাকলেও সব নেই।

'চিত্রবীক্ষণ' ঋত্বিক সংখ্যায় লেখা আমার স্মৃতিচারণটি আমার লেখার শেষে দিলাম। এতে একটি সামগ্রিক কাজকর্মের পরিচয় আছে। তা ছাড়া এটি আমার প্রথম অনুভূতি দিয়ে লেখা। পরিশিষ্টে কিছু অপ্রকাশিত রচনা দিলাম।

'স্পন্দন'-এর সম্পাদক সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়রা এসে মাঝে মাঝে শুনে গেছেন। প্রত্যেকেরই অনুরোধ ঃ 'বউদি, শেষ করুন।' শেষ পর্যন্ত একদিন লেখাটি শেষ করতে পারলাম।

লেখা শেষ হবার পর পাণ্ডুলিপিটি কবি শঙ্খ ঘোষ অনেকটাই পড়ে দিয়েছেন এবং বইটির নামকরণ করে দিয়েছেন, আমি কৃতজ্ঞ।

আমাকে চাকরির জন্য কলকাতা থেকে অনেক দূরে সাঁইথিয়ায় থাকতে হয়। তাই পাণ্ডুলিপিটি দেবার পর মুদ্রণ চলাকালীন বইটির কিছুই দেখতে পারিনি। ফলে, মুদ্রণে ত্রুটি-বিচ্যুতি বা সাফল্যের পরিপূর্ণ দায়িত্ব প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের। এ ব্যাপারে তাঁরা আমার ধন্যবাদার্হ।

সুরমা ঘটক

২৪ জুন, ১৯৭৭

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথম সংস্করণ

এই বই অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ছাপতে হয়েছে। ব্যাপক লোড শেডিংয়ের মধ্যেও বইটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হতে পারল তার জন্য দে প্রিন্টার্সের দিলীপ দে এবং তাঁর সহকর্মীদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। নিজের সমস্ত কাজ ফেলে রেখে দিনরাত প্রেসে বসে থেকে প্রুফ দেখে দিয়েছেন (৫ম ফর্মা থেকে) শ্রীঅরুণ সেন।

শ্রীশঙ্খ ঘোষ, অজয় গুপ্ত, মহেন্দ্র কুমার, উৎপল সেনগুপ্ত ('চিত্রভাষ' পত্রিকা) দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিত এবং সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শ ও সহযোগিতা ব্যতীত এই বই ছেপে বের হতে পারত না। তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ।

বিনীত

মহালয়া, ১৩৮৪ — শীলা ভট্টাচার্য

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

দ্বিতীয় অনুষ্টুপ সংস্করণ

ঋত্বিক বইটির সংস্করণ অল্প সময়ের মধ্যে খুব দ্রুততার মধ্যেই প্রকাশ করা হল। মুদ্রণ সৌকর্যবিধানে সহায়তা করেছেন শ্রীসুবিমল লাহিড়ী, তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছেন শিল্পী শ্রীহিরণ মিত্র। তাঁকেও জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

বইমেলা ১৪০২ অনিল আচার্য

তৃতীয় অনুষ্টুপ সংস্করণ

'ঋত্বিক' তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হল। ঋত্বিকের মত ব্যক্তিত্বরা আজ বিরল ব্যক্তিত্ব বলেই বোধহয় যত দিন যাচ্ছে নতুন প্রজন্মও তাঁকে জানতে চাইছে। না হলে তৃতীয় সংস্করণ, তা সংখ্যার হিসেবে খুব বিশাল না হলে কীভাবে প্রকাশিত হতে পারে! অনুষ্টুপ আদর্শ ও আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ছাপাছাপির জগতে এসেছে। যেমন এসেছিলেন ঋত্বিক। এঁরাই আমাদের আদর্শ।

'ঋত্বিক তৃতীয় অনুষ্টুপ সংস্করণ সেই সব পাঠকের উদ্দেশে নিবেদন করছি। কারণ তাঁরাই যেমন বাঁচিয়ে রেখেছেন ঋত্বিককে, তেমনই বেঁচে আছি আমরাও।

অনিল আচার্য
৩০.১১.২০০৯

"প্রাচীন"

শ্রীঋত্বিককুমার ঘটক

দশই অক্টোবর, উনিশশো বাষট্টি

কলকাতা

১. খোকার চরিত্র। জামচুরী। কাশীনাথ।
ছোটবোন। খুকী। তার চরিত্র।
বাড়ী এল। খবরের কাগজে aushluss...এবং...Munich
বাবা-মা। বাড়ীটা। পদ্মা। গ্রাম্য শহর।
বড়দা এল। খোকাকে নিয়ে যাবে। কারণ Crisis.
বাবা-মা অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হলেন।
খোকা এবং খুকী। খোকা এবং বাবা-মা।
খোকা যাবে।

২. কলকাতায় গিয়ে খোকার কী অবস্থা।
বৌদি। দাদা Drunkard. কল্লোল। ৩০'-এর যুগটা।
বাচ্চাগুলো। খোকা একটা বদমাইশ।
Poland. Danzig. Polish Corridor.
বাড়ীর পাশের মোটর কোম্পানীর সায়েবরা গ্রেপ্তার।

৩. খোকা বদমাইশীর চূড়ান্তে উঠেছে। ইস্কুল যায় না।
Old Ballygaunje-এর মাঠে খচ্চরদের ভ্রমণ আর
গাছের কোটর। বিড়ী খেতে শেখা। বৌদি। অন্য দুজন
দাদা। তাদের চরিত্র।
ভারতবর্ষ যুদ্ধে যোগ দিয়েছে।
বোন আর বাবা-মাকে বাড়াও।
Emotional Scene-এ শেষ কর।

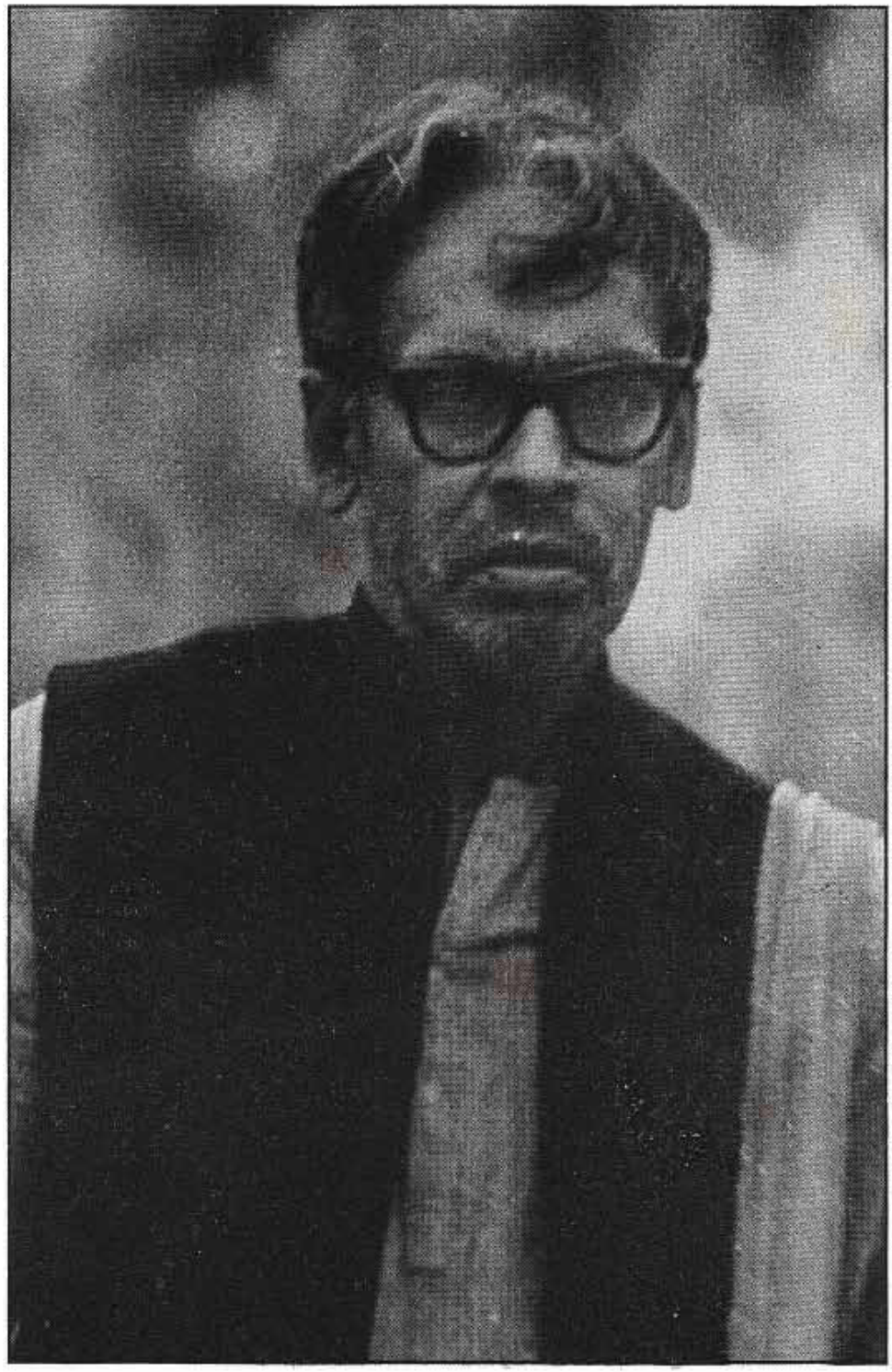

ঋত্বিক : যুক্তি তক্কো গপ্পো

ঋত্বিক : যুক্তি তক্কো গপ্পো

ঋত্বিক : ডক্যুমেন্টারি , সিভিল ডিফেন্স

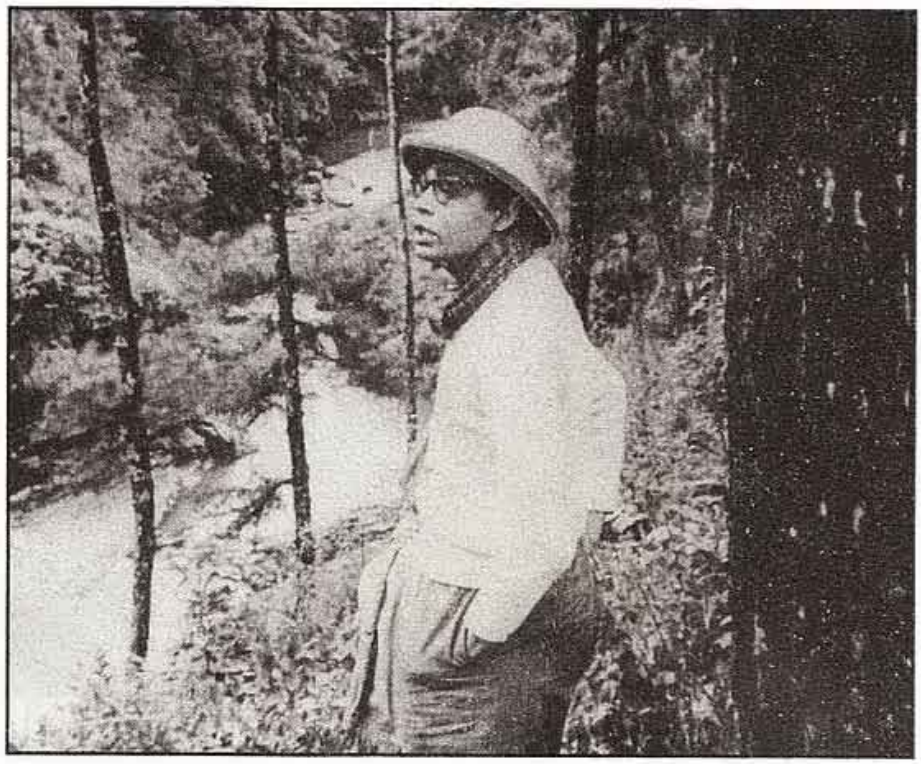

মেঘে ঢাকা তারার স্যুটিংএ : শিলংএ

কত অজানারে : উৎপল দত্ত ও ঋত্বিক

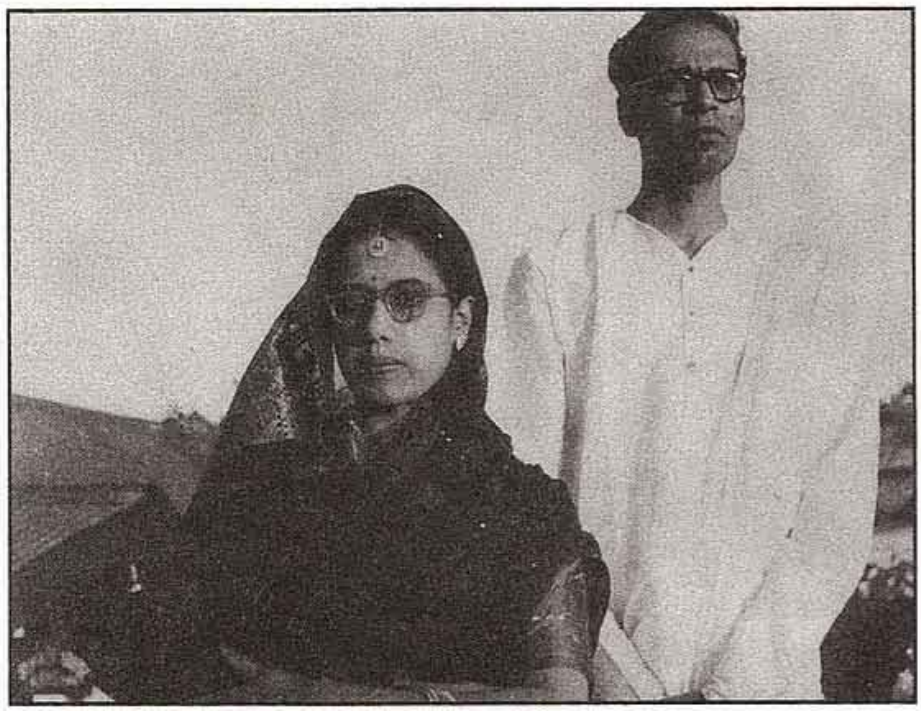

ঋত্বিক ও সুরমা, বিয়ের পরে

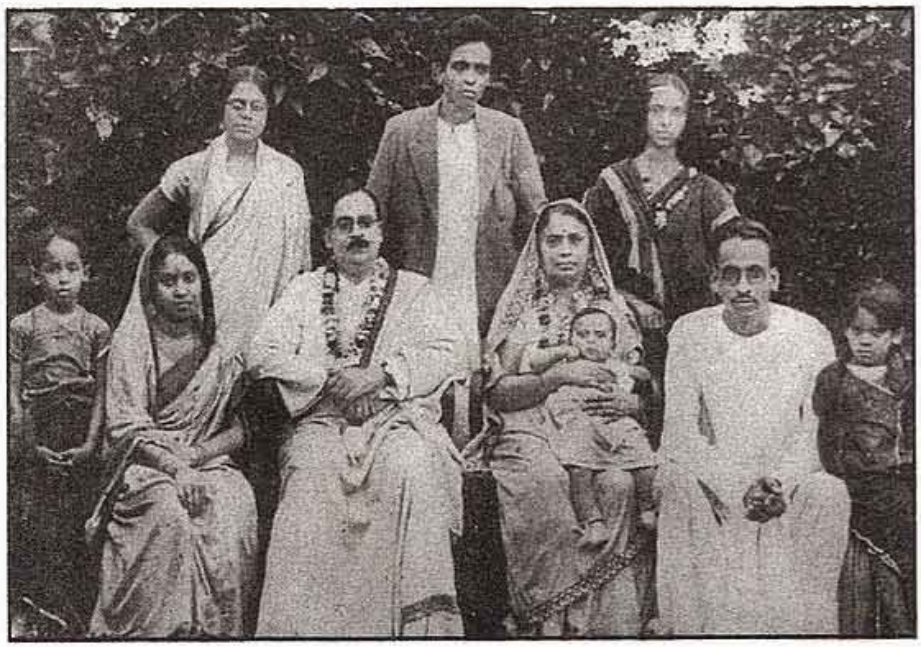

ঋত্বিকের মা, বাবা ও পরিবার

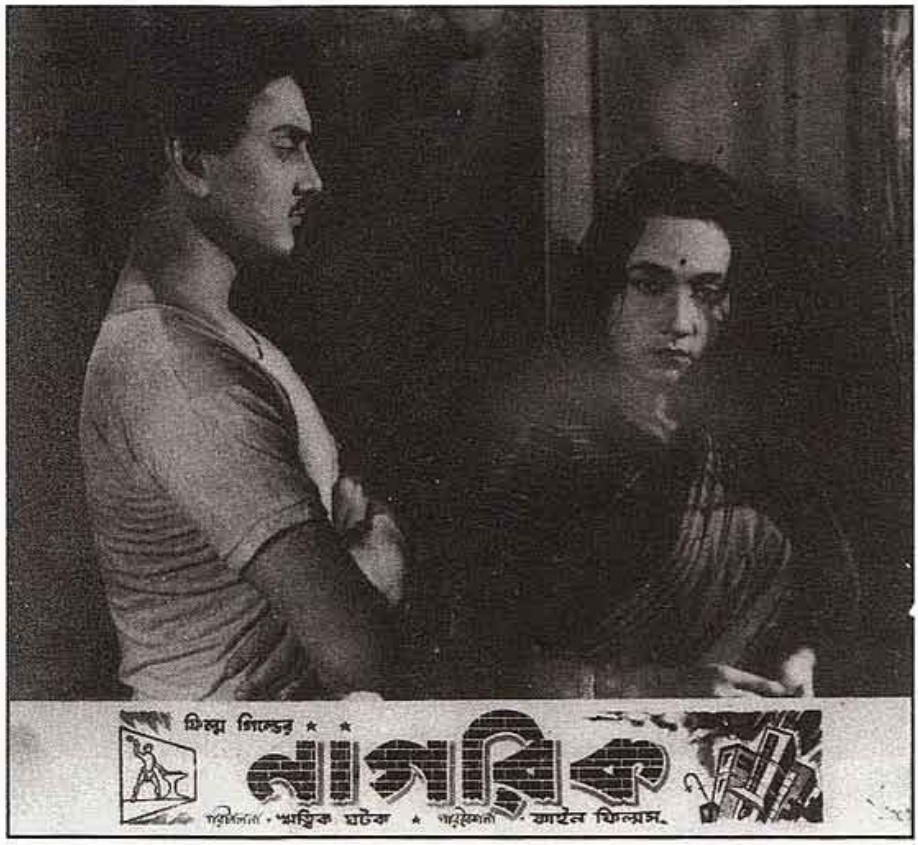

বাহাদুর খাঁর কাছে সরোদ শিখতেন

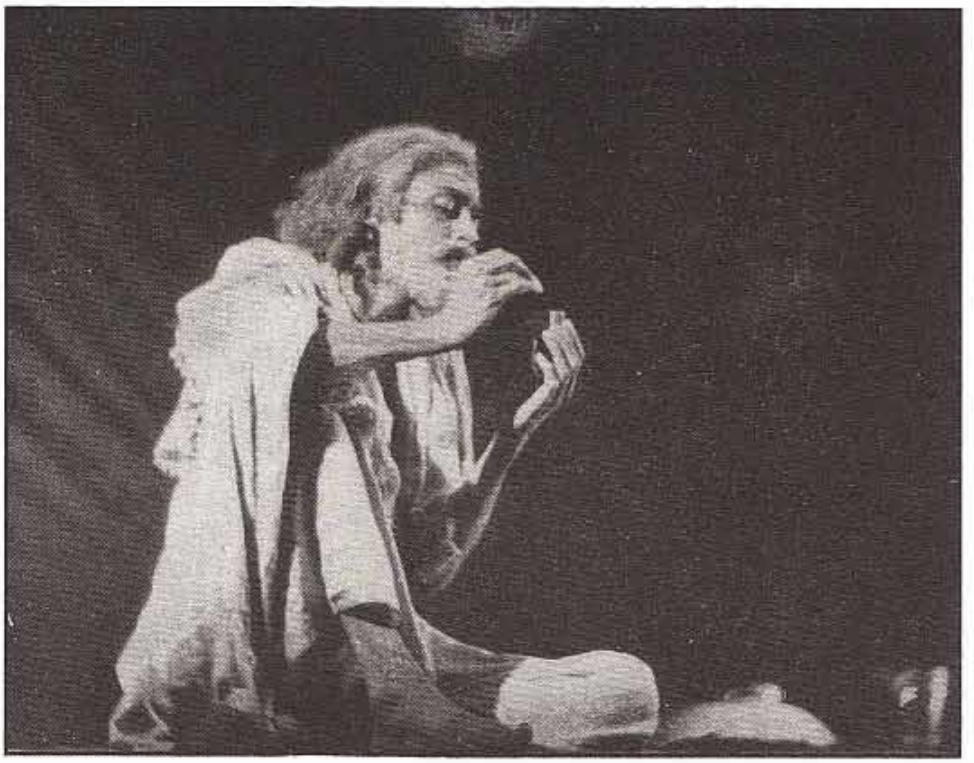

'দলিল' নাটকে ঋত্বিক

ঋত্বিক ঘটক ও সুরমা দেবী

ভাই ও বোনেদের সাথে ঋত্বিক

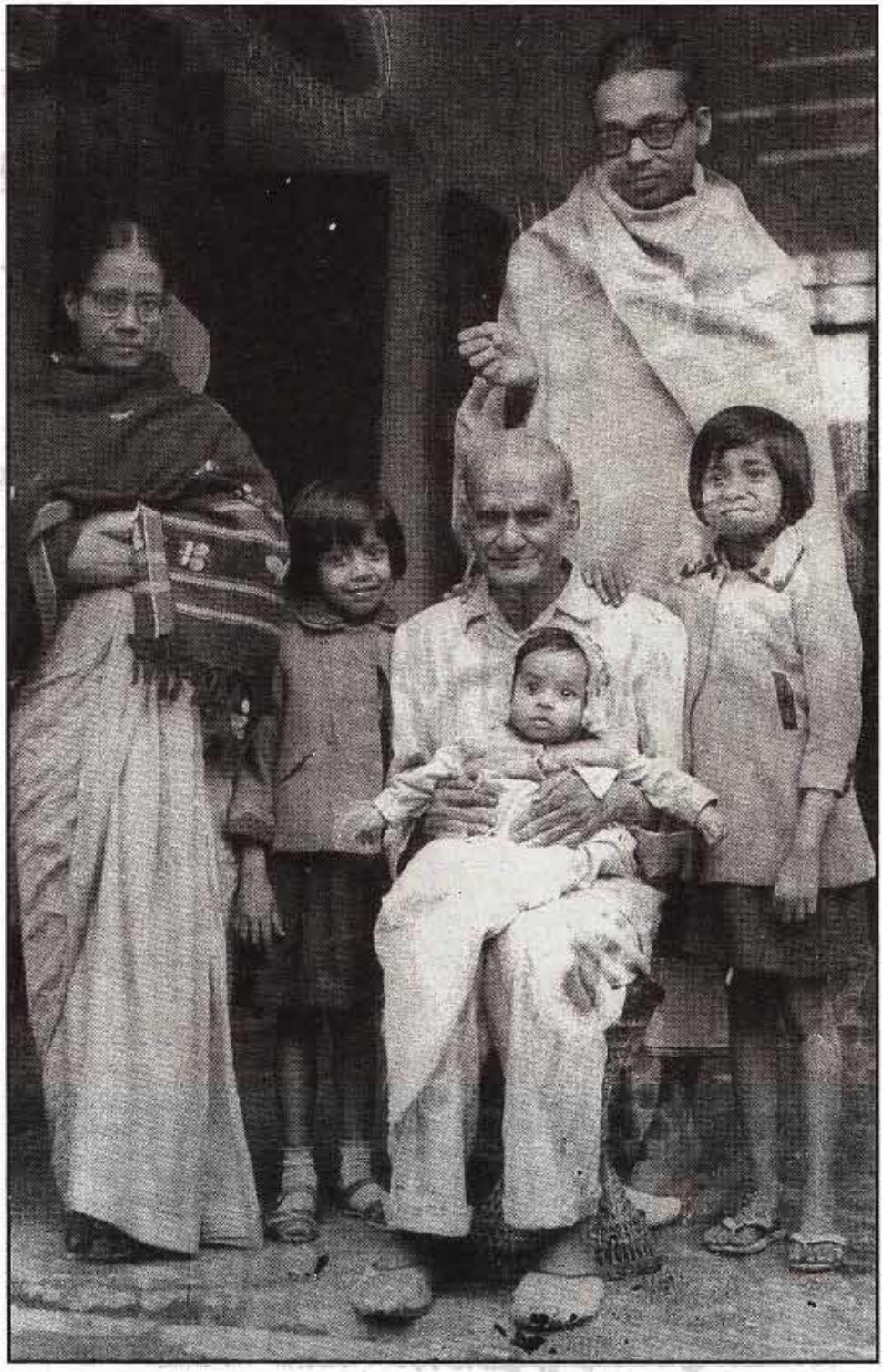

ঋত্বিক ও পরিবার বর্গ

নিজের জীবন নিয়ে একটি বড় উপন্যাস লিখবার এই ছক। শুধু সূত্রগুলোই লেখা। উপন্যাসটি শেষ হলে আমরা বাল্য ও কৈশোর বয়সের একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি পেতাম। একদিন ভবানীপুরের বাসায় সন্ধ্যার সময় এটা লেখার সঙ্গে সঙ্গে কাগজটি তুলে রেখেছিলাম। আজ আমার লেখা শুরু হল এই কাগজটি দিয়েই।

এবারে উল্লেখ করছি একটি প্রবন্ধের। প্রবন্ধটির নাম 'কিছু খণ্ড চিন্তা কিংবা কিছু উপলব্ধি'।*

আজ এত বছর পরে আশ্চর্যভাবে একটি ছেঁড়া, বিবর্ণ কাগজে প্রবন্ধটির আর একটু অংশ পেয়েছি। ওই সাধুভাষায় লেখা অসমাপ্ত প্রবন্ধ ও পরে পাওয়া শেষ অংশটুকু আজ একসঙ্গে মিলিয়ে দেখছি। লেখাটির মধ্যে মানুষটির জীবনের মূল সুর, চিন্তা, বাল্য ও কৈশোরের জীবন বড় সহজ ও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

<u>কিছু খন্ড চিন্তা কিংবা কিছু উপলব্ধি</u>

'—আচ্ছা নিজের জমির উপর না দাঁড়াইয়া কিছু করা যায় কি? কিছু সত্যিকারের গভীরকে ছোঁয়া সম্ভব?

আমি জানি না, হয়তো শেষ বয়সে বহু পোড় খাইয়া, বহু মারের মধ্য দিয়া উত্তরণ হয়তো সম্ভব। কিন্তু আমার তো সে স্তর আসে নাই; সে স্তরে পৌঁছানো কোনদিন হইয়া উঠিবে কিনা, সে বিষয়েই আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। কিন্তু সৃষ্টিকর্মের গোড়ার ধাপে, কাজ করিতে আরম্ভ করার

---

*প্রবন্ধটি 'ছবি করা' নামে 'চিত্রবীক্ষণে'র ঋত্বিক সংখ্যার বেরিয়েছিল। এবং প্রবন্ধটি প্রকাশের উল্লেখ আছে অমৃত, ক্রীড়া বিনোদন সংখ্যায়, ১৯৬৯।

ওই সালে (১৯৬৯-এ) উনি মেন্টাল হসপিটালে ছিলেন। জানি না প্রবন্ধটি 'অমৃত' পত্রিকা গোষ্ঠী কোথা থেকে পেয়েছিলেন। প্রবন্ধটি সাধু ভাষায় ছিল। প্রবন্ধটি আমার কাছে খুবই উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছিল। তাই যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম। প্রবন্ধটি আর শেষ করা হয়নি। পরে শেষ করার ইচ্ছা ছিল। বানান ও ভাষার কোনো পরিবর্তন করিনি।

সঙ্গে সঙ্গে পিছনের খোরাক যাহার দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে, সে কি করিবে? আমি বলিতেছি দেশভাগের কথা। আমি পূর্ববাংলার ছেলে। খুব সামান্য কিছু লোকের আমার কাজ ভাল লাগে। তবু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, ঋত্বিক ঘটকের বর্তমানের বা অল্পকাল অতীতের সঙ্গে বুঝি বা সামান্যভাবে ভবিষ্যতের সঙ্গে, একটা যোগগোছের [আছে] বলিয়া মধ্যে মধ্যে মনে হয়। কিন্তু সত্যকারের অতীত নাই, ঐতিহ্য নাই।

কথাটা বড় লাগে। অতীতবিহীন নিরালম্ব বায়ুভূত কাজ কাজই নহে। কিন্তু আমার অতীত আমাকে কে আনিয়া দিবে?

আছে, যোগ আছে। ছোঁয়া আছে গল্প আছে, টুকরা টুকরা ছবি আছে। তাহার অনেকটাই হয়তো ভুল, আমার মনগড়া। কিন্তু মন গড়িয়াই তো আমার শিল্প। ফোটোগ্রাফির সত্য তো আমার ঠিকাদারির মধ্যে পড়ে না।

...আমার দিন কাটিয়াছে পদ্মার ধারে, একটি দুঁদে ছেলের দিন। গহনার নৌকার মানুষদের দেখিয়াছি, যেন অন্য গ্রহের বাসিন্দা। মহাজনী হাজার-দু'হাজার মনী ভাড়া করিয়া পাটনা-বাঁকীপুর-মুঙ্গের অঞ্চলের মাল্লারা পার হইয়া যাইত, একজাতীয় ভাঙা দেহাতী আর পদ্মাপারী বাংলার টান মাখানো কথা বলিয়া। জেলেদের দেখিয়াছি, ইলসা গুঁড়ির প্রথম বর্ষায় বেজায় খুসী হইয়া বেসুরা টান মারিত, জলমাখানো হাওয়াতে দমকায় দমকায় ভাসিয়া আসিত কেমন অস্পষ্ট মন কেমন-করা পাগল সুর। স্টীমারে শুইয়া রাত্রে দোল খাইয়াছি মাতাল নদীর দাপটে, আর শুনিয়াছি এঞ্জিনের ধস্-ধস্, সারেঙ্গের ঘণ্টি, খালাসীর বাঁও না মেলা আর্তনাদ।

পদ্মায় শরতে নৌকা লইয়া পালাইতে গিয়া একবার ঢুকিয়া আর বাহির হইতে পারি না—তিনমাথা সমান উঁচু কাশবন হইয়াছে কাতলামারীর চরটার কাছে, ভীষণ সাপ থাকে ওখানে। নৌকা দুলাইয়া দুলাইয়া চেষ্টা করিতে যাইয়া সেই ডাকাতিয়া কাশের ঝোপের সাদা রেণু উড়িয়া উড়িয়া দেহমন আচ্ছন্ন করিয়া নিঃশ্বাস প্রায় আটকাইয়া দিয়াছিল। কাশগুলি পাকা ছিল। একবার সিন্ধু-গৌরবের রাজা জাহিরের পার্টের জন্য হায়ার (hired) হইয়া গিয়া ট্রেন ফেল করিয়া সন্ধ্যেবেলা পৌছিয়াছি অপরিচিত রেলস্টেশনের লাইনের লাল আলোয় রহস্যময় পাড়াগাঁয়ে। সামনের হাওরবিল ডাকসাইটে

ভূতের জায়গা, কোজাগরীর আগের রাত্রে সেই আবছা বিলে দুই বন্ধু মিলিয়া সারারাত লগি ঠেলিয়াছি, দিগন্তলীন বিলে মাঝে মাঝে জাগিয়া আছে দ্বীপের মত গ্রাম। নীহার পড়িতেছে, কাঁপিতেছি, শেষে বোঝা গেল, আমাদের ধন্দ লাগিয়াছে। দুঘন্টার পথ সারারাত্রে পার হইতে পারিতেছি না, পাক খাইতেছি। সেই শেষ রাত্রে দাঁতে দাঁত লাগা হিমে সে এক অদ্ভুত হতাশার অনুভূতি।...

...মা-বাবা দাদা-দিদি, অনেক মানুষ। হৈ হৈ করিয়া বহুজনা মিলিয়া ভাত খাওয়া, দুগ্‌গাপূজা, মুসলমান চাষাদের সেই বাঁপায়ে পিতলের মল পরিয়া শারী গান, ডানপিটা সব বন্ধু। মারপিট। আম-লিচু-ডাবচুরি। পড়িয়া পা ভাঙিয়া যাওয়া, ধরা পড়িয়া মার খাওয়া। বাড়ীর দেওয়ালে নোনা ধরিয়া কত দাগ। কত শব্দ, ছবি, কত মন।

একটা জীবনপ্রণালী, মানুষের এক বিচিত্র প্রবাহ। আর নাই। যদি থাকিত। ...দাঁড়াইতে পারিতাম তাহার উপরে, বলিতে পারিতাম কিছু। এমনভাবে সব কিছুকে বিকৃতমন লইয়া দেখিতাম না। ভবিষ্যৎকে এত ভয় করিতাম না, দেশের এবং মানুষের ভবিষ্যৎকে।

এগুলা প্রাণময়, এগুলা উদ্দাম। কিন্তু এই তো আমার আছে। আমি যদি লিখিতে পারিতাম, কবি হইতাম, চিত্রকর হইতাম, হয়তো এগুলো হইতে জারাইয়া লইয়া বাড়িতে পারিতাম। কিন্তু আমি যে ছবি তুলি। আমার মত আর কেউ হারায় নাই। যাহা দেখিয়াছি, তাহা দেখাইতে পারিতেছি না।

কে চায় দুঃখ? জীবন দুঃখ নহে। জীবন বীরত্ব। এপারে কি নাই? আছে, দেখিয়াছি, পূজা করিয়াছি। কিন্তু আমি ছোটবেলার সেই রূপকথা— চোখে দেখিতে পাইতেছি না। সেটি হারাইয়াছি। সেটি না থাকিলে তো বাস্তব হইতে নূতন রূপকথা তৈরী করিতে পারা আমার সাধ্য নাই। এখন যুক্তি হইবে, ট্রাজেডি হইবে, কমেডি হইবে, বয়ঃপ্রাপ্তদের খণ্ডাংশ শিল্প হইবে। যদি অবশ্য অত অবধিও পৌঁছাইতে পারি।

কিন্তু রূপকথা, সরল রূপকথা, যাহা দেখিলে যুক্তি চুপ, বড় বড় থিয়োরী মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করে, ছোট ছোট ডানপিটের দল রুদ্ধশ্বাস

গল্পের জন্য চাগাড় দিয়া উঠিয়া বসে,—তাহা কোথায়? আমার চৌহদ্দির মধ্যে নাই।

আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা এইটাই। কাজ আরম্ভ করার পূর্বেই আমি সীমিত হইয়া গেছি।

কারণ, সেই নিসর্গ এখানে পাইব না। ও-মুখের আদল, ও-কথা বলার ঢংটি, এখানে নাই। দুনিয়ার লোকের কাছে ঐ বলিয়া চালাইয়া দেওয়া যায়, এমন কিছু হয়তো সাজাইয়া গুছাইয়া দাঁড় করানো যায়। কিন্তু বায়োস্কোপ বড় সত্যবাদী। উহাতে চিড়া ভিজিবে না। যাহার জন্য করা, সেই রূপকথাটিই হারাইব।

আমার এই কথাগুলি হইতে কেহ যদি মনে করেন, বীরভূমের হু-হু উধাও খোয়াই, মেদিনীপুরের ছোট ছোট নদী আর গঞ্জ, কি চব্বিশ পরগনার ক্ষয়িষ্ণু ভাঙাভাঙা ইমারতওয়ালা গ্রাম, ইহাদের বক্তব্য পৌঁছায় নাই আমার কাছে, তাহা হইলে অবিচার হয়। আমার শুধু নিবেদন এই, ইহারা আমার আদি যুগের অংশ নহে। আমার অতীতে মগ্ন হওয়া হইয়া উঠিতেছে না কতকগুলি নিষ্ঠুর কারণে। এপারে যাহার শৈশব কাটিয়াছে, সে আমার দেশে যাইলে কোথায় পাইবে সেই মায়ার যাদু, যাহাতে কলি ফুটিবে?

তাই বলি, আমার উত্তর পুরুষের চোখ দিয়া যখন দেখিতে পাইব, তখন নতুন সংযোগ ঘটিবে, নতুন উত্তরণ।

আমার ছবি করার পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা এইটাই। কারণ, আমার মনের মধ্যে বায়োস্কোপের একটি মান ঠিক হইয়া আছে, যাহাতে এই মসলাটাই লাগে বেশী।

আমি অনুভব করি, এই প্রথম ধাপটি পাইলে ক্রমে ক্রমে ছড়াইয়া গিয়া দেশ-বিদেশ মহাদেশকে আলিঙ্গন করার সূত্রটি পাইতাম। এমন অসুস্থভাবে প্রাথমিক চেতনাটি ভূতের বোঝা হইত না আমার ঘাড়ে।

আমি সত্যই নিরালম্ব।

২

আর এক মুস্কিল আমার বলার ভঙ্গীটি লইয়া। আমার বিদ্যাসাগরের ভঙ্গী বড় ভাল লাগে। এব্রাহাম লিঙ্কনের লেখা আমার সামনে আদর্শ খাড়া

করিয়া ধরে। বাইবেলের ইংরাজী আমাকে ধ্যানস্থ করে। উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টার তীব্রতা আচ্ছন্ন করিয়া উত্তীর্ণ করে এক আনন্দময় জগতে। যাহার জন্য হেমিংওয়ের *Old Man and the Sea* বহু আপত্তি সত্ত্বেও নাড়া দেয় গভীরে।

ছবিতে করেন Flaherty। করেন Basil Wright তাঁহার Song of Ceylon -এ। Eisenstein আশ্চর্যভাবে জায়গায় জায়গায় General Line-এ তাহাই করেন।

বেশী ছবি আমি দেখি নাই। এ দেশে বসিয়া তেমন বায়োস্কোপ দেখার সৌভাগ্য হয় নাই। বেশী যে পড়িয়াছি, তাহাও নহে। তবু এই একটা আদর্শ কেমন করিয়া জানি না আমার সম্মুখে ধীরে ধীরে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঈশোপনিষদ, কঠোপনিষদ যেমন।

একটি ভাষা, যাহা কম বলিবে। যাহা স্বয়ং দ্যোতনাময়। যাহার allusion-এর ভার নাই, পরিপূর্ণ ধার আছে। যাহা Reference-এ ভারাক্রান্ত করে না, অথচ মনে পড়াইয়া দেয়—কারণ ছোঁয়ায় ছোঁয়ায় যে অনুভূতি আর যে চিত্রকল্প, তাহারা Archetypal! যে ভাষা সমস্ত mood-কে একটি Patriarcal ভঙ্গীতে ধরাইয়া দিবে। আপাত শুষ্ক, ভিতরে মালদহের কালাচাঁদ ভোগ আমটি একেবারে টইটম্বুর।

তেমন ভাষাটি কিন্তু আছে। খুঁজিয়া পাইতেছি না, কি সব আজে-বাজে করিতেছি।... বায়োস্কোপে ঐ ভাষায় কথা বলা প্রয়োজন। য়ুরোপ পারিবে না, এ যুগে। আমরা পারিব, যদি খুঁজি।

...এটুকু বুঝি, এ ভাষা জন্মাইতে পারে শুভ্র উত্তাপময় প্রেরণা হইতে। সে প্রেরণা, মনে হয়, পেশাদার বায়োস্কোপের লোকের দ্বারা হইবে না। অর্থাৎ আমরা যাহারা একটির পর একটি ছবি করিয়া যাইতেছি। এ ভাষা বোধ হয় জন্মায়, যে রোজ করে না, তাহার চেতনায়। জীবনে খুব প্রয়োজন না হইলে যে মুখ খুলে না। যে মুখ খোলে একমাত্র জীবনমরণ সমস্যার চাপে পড়িয়া। খুব খানিকটা না রাগিলে, খুব ভাল না বাসিলে, খুব খুসী না হইলে, খুব না কাঁদিলে এ আদিম ভাষা কোথা হইতে উঠিবে? ভাবে থাকা চাই।

আমি সেই একটা দুরাশা করিয়াছি। সেই ভাষাটিকে ধরিবার জন্য প্রাণপাত করিয়া যাইব, এ দেহ দিব। কিন্তু বাধা। ঐ-যে, নিজের জমির উপর পা নাই আমার। অন্যত্র জমি হাসিল করিব কি করিয়া এবং কবে?

কারণ আমাকে যে ফিরিয়া যাইতে হইবে আমার মায়ের গর্ভে, এ ভাষার উৎস-সন্ধানে।*'

৩

এরপরে সেই বিবর্ণ পাতাটি থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

'তারপরে যে চিন্তা আমাকে উদ্বিগ্ন করে, তা হচ্ছে ছবির সার্বজনীন হবার ক্ষমতা নিয়ে। সার্বজনীন মানে, সর্বদেশে একই দ্যোতনায় প্রতিভাত হবার ক্ষমতা বলছি এখানে।

আমি ধরে নিয়েছি, সর্বদেশে কিছু করে লোক আছে যারা সত্যি চায় সত্যি রূপে অবগাহন করতে চায়।**

(1) *Universality of National nuances...whether they are intelligible to other examples. Basic problem of making people understand you. By which nuisance. Despair what is to be done?*

(2) *Political Situation...you are not liked by Lt. [Left] or Rt. [Right] nor by country or international cultural level of film enthusiasts.*

(3) *My Conviction, My Conclusion.*

* * *

লেখাটি পড়ে বুঝতে পারি রূপকথার ছবি শিশু ও কিশোর মনে কোথা থেকে গড়ে উঠেছে। গেরুয়া পাঞ্জাবি পরা মানুষটির সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বহুদিন ওই রূপকথার দেশের বর্ণনা শুনেছি। শ্বশুরবাড়ির দেশে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু পদ্মা, হাওরবিল, কাশবন যেন দেখতে পেয়েছি। আর গল্প শুনেছি রাজশাহী ও পাবনার দেশের বাড়ির।

---

* অসমাপ্ত

** এই অংশটি চলিত ভাষায় লেখা

পাবনার ভারেঙ্গা গ্রামের বাড়িতে দুর্গাপূজা হত। দুর্গাপূজার সময় সবাই বাড়ি আসতেন। গোয়ালন্দ থেকে স্টিমারে যমুনা নদী দিয়ে নদীপথে যেতে হত নতুন ভারেঙ্গা স্টিমার স্টেশনে। সেখান থেকে নৌকো করে যেতে হত গ্রামের বাড়িতে। ওই সময় শরৎকালের প্রকৃতি উদ্ভাসিত হয়ে উঠত আকাশ, মাঠ, নদীর জলে। চারিদিকের অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে দূরে দেখা যেত দেশের বাড়ির গ্রাম। সমস্ত গ্রাম-বাংলার প্রকৃতি দোলা দিয়ে যেত কিশোর মনে, স্বপ্ন জাগাত রূপকথার দেশের। পূজা, বাজনা, আনন্দ, গান ও দাদা-দিদিদের সঙ্গে কেটে যেত ক'টা দিন।

পূজার শেষে বিসর্জনের বাজনা বাজার সঙ্গে প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হত সারি সারি নৌকো করে নদীর জলে। বাড়ি থাকাকালীন কয়টা দিন কিন্তু দুরন্তপনার শেষ নেই। নৌকা এসে গ্রামে লাগামাত্রই লাফ দিয়ে নেমে শুরু হত দুরন্তপনা। অনেক গল্প, অনেক ঘটনা, অনেক চরিত্রের কথা শুনেছি। বহুদিন গল্প শুনেছি, দুর্গাপূজার দিন পুরুতমশাইকে কিছু খাইয়ে একটা ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। পুজার সময় চলে যাচ্ছে—শেষে আমার শ্বশুরমশাই অস্থির হয়ে নিজে পূজায় বসেছেন। আরও যে-কয়েকটি চরিত্রের বর্ণনা বহুবার শুনেছি তার মধ্যে একটি হল 'অযান্ত্রিক' -এর গামলা হাতে পাগল।

দিদির কাছে গল্প শুনেছিলাম—ভবা ও ভবী এই যমজ ভাইবোনের জন্ম হয়েছিল মা'র শেষ বয়সে। মা তখন বেরিবেরিতেও অসুস্থ ছিলেন। ভবার লম্বা চেহারা, চোখ দুটি ধ্যানস্থ—জন্মের পরে কান্না নেই, আর ভবী এত ছোট যে হাতের পাতায় নেওয়া যায়। ডাক্তার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। বহু যত্নে দু'জনকে বাঁচানো ও বড় করা হয়। এরপরেই জন্ম বড়দার বড়মেয়ে খুকু বা মহাশ্বেতার। কাকা ও পিসি থেকে ভাইঝি তিন মাসের ছোট।

দিদির বড়মেয়ের জন্ম এক বছর পরেই। সুতরাং চারটি শিশুকে মানুষ করা হয় একই সঙ্গে। এরপরে বড়দার অন্যান্য ছেলেমেয়ে, দিদি ও ডলিদির ছেলেমেয়েদের একে একে জন্ম হয়।

আর আমার একজন জ্যাঠাশ্বশুরমশাই বোধহয় সন্ন্যাসী হয়ে

গিয়েছিলেন, সুতরাং বড়মা ও দাদা-দিদিরাও ছিলেন। বড়মা'র হাতের দলাখাওয়ার গল্পও শুনেছিলাম।

আমার শ্বশুরমশাইয়ের শেষ কর্মস্থল ছিল ময়মনসিংহ। শৈশবের স্মৃতিজড়িত ময়মনসিংহের গল্প অনেক শুনেছি। বিরাট বাংলো, মা, বাবা, দাদা, দিদিরা, মিলে আনন্দময় জীবন। মাঝে মাঝে পার্টি হত, বাবা ছিলেন একেবারে সাহেব। বেয়ারা, বাবুর্চি রান্না করত। কিন্তু মা'র রান্না ছিল অমৃত, তিনি দিনেরবেলা সমস্ত রান্না নিজে করতেন। বড়দার (মণীশচন্দ্র ঘটক) লেখা 'কনখল' উপন্যাসটিতে—মা, বাবা ও ওই সময়কার পারিবারিক অবস্থা সম্বন্ধে খানিকটা জানা যায়।

ময়মনসিংহের পর বাবা-মা এসে থাকেন রাজশাহীতে। ছোটভাইকে বড়দা কলকাতা নিয়ে আসেন।... আবার দুরন্তপনা শুরু। বড়দা-বড়দি খুবই চিন্তায় পড়লেন। প্রায়ই স্কুলপালানো হত। শেষটায় বড়দি একটি খাতায় বাড়ি থেকে বেরোবার সময় লিখে সই করে দিতেন। স্কুলে হেডমাস্টারমশাই পৌঁছোনোর সময় লিখে সই করতেন, কারণ যে স্কুল পালানোর অসম্ভব ঝোঁক যদি এতে বন্ধ করা যায়। কিন্তু ওই দু'জনের সই জাল করেও বালিগঞ্জ গভর্নমেণ্ট স্কুল থেকে পালানো হত। এই দুর্ধর্ষ কাহিনী বলে কী হাসি! শেষটায় বড়দা কানপুরে নিয়ে গিয়ে টেক্সটাইলে ভরতি করে দেন।

দুরন্ত ছেলেটি এখানে ছিলেন দু'বছর। খুব আর্থিক দুর্গতির মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে হয়েছে। সামান্য পয়সার ডাল-রুটি খাওয়া ও মজুরদের সঙ্গে মেশা আর ওদের জীবনকে জানার অভিজ্ঞতা তখনই হয়। ছোটগল্প লেখার প্রাথমিক রসদ ওই সমস্ত অভিজ্ঞতা। বিখ্যাত 'রাজা' গল্পটি ওখানকার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই লেখা। 'শনিবারের চিঠি'তে ছাপা হয়েছিল। দু'বছর পরে সেজদা গিয়ে রাজশাহী নিয়ে আসেন। মা'রও খুব চিন্তায় দিন কেটেছে।

আবার পড়াশুনা শুরু। সেই দুরন্ত মন ডুবে যায় পড়ার সমুদ্রে। রাজশাহীতে বাড়ির সামনেই ছিল বিরাট পাবলিক লাইব্রেরি। বাবা নিজে ছেলের বইপড়ার অভ্যাস তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন, বিশেষ করে সংস্কৃত।

আর দুঁদে ছেলের দিন পদ্মার পারে কী ভাবে কেটেছে, রূপকথার দেশের স্বপ্ন দেখেছে, আগের প্রবন্ধে আমরা জেনেছি।

১৯৪৪ সালে ম্যাট্রিক ১৯৪৬-এ ইন্টারমিডিয়েট ও ১৯৪৮-এ ইংরেজি অনার্স নিয়ে বি. এ. পরীক্ষা। এই ক'বছরে অভিনয়, একটি কাগজ বের করা ('অভিধারা') এবং একটি উপন্যাস ও কয়টি গল্পও লেখা হয়।*

এই শৈশব, কৈশোর ও তরুণ বয়সের উদ্দাম দিনগুলোর পরই দেশভাগ।

২

পাবনা, রাজশাহী, ময়মনসিংহের স্মৃতি তরুণ মনকে আলোড়িত করে। প্রথম নাটক 'দলিলে' আমরা তার প্রকাশ দেখি। 'বাংলারে কাটিবারে পারিছ, কিন্তু দিলটারে কাটিবারে পার নাই।'...

লেখার মাধ্যমে কিছু লোক, অভিনয়ের মাধ্যমে আরও বেশি লোক, কিন্তু সব চাইতে বেশিসংখ্যক লোককে উদ্‌বুদ্ধ করা যাবে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষাটি না দিয়ে শুরু হয় ছবি তৈরি। কিন্তু লেখা, নাটক, অভিনয়ও বন্ধ হয়নি। ওঁর নিজের ভাষায়।**

'ছবির জগতে আসার অনেকগুলি কার্য-কারণ সম্পর্ক ছিল। আমার এক দাদা, মেজভাই মারা গেছেন, এদেশে প্রথম টেলিভিশন এক্সপার্ট। মেজদা গ্রেটব্রিটেনে ডকুমেন্টারী ক্যামেরাম্যান হিসাবে ছ'বছর কাজ করে দেশে ফিরে আসেন নাইটিন থার্টি ফাইভে, সিক্সে তিনি Join করেন নিউ থিয়েটার্সে। সায়গল-কাননবালার স্ট্রীট সিঙ্গার ছবিতে তিনি ক্যামেরাম্যান ছিলেন, এই ধরনের অনেক ছবিতেই তিনি কাজ করেছেন। মেজদার সুবাদে, ছোটবেলা থেকেই দেখেছি বড়ুয়া সাহেব থেকে শুরু করে বিমল রায় অবধি অনেককেই, তাঁরা আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই আসতেন কাজেই

---

* এর মধ্যে 'রাজা' গল্পটি বিয়ের আগে আমাকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। কাশীনাথ (গুন্ডা) চরিত্রটির উল্লেখ আছে ওই গল্পে। পরে একটি অর্ধসমাপ্ত উপন্যাসেও ওই চরিত্রটির বর্ণনা ছিল। অর্ধসমাপ্ত উপন্যাসটি আমার কাছে ছিল। পরে উই নষ্ট করে দেয়। একটি উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে হয়েও সমাজের নিচুতলার মানুষদের জানা, বোঝা লক্ষণীয়।

** চিত্রবীক্ষণ: ঋত্বিকসংখ্যা।

আমাদের বাড়ীতে সেই যুগের Film-য়ের একটা আবহাওয়া বা পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। আর সকলেই যে রকম ছবি দেখে সেরকম আমিও এঁদের ছবি দেখতাম, আমার একটা বিশেষ উৎসাহ ছিল কেননা আমি এঁদের দেখতাম দাদার সঙ্গে আড্ডা মারতে। কাজেই পরিবেশ মোটামুটি তৈরী হয়ে গিয়েছিল। ছবির জগতে আসবো একথা অবশ্য তখনো ভাবিনি।

নানারকম করেছি, বাড়ী থেকে দু-তিনবার পালিয়েছি। কানপুরে একটা textile mill-য়ে কাজ করেছি bill department-য়ে। সিনেমাটা মাথায় ঢোকেনি তখনো। বাড়ী থেকে জোর করে ধরে নিয়ে এল কানপুর থেকে, সেটা বিয়াল্লিশ সাল। মাঝখানে দু'বছর পড়াশুনো gone. বাড়ী থেকে যখন পালিয়েছিলাম তখন আমার বয়স চোদ্দ। বাবা বলেছিলেন ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা দিলে ইঞ্জিনিয়ার ফিঞ্জিনিয়ার হওয়া যায়, নইলে নাকি মিস্তিরি হয়ে থাকতে হবে। হঠাৎ পড়াশুনায় মন এসে গেল এবং তারপর পড়াশুনার দিকেই মন থাকলো। এবং বাঙালী ছেলেদের যা বাঁধা এবং ফরাসীদেরও যা হয় শুনেছি যে ভেতরে একটা Creative urge দেখা দিলেই প্রথমে কবিতা বেরোয়, তা দু-চারটে অতি হতভাগা লেখা দিয়ে আমার শিল্পচর্চা শুরু হোল। তারপর আমি দেখলাম ওটা আমার হবে না। কাব্যির একলক্ষ মাইলের মধ্যে আমি কোনদিন যেতে পারব না। তারপর হল কি, রাজনীতিতে ঢুকে পড়লাম। ৪৩-৪৪-৪৫, সে-সময়কার-কথা যাঁরা জানেন তাঁরা জানেন যে সে সময়টা ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দ্রুত পটপরিবর্তনের সময়।

ফ্যাসীবিরোধী আন্দোলন—ফ্যাসীবিরোধী ব্যাপারটা হবার সঙ্গে সঙ্গে জাপানী আক্রমণ, বৃটিশদের পালানো, এখানে সেই যুদ্ধ-বোমা-টোমা, হ্যানাত্যানা—মানে very quickly in succession কতকগুলো ঘটনা ঘটে গেল, চালের দর চড়ে গেল, দুর্ভিক্ষ—famine, পরপর কতকগুলো changes সমস্ত মানুষের চিন্তাধারাকে একটা বিরাট ধাক্কা দিল।

আমি তখন মার্কসবাদী রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েছি, ঝুঁকে পড়েছি শুধু নয়, active কর্মী, card-holder ছিলাম না অবশ্য, কিন্তু close sympathiser, fellow-traveller আর কি। সেই সময় গল্প লিখতে আরম্ভ করলাম। গল্প লেখার urgeটা কিন্তু সেই কবিতা লেখার মত ভুয়ো

ধোঁয়াটে ব্যাপার ছিল না। চারপাশে যে সমস্ত বদমাইসি অত্যাচার ইত্যাদি দেখছি তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক জীব হিসাবে সোচ্চার প্রতিবাদ করার ইচ্ছে থেকেই গল্প লেখার urge এসেছিল সেই ছোট বয়সেই। গল্প আমি খুব খারাপ লিখতাম না। আমার এখনো মনে আছে আমার আর সমরেশের প্রথম ছাপা গল্প বেরোয় '*অগ্রণী*'তে, তারপর সজনীবাবুর '*শনিবারের চিঠি*', *গল্পভারতী*'—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ বাবু তখন editor, '*দেশ*'—সব মিলিয়ে আমার গোটা পঞ্চাশ গল্প বেরিয়েছিল। এর মধ্যে একটা magazineও বের করেছিলাম, marxist ঘেঁসা। ঐ মফঃস্বল শহর থেকে আমি তখন রাজশাহী শহরে third year-এ পড়ছি। মফঃস্বল শহরে ছাপা magazine তখন খুব দুষ্প্রাপ্য ব্যাপার। বেশ কয়েক মাস চলেওছিল কাগজটা। সবই নিজেদের ট্যাঁকের পয়সা থেকে, অবশ্যই উঠে গিয়েছিল যথারীতি। তারপর মনে হল গল্পটা inadequate, ভাবলাম গল্প কজন লোককে নাড়া দেয়, আর নাড়া দেয় অনেক গভীরে গিয়ে, কাজেই অনেক সময় লাগে পৌঁছতে। আমার তখন টগবগে রক্ত, immediate reaction চাই। সেই-সময়ে হল 'নবান্ন'। 'নবান্ন' আমার সমস্ত জীবন-ধারা পালটে দিল।

গণনাট্য সঙ্ঘে তখনো Join করিনি। তবে আশেপাশে ঘুরেছি। প্রত্যেকেই আমার চেনা। শম্ভুদা, বিজনবাবু, সুধীবাবু, দিগিনবাবু, গঙ্গাদা, গোপাল হালদার মশায়, মানিকবাবু, তারাশঙ্করদা। গণনাট্য সঙ্ঘ তখন আলাদা ছিল না, Progressive Writers' Association -য়ের একটা অংশ ছিল। তারাশঙ্করদা ছিলেন P. W. A.-র President, এঁদের সকলের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। আমার বড়দা কল্লোলযুগের একজন নামকরা কবি ছিলেন, যুবনাশ্ব, মণীশ ঘটক, সেই সুবাদে সাহিত্যিক মহলের সঙ্গেও আমাদের পরিবারের একটা যোগাযোগ ছিল। কাজেই সিনেমার লোকজনদের যেমন চিনতাম তেমনি চিনতাম এঁদেরও। আর এঁদের মধ্যে থেকে হঠাৎ এই 'নবান্ন' আমার কাছে হঠাৎই লেগেছিল। 'নবান্ন' আমার সমস্ত চিন্তাধারা পালটে দিল, আমি নাটকের দিকে ঝুঁকে পড়লাম। ...'I. P. T. A. 'র member হয়ে গেলাম। তারপর 'নবান্ন'ই যখন আবার revised হল সাতচল্লিশের শেষের দিকে তখন তাতে আমি

অভিনয়ও করেছি। তারপর আমি পুরোপুরি গণনাট্যতে, central squad-যের leaderও ছিলাম, নাট্যকার হিসাবে তখন নাটকও লিখেছি। নাটক immediate reaction তৈরি করে বলে দারুণ লাগছিল, কিন্তু কিছুদিন পরে সেটাও মনে হল inadequate, মনে হল এটাও সীমিত। ব্যাপারটা হচ্ছে চার-পাঁচ হাজার লোক, আমরা যখন মাঠে ময়দানে নাটক করতাম তখন চার-পাঁচ হাজার লোক জমা হত, নাটক করে তাঁদের একসঙ্গে rouse করা যেত। তখন মনে হল সিনেমার কথা, সিনেমা লাখ লাখ লোককে একসঙ্গে একেবারে complete মোচড় দিতে পারে। এই ভাবে আমি সিনেমাতে এসেছি, সিনেমা করব বলে আসিনি। কাল যদি সিনেমার চেয়ে better medium বেরোয় তাহলে সিনেমাকে লাথি মেরে আমি চলে যাব। I don't love film. সিনেমার প্রেমে মশায় আমি পড়িনি।'

প্যারাডাইস কাফেতে পানু পাল, কালী ব্যানার্জি, সলিল চৌধুরী, হৃষিদা (হৃষিকেশ মুখার্জি) মৃণাল সেন, তাপস সেন, ঋত্বিক ঘটক প্রভৃতির আড্ডা তখন বিখ্যাত ছিল। আড্ডার সঙ্গে ভবিষ্যতের বহু পরিকল্পনা হত। পরে এইসব বন্ধুরা নাটক গান, ফিল্ম ও সাহিত্যের দিকে এগিয়ে গেছেন, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আমি কলকাতায় আসার পর সর্বাগ্রে যাঁদের নাম শুনতাম উৎপল দত্ত, সলিল চৌধুরী, তাপস সেন, কালী ব্যানার্জি প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে একটি নাম সর্বদাই শুনতাম—ঋত্বিক ঘটক।

'দলিল' ও 'বিসর্জন' আমি দেখেছিলাম, 'ভাঙাবন্দর', 'অফিসার' প্রভৃতি সম্বন্ধে আমি শুনেছিলাম, দেখিনি। ওই সময়টা সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না। যাঁরা জানেন, তাঁরা ভালো বলতে পারবেন।

'জ্বালা' নাটকটি সম্বন্ধে শুনেছিলাম। ১৯৫০ সালে পর পর কয়টি আত্মহত্যার খবর বেরিয়েছিল কাগজে। সেগুলো সম্বন্ধে রিপোর্ট লিখে পাঠানো হত *People's Age*-এ। তখনই নাটকটি লেখার পরিকল্পনা ওঁর মাথায় আসে। আত্মহত্যা করে কোনও সমাধান নেই, জ্বালা জুড়াবে না' পৃথিবীতে বেঁচে থেকে সংগ্রাম করে যেতে হবে। নাটকটির বিষয়বস্তু ' দৃষ্টিভঙ্গি চমৎকৃত করেছিল।

'ছিন্নমূলে'-এ অভিনয়, 'তথাপি'তে সহকারী পরিচালক, 'বেদেনী' ও 'নাগরিক'। দীর্ঘ ইতিহাস। কিন্তু চরম হতাশা, পার্টি কমিশন, নীচের মহল, গ্রুপ থিয়েটার, সাঁকো। এই সময়ই বিস্তৃতভাবে শুনেছি ওঁর ছোটবেলার কথা। আর শুনেছি 'নাটোরের মহারাজার বাড়ী আমার মামার বাড়ী।' মহারাজার কন্যা বিভামামিমা মা'র খুব বন্ধু ছিলেন। মা'র মৃত্যুর পরে বিভা মামিমা এসেছিলেন।

বার বার মনে হত একজন বাংলাদেশের ছেলে, যিনি মার্কসবাদে বিশ্বাস করে এগিয়ে নিয়ে যাবেন সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে, ভারতীয় ঐতিহ্যকে! আমার সঙ্গে এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলাপ, পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা! গ্রুপ থিয়েটার নিয়ে তখন কল্পনা করতাম, একদিন নিজেদের একটা স্টেজ হবে। এরপর একটা স্টুডিয়ো হবে। জীবনে বহু সহ্য করা, বহু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসেও এত সরল কী করে ছিলাম, আজ ভাবলে অবাক লাগে। ভাবতাম, আর কী সমস্যা। এবারে শুধু এগিয়ে চলা।

মনে পড়ে চরম হতাশা, বেকারি, অর্থাভাব, চার্জ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সুস্থ সুন্দর জীবন গড়ে তোলবার চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষার কথা। একুশ বছর আগের ওই পবিত্র দিনগুলো সজীব ও জীবন্ত হয়ে আসছে মনে। খুলে বসি চিঠির ঝাঁপি। আমার শ্রদ্ধেয় কাকাবাবু শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যখন চিঠি লিখতাম তখন একদিন তিনি লিখেছিলেন—'সাহিত্য কি? এও তো একধরনের খোলা চিঠি। যা কিনা নিজের অন্তর্যোগে নিঃসৃত, সেই আন্তরিক প্রকাশকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া।'

১

রাঁচী

২২.২.৫৫

'রাঁচীতে এই কয়দিন ঊর্ধ্বশ্বাসে কাজ করে যেতে হয়েছে। কিন্তু কি আনন্দের কাজ, কি করে বোঝাব তোমাকে। ওরাওঁ আর মুণ্ডাদের মধ্যে সারাদিন কাটছে, মাটির স্বাদ পাচ্ছি, অপূর্ব গানের সুর আর মাতাল করা নাচের ছন্দ

অহর্নিশি, ওদের নিপীড়িত জীবনের মধ্যে বাঁচার আকুলতা, এসব আমায় ক্ষেপিয়ে দিয়েছে। এ বাস্তবের কণামাত্র নিয়ে যেতে পারছি সঙ্গে করে, কিন্তু তাতেই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে—মানুষকে বুঁদ করে দিতে পারব। যা আমি নিয়ে গেলাম তাতে কর্তারা খুসী হবেন, দর্শক খুসী হবে, কিন্তু আমার অতৃপ্তি কাটবে না। আমি তো জানি, বিরাট ঐশ্বর্য ভাণ্ডার আমার সামনে খোলা রয়েছে, তার বিন্দুমাত্র আমি ধরতে পারলাম। ইচ্ছে হচ্ছে, আবার আসব, আরো বড়ো, আরো বাস্তবপূর্ণ, আরো ব্যাপক ছবি করব। হয়তো করা হবে না আমার জীবনে, তবু ইচ্ছে হচ্ছে।

আর এদের মেয়েরা। এমন সরল, এমন হাস্যময়ী, এমন ছন্দোময়ী এরা যে প্রতিপদে আমার তোমার কথা মনে পড়ে যায়। অনেক মেয়েকে দেখে তোমার কথা ভেবেছি, কোথাও মিল নেই, তবু কোথায় যেন আছেও। এদেরকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। এদের জীবনকে আমি শ্রদ্ধা দেখানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, দেখি কতদূর করতে পারি। সরকারি বিধিনিষেধ এ ছবির ওপর কম, তাই হয়তো খানিকটা পারবোও।

এদের ইতিহাস আমি জানলাম, এখানে এদেরই মধ্যে শিক্ষিত কয়েকটি লোকের contact পেয়েছি, যাদের মধ্য দিয়েও জানলাম এদের বিপ্লবী ঐতিহ্যের কথা। তাকেও সাহস করে যতখানি পারি ধরে ফেলেছি। তারপর দেখা যাবে।

বীরসামুণ্ডার কাহিনী তুমি শুনলে বড় ভাল লাগবে। বারবার তোমার কথা মনে হচ্ছে। এখানে একটি একেবারে গ্রাম্য ওরাওঁ দলের পরিচয় পেয়েছি, যারা গত National Festival-এ দিল্লিতে 2nd Prize পেয়েছিল। ওদের নাচের মধ্যে নবজীবনের বিষয়বস্তু ঢুকিয়ে তৈরী করে কলকাতায় নিয়ে আসবার একটা ব্যবস্থা করেছি, দেখি কতদূর হয়। এদের মধ্যে আমাদের কাজ নেই, অথচ এরা হচ্ছে দেশের গভীরতম স্থল, Landless peasants, Semi-Proleatarians of the rural area. তোমাকে পাশে নিয়ে ঘুরতে পারলে কঠিন ব্যাপার হত।

Group Theatre-এর কাজ ভাল করে কোরো। সামান্য Slackness-এ মুষড়ে পোড়ো না। কাজ চালু রাখ। Show date কিছু ঠিক হল?

কাজকর্ম চালিয়ে যাও। আমি ঠিক সময়ে এসে যাব। হতাশ হবে না কিছুতেই। নিজের পার্টের ওপরে কাজ চালিয়ে যাও, নিজেই Improvement বুঝতে পারবে। অমলেশকে বোল Leadership নিয়ে সব কাজ বজায় রাখতে। ও-ই পারবে, ওর সে ক্ষমতা আছে।

আমি কাল এখানে থাকছি, ছবির কাজ বাকী আছে। পরশুদিন মোটরে করে আড়াইশ মাইল দূরে দেওঘর যাব। সেখান থেকে আরম্ভ হবে Whirlwind tour. কত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় দেখি। তোমার জন্য মন কেমন করছে।

চাকরির ব্যাপারে একটা সুরাহা হয়ে এসেছে। আমার কাজে এরা অত্যন্ত খুসী। মনে হচ্ছে পুরো ছবি করার সুযোগ কলকাতাতে ফিরেই পাব। দেখা যাক। অন্ততঃ বিয়ে করে সংসার খরচ চালানোর জন্যে খুব দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে।

পার্টি লোকাল ইপ্‌টার ব্যাপারে কিছু এগোল কি? সব খবর বিস্তারিত ভাবে পাটনার ঠিকানায় লিখো। আমি যাতে ২৭শে পৌঁছে পাই। তোমার শ্রীহস্তের দুছত্র লিপি এখন তৃষিত চাতকের ফটিক জলের মত।'

২

দেওঘর
২৫.২.৫৫

'রাঁচীতে তো তুমি চিঠি দিলে না।

গতকাল রাঁচী থেকে প্রায় আড়াইশো মাইল বাসে করে অনবদ্য দৃশ্য সব দেখতে দেখতে দেওঘরে এসেছি। পথে হাজারিবাগ, পার্শ্বনাথ, তোপচাঁচী Lake, গিরিডি, মধুপুর, যসিডি হয়ে এলাম। এখানে এসে হঠাৎ পায়ে একটা ব্যথা হয়ে জ্বর হল। ওষুধ খেয়েছি, ডাক্তার দেখিয়েছি, এবং এখন বেশ ভাল আছি।

কাল সকালবেলা গয়া রওনা হচ্ছি। পাওয়াপুরী, নালন্দা, গৃধ্রকুট, রাজগীর ও বিহারশরীফ হয়ে পয়লা নাগাদ পাটনা পৌঁছবার কথা। পাটনায় গিয়ে যেন তোমার চিঠি অবশ্যই পাই। মন নইলে বড় খারাপ হয়ে যাবে।

রাঁচীর কাজ আমার খুব ভাল হয়েছে। যদিও এমন তাড়াহুড়োতে ব্যাপারটির ওপরে প্রয়োজনীয় শ্রদ্ধা দেখানো সম্ভব হয়নি, এবং যে বিপুল ঐশ্বর্যভাণ্ডারের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম, তার সামান্যটুকুতেই তৃপ্ত থাকতে হল, তবু এদের দরকারের দিক থেকে এবং কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের standard-এর দিক থেকে একেবারে প্রথম শ্রেণীর কাজ করা গেছে। এদের প্রাণের এইটুকু গভীরেও এঁরা এর আগে ঢোকেননি। কাজেই ছবিটি সম্মান পেতে বাধ্য। আনন্দদানের দিক থেকেও এত প্রচুর সম্পদ আছে। তোমাকে ফিরে গিয়ে বলব, এদের সব অপূর্ব নাচের কথা। আর কি সুন্দর এদের ছেলেমেয়েরা।

আর এখানে মানুষের ছোঁয়াচ পেলাম প্রতিপদে। কত টুকরো ঘটনা যে সব ঘটে যায়, কত-পলকপাতের মধ্যে মনে গভীর রেখাপাত করে যায় এক-একটা মানুষ। কত বিত্তশালী মনে হয় নিজের দেশকে। মানুষের সম্পদে ধনী।

সব গুছিয়ে এখন লেখা যাবে না—এদের আস্বাদন আমার অর্ধেক হয়ে আছে, কলকাতায় ফিরে তোমার সঙ্গে মিলে পুরো স্বাদ পাব। এখন অন্য কথা বলি।

আজ তোমাকে লেখার কথা ছিল না। হঠাৎ ভীষণ মন কেমন করতে আরম্ভ করল একা হোটেলে শুয়ে শুয়ে। আর সবাই একটু ফাঁক পেয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। আমারও জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে। দূরে ত্রিকূট পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ফাঁকা আন্দোলায়িত মাঠের ওপরে দামাল হাওয়া লাল-মহুয়া আর পলাশ গাছগুলোকে নেড়ে দিয়ে যাচ্ছে। আর বারবার করে পাতা ঝরছে। আজ প্রথম বসন্তের হাওয়া দিচ্ছে হঠাৎ। আমার মনও হঠাৎ কি একটা টানে আকুল হয়ে উঠতে আরম্ভ করল। আগেও আমার এমন হত, অনেকদিন বাদে আজ অনুভব করছি।

এ এক বিচিত্র অনুভূতি আমার। যা কিছু পেছনে ফেলে আসা সেই ছোটবেলা থেকে কত-কতদিনের কথা সব মনে পড়তে থাকে, শিশুকালের সরল দেখার ভাবকে মনে পড়ে, বড় পবিত্র লাগে। মনে পড়ে সব নাম

হারিয়ে যাওয়া প্রায় ভুলে যাওয়া তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার কথা, কবে দেখা সব মানুষের কথা। সময়ের স্রোতে উজান কেটে আবার সেইসব দিনে অকারণেই ফিরতে ইচ্ছে করে বড়, আর অসম্ভব একলা ভেবে বড় মন কেমন করে।

নিজেকে বড় অসহায় মনে হয় এমন অবস্থায়। কিছু ভাল লাগে না। বুঁদ হয়ে শুধু ভাবতে ইচ্ছে করে। আগেও এমন আমার বারবার হয়েছে। আজ শুধু একলা [তবু] তফাৎ আছে। নিজেকে বড় পূর্ণ লাগে যখন ভাবি, আমার চিন্তার সাথী একজন আছে, যে আমার সবচেয়ে উদ্ভট সবচেয়ে আজগুবী মনোভাবকেও পরম স্নেহের আলো দিয়ে বুঝতে পারে। আমি নিজেকে উদঘাটিত করতে পারি একটি লোকের কাছে, আজ তাই আমার অনুভূতি আনন্দ এনে দিচ্ছে।

তোমাকে পাওয়াটা বড় ভীষণ ব্যাপার হয়ে গেছে আমার জীবনে। আমি এবার নিশ্চিন্ত। আমি আর কিছু চাই না।

আর *মার কথা মনে পড়ছে। মার সেই স্নেহ-আবেশ উন্মনা দৃষ্টি মনে পড়ছে। তাঁর ফোটোতে যা দেখেছি। আজ মা কেন বেঁচে নেই, তবে যেন সম্পূর্ণ হত ব্যাপারটা।'

৩

পাটনা

২.৩.৫৫

'এইমাত্র তোমার চিঠি পেলাম ও দুবার পড়লাম। রাঁচীতে লেখা চিঠি পাইনি। জানি না, তার কি হয়েছে। ১৫ তারিখে শো। রাজনীতির ব্যাপারটাও ৬।৭ তারিখের মধ্যে সারতে হবে। ভূপতিদার বাড়ীর ব্যাপারটা একটা কাঁটার মত মনের মধ্যে খচখচ করে বিঁধছে সবসময়। কিন্তু যা দেখছি, ৭ তারিখ সকালে পৌছাবার প্রচণ্ড সম্ভাবনা।

ইউনিট মিটিং সেরে দিয়ে তোমরা যা হয় লিখে দাও। রাজনীতিক লড়াই-এর জন্যে আমার বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই। Document এবং আমার

---

* আমার মা শ্রীযুক্তা সুপ্রীতিবালা দেবী।

P.C.-র কাছে চিঠি সমস্ত দিকগুলোই মোটামুটি Cover করে দিয়েছে। L.C-র Copyটা অবিলম্বে D.C.-তে দিয়ে আসবে।

আমার প্রধান দুশ্চিন্তা হচ্ছে নাটক। শৈলেন set-এর কাজ অবিলম্বে আরম্ভ করে দিক। সত্যেন music তৈরী করে করুক। তাপসকে নিয়ে এসে রিহার্সাল দেখাও। Preparatory কাজগুলো শেষ হয়ে যাক। টিকিট বা কার্ডবিক্রীর ওপরে পরিপূর্ণ জোর দাও। মোটকথা Full Swing ভাই!

আমার কাজের দিকটা খুব ভালই চলছে। সেই যে জ্বর হল, তারপর গেলাম গয়া, নালন্দা, পাওয়াপুরী, উদন্তপুরী (বিহারশরীফ) এবং রাজগীর।

কাজকর্ম ভবিষ্যতে Documentary তো পাবই। মনে হয় একটা feature film-এরও chance অদূর ভবিষ্যতে মিলবে। ঠিকমত গুছিয়ে নিতে পারলে আর্থিক সংকট থেকে মোটামুটি পরিত্রাণ পাওয়া যাবে।

এবারকার যাত্রায় রাজগীরের মত আর কিছু চোখে ধরল না। আবার ৫ তারিখ নাগাদ যাবার কথা আছে ওখানে, কাজ আমার শেষ হয়নি। আমি এখানে এসে আমার team-কে split করে একদল পাঠিয়েছি মুজঃফরপুর মতিহারীর দিকে, তারা বৈশালী, নন্দনগড়, লড়িয়া এইসব জায়গা ঘুরবে। আর একদল ভাগলপুর হয়ে বিক্রমশীলার ছবি তুলবে। আমি নিজে এখান থেকে কাছে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের fortress এবং প্রাচীন পাটলীপুত্র excavation চলছে, তারই ছবি তুলছি। এভাবে ভাগ না করলে ১৫।১৬ তারিখের আগে ফিরতে পারতাম না।

রাজগীর। আমি কোনদিন ভুলব না রাজগীরকে। গৌতমবুদ্ধ এর পথে পথে হেঁটেছেন। মহাবীর এখানে থাকতেন। নৃপতি বিম্বিসার যে পথ তৈরী করেছিলেন ৫০০ B.C. তে সেই [...] পথ দিয়ে হাঁটলাম। অজাতশত্রুর বিরাট জেলখানা আজও খাড়া রয়েছে। একটা জায়গায় একটা বিরাট army একদিন পার হয়ে গিয়েছিল। তাদের রথের চাকার দাগ ঘুরে গেছিল কাদার ওপরে, আজো আছে Retrified হয়ে! প্রতিটি কোনা এখানে বিচিত্র স্মৃতিতে ভরপুর। কাল স্থগিত হয়েছিল যেন এতদিন এখানে, হাওয়াতে একেবারে অন্যরকম গন্ধ। চারপাশে উঁচু পাহাড় একদিকে মাত্র ঢোকার পথ, অথচ ভেতরে অপূর্ব Valley, বাইরের গাছপালার সঙ্গে এই

দশ মাইল Valley-র গাছের কোন সাদৃশ্য নেই। কি বিচিত্র গাছগুলো এখানে, প্রতিটি গুল্ম-লতা পর্যন্ত ওষধি গাছ, মানে ওষুধ তৈরী হয়। এটা বোধহয় গন্ধমাদনের দোসর ভাই। প্রথম বসন্তের অপরূপ বর্ণাঢ্যতা, বিচিত্রসুন্দর রঙের সমাবেশ। মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে ছোট সরস্বতী নদী, প্রাচীন পুরাণে বর্ণিত। মাঝে মাঝে কুন্ড, আর প্রস্রবণ, প্রত্যেকটি Hot spring, এখানে সব কুণ্ডের জল গরম, রোগ সারাবার নানা minerals মিশে আছে তাতে। মানুষ এখানে বেশী আসে না। আসার পথ বড় কষ্টকর। পাহাড়ের নীচে বাইরের দিকে রাজগীর গাঁ, তার পাশে Hot spring-এ চান করে দূর থেকে পাহাড়ের শোভা দেখেন বেশীর ভাগ যাত্রী, তাঁরা আবার প্রায়ই বাতের রোগী।

আমি এর কোনায় কোনায় ঘুরলাম। আবার যাব। আমার প্রগাঢ়তম অনুভূতির মুহূর্তগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দামী একটি হল, সেদিন সন্ধ্যায় গৃধ্রকূটপর্বতের একেবারে শিখরে দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে! এইখানে দেবদত্ত সিদ্ধার্থকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল, এইখানে বিম্বিসার বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল, এইখানে সেই বেদীকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে বক্তিয়ার খিলজী। সমস্ত কিছু চিহ্ন টাটকা হয়ে এখনও পড়ে আছে। দূরে রাজগীর—পঞ্চকের মাথার ওপরে সূর্য ডুবল, নীচে অপরূপ ওষধি-বনানী ম্লান হয়ে এল, সরস্বতী নদীটি পৈতের মত চিকচিক করে, কুণ্ডগুলোতে জল খেতে জঙ্গলের জানোয়ার বেরিয়ে এল, আমি সবাইকে পাঠিয়ে দিয়ে একা বসে রইলাম। জীবনের এই মুহূর্তগুলোতে তোমাকে সঙ্গী করতে না পারলে অর্ধেক থেকে যায় সব-কিছু।

আমার সকল দুঃখ ধুয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। আবার আমি পবিত্র হয়ে উঠেছি। তুমি আর এই পৃথিবী সর্বংসহা, সদাক্ষমাশীলা, উজাড় করে দেওয়ার গর্বে মহীয়সী। সন্ধের আঁধার ঘন হয়ে নিবিড় হয়ে আসার মত আমাকে ঘিরে আসছে। কলম চলছে-না, নতুন করে পুরোনো কথা কি আর লিখব।... ফেরার সময় হয়ে এল। ফিরেও পর্বতপ্রমাণ কাজ। কিন্তু এই কাজের ভিড়টাকে শেষ করতে পারলেই শিলং রওনা হওয়া—তারপর? অপরূপ মাধুর্যে দিনসাতেক ছুটি ভোগ করা।

বেকার জীবনের ধিক্কার পেরিয়ে এমন আনন্দপুরী আমার জন্যে বিরাজ করবে সেটা [কি] আমি জানতাম? এইটুকু বলতে পারি, এই সুযোগটুকু যদি পাই, চুটিয়ে বাঁচব এবার। কি করে মানুষ হতে হয়, কি করে জীবনকে সার্থক করে তুলতে হয়, কি করে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিতে হয় দেশের মানুষের জন্যে কাজের মধ্যে, সৃষ্টির মধ্যে, তার পুরো রহস্যটা এবার জেনেছি। তাই আর মার জন্যে দুঃখ হয় না।

মার স্মৃতির সামনে মাথা নীচু করে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে দুফোঁটা চোখের জল ফেলব দুজনে বিয়ের পরে, তারপর বোঁচকা কাঁধে করে বেরিয়ে পড়ব হাসিমুখে। সে হাসি কোনদিন মুছব না, কারণ বাঁচার রহস্য আমরা জেনে ফেলেছি। এটা আমার বিশ্বাস। এবং জ্ঞান।

দুটি অসহায় ছেলেমেয়ে দূরে দূরে থেকে মার খেয়েছে, বাড়ি খেয়েছে, কাতরেছে, এখন হাত ধরাধরি করে তারা হাঁটবে, সুদৃঢ় পদক্ষেপ হবে। আবার মার খাবে, আবার পড়বে, আবার উঠবে, কাঁদবে, কাতরাবে, কিন্তু অসহায় আর থাকবে না। এটা থাকবে তফাৎ, ওরা একটা social unit হয়ে গেছে।'

৪

কলকাতা
৮ই মার্চ

'...কর্ণ জন্মেছিলেন সহজাত কবচকুণ্ডল নিয়ে তুমি জন্মেছ সহজাত শুচিতা নিয়ে। ঝর্ণার ধারা যেখান দিয়ে বয়, সব ক্লেদ ধুয়ে নিয়ে যায়, তাই বলে কি সেই ধূসরতার এতটুকু তার নিজের গায়ে লাগে? তোমাকে flatter করতে আমার বয়ে গেছে, কিন্তু আমি যে বারবার লক্ষ্য করেছি, তোমার শুভ্র চরিত্রের স্নিগ্ধতা নিয়ে বহু ক্লেদের মধ্য দিয়ে—তুমি পার হয়ে যাচ্ছ, অথচ কোন inhibition নেই, কোন সংস্কার নেই। অসীম এক আস্থা সব-কিছুর ওপর আরোপ করে সব-কিছুকে দায়িত্বশীল করে তোলা তোমার স্বভাবের আসল রহস্য। তুমি মানুষটি শরৎকালের মত। চিরকালের শিশু, অথচ চিরগভীর।

...প্রকৃতির প্রতি আমার মনোভাব বদলে যাচ্ছে। আগে উপলব্ধি করার দিকে গভীর অনুভবের দিকে মন ঝুঁকত, এখন খালি আহরণ করার দিকে হয়েছে ঝোঁক। এইতো ঘুরলাম অনবদ্য প্রকৃতির মাঝখানটিতে। কিন্তু খালি জমাবার দিকে টান এবার আমার, যাতে করে জমিয়ে নিয়ে আর-সবার কাছে তুলে ধরতে পারি, তাই ভেবে মৌমাছির মত পুঁজি করার চেষ্টা, জানি না এটা ভাল কিনা। কিন্তু শুধু উপলব্ধিতে আর প্রাপ্তি নেই, একটা জিজ্ঞাসা, একটা সন্ধিৎসা আমায় খালি নুড়ি কুড়োবার মনোবৃত্তিতে পৌঁছে দিচ্ছে।

...তোমার পাইনবনের মধ্যে দিয়ে সাঁ সাঁ করে হাওয়া বয়ে যাওয়ার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক স্মৃতি, অনেক স্বাদ, অনেক অনুভূতি।... শিলং গিয়ে দু-তিনটি দিন যেন সুধায় থাকে ভরে। যেন আমার প্রথম শিলং দেখা, মায়ের শিলং দেখা, তোমার শিলং দেখা—একেবারে অদ্ভুত আনন্দরসে ভর্তি হয়ে সারাজীবন গানের প্রথম কলির মত ঘুরে ঘুরে সামনে টেনে আনে আমার ভালবাসায় আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়াকে।

...আজ দোল। ঘরে চুপ করে বসে আছি। এবারের দোল আমার এমন করেই গেল। এবার শুধু আমার হাতে থাকল বর্ষা। আমার সবচেয়ে প্রিয় ঋতু। তার দিকেই চেয়ে বসে থাকি।'

৫

কলকাতা

১৩.৪.৫৫

দিদিদের চিঠি পেয়েছি। ভীষণ খুসী। উপদেশও অনেক দিয়েছে। বড়দা বৌদি শুনলাম খুসী হয়েছে, ক'দিন বাদে আসবেন, তখন কথা হবে।

IPTA conference-এ Fraternal delegate হওয়া সম্বন্ধে তোমায় আগে লিখেছি। শচীনের সঙ্গে ও বীরেন রায়ের সঙ্গে এ ব্যাপারে দেখা করেছি ও কথা বলেছি। নির্মল ঘোষরা P. C. থেকে অনুমতি চেয়েছে, আগামীকাল আমায় জানাবে আমাকে Delegation দেওয়া হবে কিনা।

কিন্তু কাজ মোটামুটি হয়ে গেছে। এমাসের শেষে আমাদের document নিয়ে D.C. আমাদের unit-এর সঙ্গে বসবে ও বিস্তৃত আলোচনা করবে। IPTA-এর বর্তমান Conference সরাসরি আমাদের effect করবে না যতক্ষণ না আমাদের view points শোনা হচ্ছে। এসব দিক মোটামুটি ঠিকই আছে।

এসব ছেড়ে অন্যান্য দিক থেকে একটা হতাশ অবস্থার মধ্যে ধীরে ধীরে গিয়ে পড়ছি। একদিকে অবজ্ঞা ও অপমান, তার থেকেও কলকাতাতে অনেকেরই ধারণা লক্ষ্মী খারাপ হয়ে গেল। বিরাট ভুলের মধ্যে গিয়ে পড়ছ তুমি। এটাই ভাবছে ওরা। ভাল দিক একটু আছে। শচীন সেনের খুব ইচ্ছে সে বরযাত্রী যায়। সে বলে তোমার লেখা আমন্ত্রণ পেলে সে যাবে। তুমি ওকে একটু লিখে দিও। এইরকম দু'একজন ছাড়া তোমাকে কেউ বুঝল না।

আমি সৎ থাকার চেষ্টা করেছি আমার চিন্তায়, আমার লেখায়, আমার আনুগত্যে। বিয়ের পর এ জগৎ থেকে দূরে চলে যাব কিছু কালের জন্য। স্তিমিত-শান্ত জীবনের প্রতি অদ্ভুত শ্রদ্ধা হচ্ছে। আমার পথ আমি জানি, জনতাকে সেবার পথ আমার সোজা, সে পথ এই ক্লেদ আর পরশ্রীকাতরতার মধ্যে দিয়ে নয়। স্তিমিত জীবনের মাঝেই সৃষ্টিশীল সে জীবন।

গত কয় বছরের বেকার সৃষ্টিহীন জীবনে যে ঋণের পুঁজি ঘাড়ে নিয়েছি, তাই আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

ভূপতিদার বাড়ি, নাগরিক, মণিবাবুর দল, বিয়ের প্রস্তুতির খরচ, সর্বস্বান্ত, আমাকে দিশেহারা করে তুলছে। নিজের চরম ছন্নছাড়াত্বের জন্য একইভাবে উদ্দাম হয়ে চলেছি। আজ পর্যন্ত আমার ব্যবহার খতিয়ে গিয়ে দেখলাম—ভূপতির বাড়ী বাদে আর সব ক্লেদ মুছে ফেলতে আমি গত কয় মাসের মধ্যেই পারতাম। চিন্তাশূন্য ব্যবহারের জন্য তারা বেড়েছে।

সৎভাবে ভবিষ্যৎ জীবন তৈরী করার চরিত্রবল আমার আছে, তাই সেটা এত অপরাধী করেনা আমায়। আবার আনন্দের স্বাদ সব-কিছু পেরিয়ে আমরা পাব। জীবনটাকে সুধাময় করে তুলতে পারব।

৬

কলকাতা
১৪.৪.৫৫

'এ কয়দিন অত্যন্ত মনমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে কেটেছে। কিন্তু আজ প্রথম যেন শান্ত হয়ে আসছি।

পরিষ্কার মনে হচ্ছে আজ জীবনের পরিপূর্ণ ছন্দবদলের দরকার হয়ে পড়েছে। বাঁচতে হলে productive members of society হতে হয়, এটা বুঝিইনি। জীবন গড়ব ভেবেছি, কিন্তু তার ভিত্তি যে উপার্জন ক্ষমতা, সেটা একদম বুঝিনি। এর ওপর এক মারাত্মক ambition আমায় ছন্নছাড়া করে নিয়ে বেড়িয়েছে। জীবনের কাছ থেকে অনেক চাহিদা নিয়ে আমি রওয়ানা হয়েছিলাম। সর্বশ্রেষ্ঠ হব, এই ছিল দম্ভ। সবসময় স্বপ্ন দেখেছি, দেশে নয়—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জানা লোক হব। হায়রে, নিজের ক্ষমতাকে এত মূল্য দেওয়ার ফলে আজ এইখানে এসে দাঁড়িয়েছি। মুখে এটাকে অনেক সময় অস্বীকার করেছি, আজও হয়তো করি, কিন্তু চাপা আগুনটা এতদিন থেকেই গেছে। পথটা হিসেব না করে লক্ষ্যটাকে দেখেছি, তাই এত হোঁচট খাই। এবারে একটু পথটাকেই দেখতে হবে।

আজ বছরের শেষ দিন। বসন্তেরও শেষ। একদিন প্রচুর চিন্তা করেছি। কতকগুলো কথা ভেবেছি, তোমাকে জানাই। আমাদের অতীতের পাঁচ-ছয় বছরের সঙ্গে সব সম্পর্ক সত্যি সত্যি চুকিয়ে দিতে হবে। যা কিছু আমার টাকার জের, তাদের দায়িত্ব থেকে এবার আমি মুক্ত করব নিজেকে। নাগরিক সম্বন্ধে আর চিন্তাই করব না। করে কোন লাভ নেই। সবার সর্বনাশ হয়েছে। আমারও কম হয়নি—বিরাট বোকামি করেছি, কিন্তু একা আমি নই।

মাসিক একটা আয়ের সংস্থান করা প্রথম কর্তব্য। নইলে জীবনে স্নিগ্ধতা আসবে না। দ্বিতীয় কর্তব্য আগামীবছর এম.এ.-র জন্য প্রস্তুত হওয়া। তোমার short hand ইত্যাদিও আরম্ভ করবে কিনা ভেবে দেখো। Group Theatre সম্বন্ধে চিন্তা কোরো না, 'হ য ব র ল' Dramatise অর্ধেকের বেশী করে ফেলেছি, মে মাসের মধ্যে ওটা তৈরী হয়ে যাবে।

পার্টির দিকটা ভাবিনি। তেমন অবস্থার উদ্ভব হলে ভাবব, জনতার দিকটা ভেবেছি। আমার স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল লেখাতেই। তোমার মধ্যেও চাপা রয়েছে সে ক্ষমতা। এসো আমরা লেখাটাকে আঁকড়ে ধরি। লেখাকে develop করব, নাটক-উপন্যাস-গল্প, প্রবন্ধ, তার থেকে অর্থোপার্জনটা এখনই কিছু বিশেষ হবে না, দুটো বছর লাগবে।

সব-কিছুর ভিত্তি কিন্তু একটি বা দুটি চাকরি সংগ্রহ। তারপর দু'বছর ধরে সাহিত্য-মঞ্চ-ফিল্মের জন্যে দুজনের প্রস্তুতি, আর তার সঙ্গে পরীক্ষা দিয়ে short hand শিখে উপায়ক্ষম হওয়া। আমিও short hand শিখতে রাজী আছি। ১৯৪৬/৪৭ থেকে আমাদের জীবন বাঁকাপথে চলে যায়। হতাশা আর চোরাবালী, অবসাদ আর আশাভঙ্গ—১৯৫৫-এর এই মাঝামাঝিতে এসে একটা চরম অবস্থা গ্রহণ করেছে। এসো আমরা মাঝের কয়টা বছরের পিছিয়ে পড়াকে দুহাতে মুছে ফেলে ভুলে গিয়ে এগোই ১৯৫৭/৫৮-এর দিকে। জীবনের শ্রেষ্ঠ দশটা বছর আমাদের ভুল করতে আর ভুল ভাঙ্গতে যাক। কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনটার ভিত্তি হোক দৃঢ়।

বছরের শেষ চিন্তাগুলো আমার এই ধরনেরই, ভাল করে আরো ভাবো, আর আমাকে জানাও, তোমার চিন্তার ধারা থেকে আমায় বিচ্ছিন্ন রেখো না। তোমার কথা ভাবলেই আমার নিজের সরল তাজা শৈশবের স্মৃতি সব মনে পড়ে, আর সৌভাগ্যের দৃপ্ততা আসে মনে।

আমার বড়দা হঠাৎ এলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে এখন। দিদির বড় মেয়ে টুস্‌কিও কাল বম্বে থেকে এসেছে, এখনই এল ওর বরের সঙ্গে, ভীষণ খুসী ওরা সবাই। বড়দা—খুকু (মহাশ্বেতা), গীতা, সেজ-বৌদি, মা সবার কাছ থেকে তোমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছেন ইতিমধ্যেই। টুস্‌কির ইতিমধ্যেই ভীষণ অবাক লাগছে আমাকে at all কোন মেয়ের ভাল লাগে কি করে—আমার নোংরা পা, বিড়ী ও হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে বসাসমেত। ওর মন খারাপ হয়ে গেছে তোমার ভবিষ্যৎ ভেবে। আমি তোমার মোটেই উপযুক্ত নই, মিছিমিছি তোমাকে ডোবাচ্ছি। 'লক্ষ্মী' মহিলাটি জলে পড়লেন। এই হচ্ছে তার সুচিন্তিত অভিমত, বাড়ীর সবার কথা থেকে বোঝা গেল তোমাকে বিয়ে করতে পেরে আমি ধন্য। আমার

অবস্থা এই হুল্লোড়ে পড়ে শোচনীয়, নিজেকে অপরাধী ভাবতে আরম্ভ করেছি।

বড়দা বোধহয় টাকার সমস্যার কিছু সমাধান করবেন ভাবছেন। অস্পষ্ট দুশ্চিন্তায় আর মন খারাপ করব না। আমরা বাঁচার জন্যে জন্মেছি। আমরা জীবনকে সার্থক করবই মিলিত কাজের মধ্যে দিয়ে। সামনে এখনও বহু বছর পড়ে আছে, ভবিষ্যতের মধ্যে নিজেদের প্রসারিত করে দিতে হবে। এইটুকুই এই বছরের শিক্ষা।

তোমাকে এই চিঠি লেখার মধ্যে দিয়ে আমি অনেক শক্ত হতে পেরেছি। তুমিও আমায় লেখো।'

৭

১৯.৪.৫৫

'তোমার বেয়ারিং চিঠি দুখানা গাঁটগচ্চা দিয়ে কাল নিলাম। শচীনদার চিঠি দিতে আজ সকালে গিয়েছিলাম।

বরযাত্রী সম্বন্ধে ভাবছি—বড়দা বা সেজদা, ফল্গু, শচীন, কেষ্ট, ভূপতিদা।

সাতপাক ইত্যাদি সম্বন্ধে তুমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কি কি শাস্তির মধ্যে দিয়ে পার হতে হবে, সেটা জেনে নিও ও আমাকে জানিও।

তোমার প্রশংসায় এখানে তো সবাই পঞ্চমুখ, বিশেষ করে খুকু leading part নিচ্ছে।

IPTA conference এর খবর দেই। শেষ অবধি নির্মল আমাকে কার্ড দেয়নি।

Conference সম্পূর্ণ fail করেছে। Report review পুরোটা rejected হয়েছে। Constitution ছয়মাসের জন্য deferred হয়ে গেছে। Show-এর দিকটা অত্যন্ত বাজে হয়েছে, বাইরের সংগঠন ও হেমাঙ্গদাদের আসাম troup মানরক্ষা করেছে।

শচীনদার সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারলাম। Party D.C. ইত্যাদিদের IPTA সম্বন্ধে ধারণা একেবারেই ভাল নেই। Conference-এর achieve-

ment দেখে ও নির্মলদের জ্ঞানের পরিধি দেখে ওঁরা অত্যন্ত হতাশ। আমাদের সঙ্গে কথা বলতে ওঁরা বেশ eager. শচীনদার L.C-কেও সেই একই সঙ্গে আমাদের document-এর ওপর বসাতে চান। আশা করছি ২৫/২৬ তারিখে D.C ও L.C. একসঙ্গে আমাদের document সম্বন্ধে আলোচনার জন্যে আমাদের সঙ্গে বসবে ও IPTA-র অন্যান্য unit-কেও সেই আলোচনায় ডাকবে। তার ওপরে কাল রাতে উৎপলের সঙ্গে অনেক কথা হল, ও আমার সঙ্গে এই document নিয়ে বসেছে এবং আমি Party meeting-এ তাকে ডাকানোর জন্যে D.C. ও L.C.-কে অনুরোধ করছি। হয়তো ডাকানো যাবে। ওর সম্বন্ধে সবদিক থেকেই এখন party অত্যন্ত খুসী। উৎপল একবার সুযোগ পেলেই নির্মলদের সঙ্গে সঙ্গে expose করবেই। অর্থাৎ এখন এইসব মিলিয়ে party-কে খানিকটা নাড়া দেওয়া বোধহয় সম্ভব হবে।

Group Theatre-এ 'হযবরল' Script করে কাল casting করব। বুলবুল-সনৎ-কেষ্ট ইত্যাদি অত্যন্ত উৎসাহিত। গীতা ঘটক রিহার্সালে আসছে। 'সাঁকো'তে ওকে মা করাচ্ছি। 'হযবরল'তে ও অত্যন্ত কাজে আসবে।

এ চিঠিতে খালি কাজের কথাই লিখলাম।...বাইরে বাইরে ঘুরে এসে তোমার কাছে খানিক থাকতে পেলে কি স্নিগ্ধতাই না লাগত।

হে কালোরাতের রাণী, তুমি থাক তোমার তারা আর আকাশ আর রাত আর ঝড় নিয়ে—তোমার আর কি?'

৮

১২.৪.৫৫

'অরোরার কাজটার আশা এখনও সুদূরপরাহত নয়, হয়তো আর একটা Documentary এর মধ্যেই করতে পাব। এ ক'দিন এসব নিয়ে ভেবো না। দুম্‌দাম্‌ কিছু করতে বারণ করেছ, এই কথাটা বড় প্রাণে ধরেছে। সত্যি, ওমনি করেই আমি বার বার জালে জড়িয়ে পড়ি। এবার আর পড়ব না।

তোমার বাবার চিঠি না পেলে কাকে নেব, আর কাকে নেব না, ঠিক করতে পারছি না। এদিকে শৈলেন ছলছল চোখ করে ঘুরছে, অমলেশেরও প্রায় সেই দশা। কেষ্ট ডাক ছেড়ে কাঁদবে নিয়ে না গেলে। শচীন সেন prepare করছে যাবার জন্যে। নন্দ বাড়ীতে খুব সর্দারী করছে। বিজন ভট্টাচার্যও নিজের পয়সা খরচ করেও যেতে প্রস্তুত। কি যে করি! দাদারা এসব বিষয়ে সব সিদ্ধান্তের ভার আমার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে।

তোমাকে লিখেছিলাম, short hand তোমার সঙ্গে আমিও শিখব। এম.এ.-ও একসঙ্গে পড়ব। এখনও ইচ্ছে তাই। একা একা আর ধৈর্য নেই।

Group Theater-এ 'হযবরল' চলছে। গীতা একটা asset, অপূর্ব অভিনয় ক্ষমতা আছে মেয়ের। ওর দুই বোনও ওমাস থেকে এখানে থাকবে। দুটিকেই কাজে লাগিয়ে নেব।

তুমি এলে ভাল করে planning করতে হবে।

তোমার চিঠিতে ওখানকার প্রাকৃতিক বর্ণনা দাও না কেন? আরো বড়ো করে দাও। তাই নিয়ে ঝগড়া করি বটে, কিন্তু খুব খারাপ লাগে না পড়তে। আর তোমার মনের ছোঁয়া তার থেকেই পাই। আশ্চর্য জানো, সাংসারিক হিসেবের আর দৈনন্দিন চিন্তার কথা যখন লেখ তুমি, তখন জমে না। জমে যখনই তুমি অবান্তর কথায় চলে যাও। তোমার মনটা তখন বেরিয়ে আসতে থাকে। তোমার এই Depth-কে আরো বাড়াতে হবে, নইলে মুক্তিকামী মানুষদের পুরো কাজে তুমি আসবে না।

কলকাতার মধ্যেই শান্তির নীড় গড়া যায়, এ বিষয়ে আমি একমত। তার জন্য দরকার economic stability. সেটা যতদিন না গড়া যায়, ততদিন কিন্তু বড়ো কম হবে।'

৯

২৬.৪.৫৫

'হেমাঙ্গদার সঙ্গে আগামীকাল সকালে engagement। পরে জানাচ্ছি কি কথা হল। গোলাম কুদ্দুসের সঙ্গেও একটা engagement হয়েছে। জানি

না ও কি বলবে। সেটাও পরশু জানাব। পার্টির আলোচনাটা তুমি না এলে ভাল জমবে না, তাই D. C.-র বীরেন রায় ওটা মে মাসে রেখেছে। তোমার প্রতি সবাইর টান ও শ্রদ্ধাও দেখি।

তোমার চিঠিগুলো বিরাট source of inspiration. ওগুলো বড়ো সাহায্য করছে আমায়।

শ্বশুরবাড়ী এসে হাঁচি-কাশির বদনাম হবে এই ভয়ে নাই বা মারা গেলে। হাঁচি-কাশি সমেত গ্রহণ যখন করে ফেলেছি, যখন মাথাধরার কারণে কোন Court of lawই Divorce admit করবে না, তখন অগত্যা তাকে হাঁচিসমেতই নিতে হবে। কি আর করি বল।

একটু কাজের কথা শোনো। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ সলিল চৌধুরী বোম্বে থেকে এক টেলিগ্রাম করেছে, Filmistan Job almost fixed. Passage, Hotel expense free. Start immediately! একবছর আগে একটা casual কথা হয়েছিল, তারপর দুম্ করে এই তার। ফিল্মিস্তান ভারতের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান আজ। হাতে একটা পয়সা নেই যে তার করি। তারপর এখন তার করেছি, যদি তুমি প্লেনের ভাড়া পাঠাও তার করে, তবে ২ তারিখে গিয়ে ৫ তারিখের মধ্যে কলকাতায় ফিরতে পারি। Contract করে এসে fly করে শিলং গিয়ে বিয়ে করে আবার ১৫ তারিখে নাগাদ join করতে পারি। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে মাসখানেক গিয়ে বম্বেতে থেকে আসতে পারি। Contract হলে মোটা টাকা এখনই পাব, সংসার পাতার দুশ্চিন্তা থাকবে না, সব ধার মায় ভূপতির বাড়ী পর্যন্ত পরিষ্কার হয়ে যাবে। জীবনে আর কোন ক্লেদ কোথাও থাকবে না। নতুন অধ্যায় শুরু হবে জীবনে। একটি storke-এ অতীতকে দুহাতে মুছে ফেলা যাবে।

সলিলের টাকা পেলে খানিকটা ভরসা হবে। চাকরিটা হবে না, এই ধরেই এখন চলি। সেটা ধরেই বাড়ীতেও সবাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে রাঙ্গাদা। 'এ বৌটা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, সে আসার আগেই এমন প্রস্তাব আসা বিরাট শুভের চিহ্ন।' মা বলছে 'কল্যাণী বরদায়িনী আসছে ঘরে।' স্কোয়াডে বুলবুলরাও লাফাচ্ছে তাই বলে। শৈলেন নাচছে।

বাড়ীতে আর সব ভালই লাগছে। খালি 'সোম'টা ভাল লাগছে না। সেটা হচ্ছে 'এমন বাঁদরের গলায় শেষে মুক্তোর মালা পড়ল, অশেষ দুর্গতি করে ছাড়বে মেয়েটার'।

উদ্বেগ আর আশঙ্কা, Security নেই তো জীবনে কোন। যা ধারণ করে থাকে তাই যদি ধর্ম হয়। তবে তুমি আমার ধর্ম। ভালবাসতে হলে চাই Classical approach, নীরবে ভালবাসার সাধনা করা—সে করা কি কোনোদিন হয়ে উঠবে নিকট ভবিষ্যতে!

'নাগরিক'-এ একটা Dialogue লিখেছিলাম। নায়ক নায়িকাকে বলছে 'ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে কালো দীঘিতে অবগাহন করার মত শান্তি তোমার সান্নিধ্যে।' Sceneটা এখন বই-এ নেই। যখন লিখেছিলাম কল্পনায় কি তুমি ছিলে?—না; কারণ সে কল্পনা যে বাস্তবে এমন Literal truth হয়ে উঠবে, প্রতিটি পদক্ষেপে সত্তাকে নাড়া দেবে, যে অনুভূতি জাগাবে, তা বুঝিনি সেদিন। Communist-দের Communism চাওয়ার মত আর কি! কল্পনায় সত্যকে পেয়েছিলাম সেদিন। আজ বাস্তবে পাচ্ছি।'

১০

৫.৫.৫৫

'বিয়েটা Registration করে না করাটা জীবনের বিরাট ভুল তো নয়ই। ওটা ভুলই নয়। প্রথমতঃ এ পোড়া দেশে আইনতঃ একবর্ণ Civil marriaage সিদ্ধ নয় (পরে হতে পারে), দ্বিতীয়তঃ সাতপাক (দশম শতাব্দী থেকে ওটা Romantically প্রচলিত, জান!)

সব সত্ত্বেও মন আনন্দে ভরে উঠেছিল। ওদিককার ওসব খুঁটিনাটি চিন্তা, এদিককার এক চরম পর্যায়ের লড়াই, এক এক করে পয়সা সংগ্রহ আর ব্যবস্থা করা—এসব ক্লেদ পেরিয়ে সোনালি আলোর মত বিয়েটা আমার কাছে প্রতিভাত হচ্ছিল। তার অবাঞ্ছিত দিকগুলোও তাদের সুন্দর, মানবীয় মমতাময়, কাব্যময় অংশ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছিল। মনকাড়া লাগছিল ঘটনাটিকে।

একটি ছেলে আর একটি মেয়ের মেলাটা মানবিক প্রকাশের সৌধ শিখরের সামগ্রী বলে, আর সব কিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এমন ঘটনা বিরাট সংগটন, জগৎ সংসারটা ধনী হয়ে ওঠে এতে। এবার ছেলেটি আমি, মেয়েটি তুমি, আমার ফরমাস দেওটা চাঁদটা ঝোলানো থাকবে, অর্ডারমাফিক হাওয়াটা বাঁদরামো করবে, মন্তরের তুক এক নয়া শিলং-এর রাত জন্মাবে, প্রকৃতি আমার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে উদ্দাম, চপল হয়ে উঠবে, এমনি একটা উপলব্ধি মনের কোণে সঞ্চারিত হচ্ছিল। স্তিমিত ধ্যানমগ্ন হরগৌরীর মিলনে একটা মহত্ত্ব আছে, তাই বলে হাসি দুষ্টুমি ঠাট্টা উচ্ছলতা হৈ হৈ—হাট বসিয়ে মেলার কি কোন মূল্য নেই? (কুমারসম্ভব পড়াব এবার তোমায়,) রাবড়ী আমি সাটাতে খুব ভালবাসি, তাই বলে কোর্মা খাব না? অর্ডার দেওয়াটা হাতে ছিল না, আপাততঃ কোর্মাই ওড়াই। যখন রাবড়ী জুটল না একটা বোকা স্বামী জোটানোর মাশুল হিসেবে, তখন পাতের কোর্মাটা কুইনিন হয়ে যাবে গো আমার Das Kapital?

এ ধরনের বিয়ের একটা মাদকতা আছে, দিদিমায়ের রসিকতায় একটা ভারী বাঙালী দিক আছে, কৌতুহলী শালী-শালাজদের হরিণী নয়নের কটাক্ষের নেশা আছে—তাই ভোগ করব ভেবেছিলাম। এরপর তো তুমিই একমাত্র আমার। তার ভাল দিক হচ্ছে, যখন যেমন রূপে চাইব, পাব। খারাপ হচ্ছে, আর তো Sir মুখ বদলানো যাবে না, চোখে হাত দিয়ে আড়াল ঢেকে দেবে। (সেখানে খাঁটি বাঙ্গালী তুমি, আপত্তি করে লাভ নেই)। উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম সাত-সতেরো ভেবে।

বিপ্লবের খাতিরে আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল। দুটো দেশপাগলা ছেলেমেয়ে প্রচণ্ড য়্যাডভেঞ্চার করতে বেরোচ্ছে, ভেবে দেখেছ? একেবারে অনভিজ্ঞ, তার ওপর দুটোই খামতিতে বোঝাই। পড়বে এবং উঠবে, উঠবে এবং পড়বে, এবং এরই মাঝ দিয়ে নিজেদের আদর্শ মানুষের যে ছবি মনে আছে, তাকে নিজেদের মাধ্যমে মূর্ত করে তুলবে। যা ছিল আমার, হারিয়ে গিয়েছিল, আবার তোমাকে পাওয়ার মধ্যে দিয়ে যা ফিরে আসবে সেই হাসি হচ্ছে এ পথের আলো। জীবনের সঙ্গী আমরা, সেই স্বাস্থ্য যেখানে, জীবন সেখানে। হাসি যেখানে, স্বাস্থ্য সেখানে। শিশু হাসে,

যোদ্ধা হাসে। Matter of fact হয়েও। Practical aspect of lifeকে সমাদর করেও, গভীর দর্শনবোধের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়েও হাসি আরো বেড়ে যায়। এমনকি *Das Kapital* ও তাকে রুখতে পারে নি, ছিট্‌কে বেরিয়ে আসে।

সেদিন যারা জমবে চারপাশে, তারা না জমলেও পারত। যখন জমেইছে, তখন জমুক। জমার ভিত্তি হচ্ছে আনন্দ, আর আমরাই তার Object, বড় পবিত্র করে তুলতে পারি ও দিনটাকে।

ভবিষ্যত জীবনের কথা ভবিষ্যতে হবে। ভেবেছিলাম, বাসরঘরে কথা যেখানে স্তম্ভিত হয়ে যায়, সেখানে পৌছোব গিয়ে, দেখছি ব্যাখ্যা করতে করতেই রাত কাবার হবে। সমস্ত অতীতের দোষ খতিয়ে দেখার যে Programme আপনি দিয়েছেন, সেটাই follow করব অগত্যা। Criticism-self Criticism-এই পূর্ণিমার পরের রাতটা যাক। আর তো জীবনে সময় পাওয়া যাবে না, এদিন না হলে যে মহাভারত অশুদ্ধ।

তবে তাই হোক। কি পাল্লায় যে পড়েছি, ক'দিন আর বাঁচব কে জানে।

এ চিঠি যখন পাবে, তখন বোধহয় আমিও শিলং-এ।'

দগ্ধভাল
ঋত্বিক

৩

'বোম্বে গোরেগাঁও। ফিল্মিস্তান স্টুডিয়োর চাকরি। গোরেগাঁওতে ফিল্মিস্তান স্টুডিয়োর কাছেই একটা ছোট্ট বাসায় আমরা ছিলাম। বাসাটি পাবার আগে ছিলাম হৃষিদার (হৃষিকেশ মুখার্জি) বাড়িতে আন্ধেরীতে। হৃষিদা আমাদের জন্য খুব করেছিলেন। কাছেই ছিল বিমল রায়ের স্টুডিয়ো। দেবদাসের শুটিং দেখতে যেতাম।

সলিলদার (সলিল চৌধুরী) বাসাও ছিল আন্ধেরীতেই। গোরেগাঁওতে আমি যাই উমাপ্রসাদ মৈত্রকে নিয়ে। পরে আসে কেষ্ট মুখার্জি। কাজের চেষ্টায় কেষ্ট এক বছরের বেশি আমাদের কাছে ছিল।

গোরেগাঁও-র বাসার কথা মনে হলেই মনে পড়ে বোম্বের বর্ষার কথা। জুন থেকে সেপ্টেম্বর একনাগাড়ে বৃষ্টি। ঝড়জলে কোনও বৈচিত্র্য নেই। বিরামহীন জলপড়া।

এর মধ্যেই চাকরি, বিসর্জনের রিহার্সাল ও অন্যান্য লেখা চলছিল। চাকরি, নাটকের রিহার্সাল ও লেখা নিয়ে ঠাসবুনুন দিনগুলোর মধ্যে ফাঁক ছিল না একটুও। কিন্তু শিল্পীমন বরাবরই ফিরে যেতে চেয়েছে কলকাতায় শিল্পসৃষ্টির পরিবেশে। আবারও উল্লেখ করছি চিঠির—কারণ ওঁর চিন্তাধারার প্রকাশ আছে এতে।'

১

বোম্বে
৩০.৬.৫৫

'আমি নির্বিঘ্নে এসে পৌঁছেছি। পথে দেখলাম সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বৃষ্টি নেমেছে। যে রায়গড় কদিন আগে অমন ছিল, সেখান এখন অবিশ্রান্ত বর্ষণ। সারাপথে একবার সূর্য দেখিনি। বুঝতেই পারছ, পথে কষ্ট এবার অনেক কম ছিল। বর্ষাকালের আগমনটা কলকাতায় বসে ঠিক অনুভবে আসেনি, পথে বেরিয়ে অনুভব করলাম।

এখানে এসে সলিলের কাছে জানলাম, মুখার্জী আমার কলকাতায় দেখা না করায় মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে—বলেছে, নতুন বিয়ে করার ফলে আগামী একবছর নাকি আমি অকেজো থাকব, ও নাকি চাকরী দিয়ে ভুল করেছে। যাই হোক, কালই আমি দেখা করি এবং আজেবাজে বলে লিখিতভাবে কাজে join করি। কিন্তু কাজের যা ধারা দেখছি, অত্যন্ত খারাপ লাগছে। আসলে কোন কাজই নেই, মিছিমিছি আজেবাজে লিখতে হবে এখন, আর দশটা-পাঁচটা গিয়ে বসে থাকতে হবে। মুখার্জীর বিরূপতা ঠেলে খুব এগোনোও আগামী দু-একমাসে যাবে না।

দাঁতে দাঁত চেপে শুধু পয়সার জন্যে এখন চেষ্টা করা। কতদূর সফল হব জানি না। আর কিছু এখানে সম্ভব হবে না। ভাল কাজ করা, নিজের

ক্ষমতা প্রকাশ করা বা সত্যিকারের খ্যাতির দিকে এগোনো, এসব সুদূরপরাহত মনে হচ্ছে। শুধুই মাসিক আয়ের পথ দেখা।

দেখো লক্ষ্মী, এ জীবন আমাদের নয়। পয়সার জন্যে করে যাওয়া, আগে করিনি। এখন করতে ঘেন্না হচ্ছে। যে করে হোক, হাজারখানেক টাকার দেনা শোধ করতে পারলে, আর ভূপতিকে বছরখানেক মাসিক একশো করে দিতে পারলে আমি এসব ছেড়ে দেব। এ হবে না। আশেপাশে তো দেখছি, মাসে ৩।৪ হাজার টাকা আয় করেও শান্তি নেই কারো। অথচ নিজের মনের মত কাজ করে এক পয়সাও না কামিয়ে আমি শান্তি পেয়েছি আগে।

যা ঠিক করেছি শোনো। এই ফিল্মিস্তানের চাকরীটা কতদিন থাকবে, জানি না। যতদিন থাকে, এটাকে অবলম্বন করে একটা বাঁধা আয় হবে যত কমই হোক, ততদিন আমি সময়টাকে সত্যিকারের কাজ করার দিকে ব্যবহার করব।

প্রথমতঃ 'জ্বালা'টা শিগগির শেষ করে পাঠাব। তারপর, একটা নতুন One act play-এর প্লট ভেবেছি, সেটা লিখে ফেলব। আর তারপর একটা উপন্যাস মনে মনে ছক করছি, এবার আমি লিখতে বসবই। এইসব কাজের ওপরেই আমার জীবন নির্ভর করছে, ফিল্মে serious কিছু করা যাবে, করতে দেবে না। আগামী তিনমাস এই সবগুলোই করব।

Group Theatre-এর ব্যাপার কি হবে, বুঝতে পারছি না। তবে তুমি আঁকড়ে রাখার চেষ্টা কোর সবাইকে খবর দিয়ে। পার্টির গণ্ডগোল যে-কোনদিকে মোড় নিতে পারে। সমস্যা উঠবেই। তাতে করে নিজেদের কাজ বন্ধ কোর না। কিন্তু পার্টির ব্যাপারটিও বেশীদিন এভাবে চলবে না। একটা ফয়সালা তোমাদের করতেই হবে।

এসবগুলো ছাড়াও পয়সা উপার্জনের চেষ্টা তোমায় করতে হবে। আমি কলকাতা ছাড়তে চাই না। ওখানেই যদি মাসে ৩/৪শ' টাকা দুজনে মিলে আয় করতে পারি তাহলেই আমার স্বর্গসুখ পাওয়া হয়। ফিল্মে নামকরা আর উন্নতি করার জন্য যে দাম আমায় এখানে দিতে হবে, তা দিতে আমি চাই না। কলকাতায় লিখে বা অন্য কিছু করে বা Documen-

tary করে যদি মাসে ঐ টাকা পাই, আর দু-তিন বছর বাদে বাদে একটা ছবি করতে পাই, তাহলে একেবারে Ideal হয়। নিজেদের জীবনটাকে গুছিয়ে তাহলে plan করতে পারি, বাঁচতে পারি।

তোমাকে আমি পেলাম। ভাল করে পাবার আগেই এইসব জঞ্জাল শুরু হয়ে গেল। যদি সুযোগ পাই, তাহলে আগামী একবছর আমি এই জঞ্জাল সাফ করব এই বম্বেতে বসে, আর তুমি প্রস্তুত করবে নিজেকে। অন্ততঃ এই বছরটা আমি দেখবই। আর সুযোগ খুঁজব কি করে কলকাতায় কিছু আয়ের পথ করা যায়। একবার করতে পারলে এখানে আর একদিনও থাকা নয়।'

২

বোম্বে
৫.৭.৫৫

'বিমলদা আমার গল্পটা এখনই কিনে নেবেন এবং বিমল রায় প্রোডাকসন থেকে আগামী ছবি করবেন জানা গেল। আজ থেকে বসতে বলেছেন। ৫।৬ দিনের মধ্যে শ'পাঁচেক টাকা advance দেবেন।

গোরেগাঁওতে (আমাদের স্টুডিও যেখানে) একটি ছোট বাড়ী পেয়েছি। যদি বিমলদার টাকা পাই, তাহলে নিয়ে নেব। বিমলদার টাকা এখনও হাতে আসেনি, আর ফিল্ম লাইনের কথার কিছুই স্থিরতা নেই। তবু এবারে মনে হচ্ছে পেয়ে যাব। সমস্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাব এবার যদি টাকাটা পাই। তাই না পাওয়া পর্যন্ত বড় ভয় করছে।

ফিল্মিস্তানের জন্যে একটা গল্প ভেবেছি। বড় ভাল লাগছে নিজের। একজন atomic scientist রিসার্চ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর স্বপ্ন দেখছে, যখন Universal Scientific Community হয়ে গেছে। যথারীতি নাচ-গান রোমান্সের অবকাশ রাখতেই হবে, জমাট নাটুকেপনাও করতেই হবে, বোম্বে ফিল্মের সব উপাদানই ঢোকাতে হবে। তবু scientific advancement আর Social structare আর Psy-

chological evolutionটা সম্পূর্ণ বজায় রাখা যাবে অথচ মজার গল্প হবে। পুজোর সময় কলকাতায় গিয়ে ডাঃ মেঘনাদ সাহার কাছ থেকে সাহায্য চাইব। এখানেও Nuclear Physics Laboratory-র কর্তাদের সাহায্য গ্রহণ করা হবে। গল্পটা শশধর মুখার্জী পরশু শুনতে চায়, যদি পছন্দ করে, তাহলে ভাল কিছু করার দুরাশা করা যাবে।

এ সমস্ত কিছুতেই আমার অত্যন্ত একাগ্রতা দরকার। কিন্তু তোমার খবর না পেয়ে মন বড় অশান্ত হয়ে থাকে। সপ্তাহে অন্তত চারটে চিঠি তোমার কাছ থেকে আসা উচিৎ। আমার জীবনের আনন্দের উৎস হচ্ছ তুমি।'

৩

বোম্বে

১১.৭.৫৫

'...অনেকদিন আগে একটা মুখের কথা লিখেছিলাম মনে পড়ছে। শ্যামলা রঙের একটা মুখ। পেছনে কালো জলের ছলকানো, তারই পটভূমিতে সে মুখ।

আজ গানের প্রথম কলির মত সে মুখটা ঘুরে ঘুরে সামনে আসছে। জীবন গানের প্রথম কলি। তাই আবার সে মুখের কথা লিখলাম। জীবনময় লিখব।

'সঞ্চয়িতা'-র প্রথম দিকের 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটা পড়। বুড়ো আগেভাগে সকলের মনের ভাব লিখে গেছে। আমারও।

...আর একটা জিনিস গত পূজো থেকে সত্যিই হয়ে গিয়েছিল। একটার পর একটা ব্যর্থতা, আশাভঙ্গ, বেকারী, অর্থাভাব—এসবের ওপরে ঘৃণ্য পরপর রাজনৈতিক আক্রমণ আমার স্বাস্থ্য ভেতরে ভেতরে একদম ভেঙ্গে দিয়েছিল। শুধু মনের জোরে চলেছি, নিজেই জানতাম না। একজন পর্যটক যেমন করে মরুভূমির ভেতরে জল না পেয়েও একগুঁয়ে হয়ে চলে

মরুদ্যানে পৌঁছয়ই, কিন্তু স্বাস্থ্য চুরমার হয়ে যায়। আমার ভেতরে প্রাণশক্তি ফুরিয়ে গেছে, জান! আজ ডাক্তার বলেছে।

ডাক্তারের মতে আমার এখন বাঁধা জীবন দরকার। আগের চিঠিতে তোমাকে লিখেছি, নিমোনিয়া হয়েছিল। এখন সেরেছে, খুব দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু নেই। এখন রুটিন বাঁধা খাওয়া শোওয়া, টনিক খাওয়া, এইভাবে চললে স্বাস্থ্যটা আবার দাঁড়িয়ে যাবে।

তোমাকে না পেলে আমি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতাম। আর্থিক-অনটন সাময়িক বলে এখন আমার মনে হয়। হয়তো একে কাটিয়ে সাধারণ জীবনযাপনের উপযুক্ত আয় আমি করতে পারব। কিন্তু সেই সঙ্গে আর সবদিক ফলেফুলে ভরে তুলতে হবে।'

৪

বোম্বে
১০.১১.৫৫

'...হঠাৎ আজ সেজদার চিঠি পেলাম Central Government থেকে 'নাগরিক' State Award দেবার জন্যে মনোনীত হয়েছে। এতবড় সম্মান হঠাৎ এসে হাজির। এত দুঃখের পরে আজ কি সত্যিই কপালে জয়তিলক আঁকা হবে?

এ যদি হয়, তাহলে তোমার আমার জীবনের অনেক জটিলতা কেটে যাবে। সংগ্রামের স্তর হয়ে যাবে ভিন্ন, অন্ততঃ প্রতিষ্ঠা ও সম্মান অনেক বেশী হয়ে যাবে। এরই মধ্যে Filmistan-এ এর ফল ফলতে আরম্ভ করেছে। ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান, নিজের ক্ষেত্রে প্রচুর প্রতিপত্তি, এই হবে এর ফল।

ক্রমশঃই সংস্কার এসে যাচ্ছে তোমার সম্বন্ধে, তুমি কি সত্যিই লক্ষ্মী?'

৫

২৪.১১.৫৫

'নাগরিক-এর application দিতে দেরী হয়ে গিয়েছিল। তবু ওরা accept করেছে বলে সেজদা জানিয়েছে। Competition-এর ফলাফল এখনও পাইনি।

State award পাওয়া এবং মুক্তি পাওয়া সম্বন্ধে এখনও কিছুরই স্থিরত্ব নেই। দিন পনেরোর মধ্যেই যা হবার তা হবে।

আনন্দ এইটুকুই, ছবিটা স্বীকৃতি পেয়েছে। এর বেশী এখন না ভাবাই ভাল।

ইতিমধ্যেই চৌধুরী ইনিয়েবিনিয়ে একটা চিঠি দিয়েছিল, তার জবাবে বেশ কিছু লিখে দেওয়া গেছে। মনে হয়, এবার একটা শেষ চেষ্টা ও করবে। সেজদাকেও লিখেছি।

পার্টির উত্তর দিতে বড় দেরী হয়ে গেল। কিছুতেই এর আগে আর গুছিয়ে উঠতে পারলাম না। গতকাল type করে এক রাম চিঠি দিয়েছি। তবে আশা করা বৃথা, এ সম্বন্ধে আর ভাবছি না এখনকার মত।

এইমাত্র বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভ স্টুডিওর সামনে দিয়ে আরে কলোনীতে গেলেন।

এই পচা কমার্শিয়াল শহরটার মধ্যে প্রাণ জেগেছে দেখা গেল দুদিন আগে সংযুক্ত মহারাষ্ট্র আন্দোলনে। মনে হচ্ছিল, কলকাতায় আছি। আবার তারই প্রকাশ সোভিয়েত নেতাদের স্বতঃস্ফূর্ত সম্বর্ধনাতে। সোভিয়েতকে এরা এত ভালবাসে! আর সত্যিকারের নেতা, সত্যিকারের খাঁটি অপূর্ব মানুষ মনে হল বিশেষ করে ক্রুশ্চেভকে। এদেশে কম্যুনিষ্ট বিপ্লব যে কত শিগগির এগিয়ে আসছে, কত গভীরে যে নাড়া খাচ্ছে পাঁচহাজার বছর ধরে সভ্য এই জাতটা!

এখন মনে হয় দুঃখ নেই, ইতিহাসের গতিরোধ করা সম্ভব নয়, ভারতবর্ষ শোষিত নিপীড়িতদের মুক্তি দিয়ে জাতীয়মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর মুক্তি নিয়ে আসবেই। দেরী হচ্ছে, বিভ্রান্তি হচ্ছে...

ভয় নেই, মরার আগেই দেখে যাব আমরা ভারতবর্ষ মুক্ত জনতার পুরোভাগে, পৃথিবী শোষণের বাঁধন ছিঁড়েছে, বিজ্ঞান নবজাতক গ্রহের জন্ম দিয়েছে। ভগবান হয়তো পিছু হটতে হটতে গিয়ে মঙ্গলগ্রহে আড্ডা গেড়েছে—পৃথিবীটাকে বিজ্ঞানের হাতে ছেড়ে দিয়েছে।

এ সবই আমরা বেঁচে থাকতেই হবে। মুষড়ে পড়ো না, এর জন্য আমাদের যা করণীয়, করে আমরা যাবই। সক্রিয়ভাবে ইতিহাসের সামিল, হব, হাজার হাজার জনতার ভাল করব।

মার চিঠি পেয়েছি, বড় টানাটানি। টাকা পাঠিয়েছি। সীতাদিদের সঙ্গে 'বিসর্জন' ধরেছি।

এখানে মৃণাল সেন ও সমরেশ বসু চাকরী সংক্রান্ত কাজে এসেছে। মৃণালের সঙ্গে গল্প করে বড় আনন্দে কাটছে।'

৬

বোম্বে

৬.১২.৫৫

'...আমার চরিত্রের প্রধান একটা দিক যেখানে অভাব, সেটা হচ্ছে আজো পর্যন্ত আমি আমার কাজে সাফল্যের স্বাদ পাইনি। কোন কাজ শেষ পর্যন্ত সুসমাপ্ত করে উঠতে পারিনি আমি। হয়তো এবার পারব। সেইটি পাবার দিকে একাগ্র হতে গিয়ে অনেক কিছুকে তাচ্ছিল্য করেছি...একটি পুরুষের জীবনে এটা যে কতবড় অভাব, এবং এটা যে কিভাবে চরিত্রের খারাপ দিকগুলোকে জাগ্রত করে, ভাবলে বুঝতে পারবে। আমার পরিস্থিতি আশপাশ, অতীত এগুলোকে বোঝ। অনেক দোষের কারণগুলোকে খুঁজে পাবে, কাটাবারও পথ পাবে।...'

৭

বোম্বে
১০.১২.৫৫

'...গত চিঠিতে লেখার কথা তোমাকে লিখেছি, এ চিঠিতে দেখলাম তুমিও তাই ভাবছ। তুমি আমাকে একদিকে মাত্র অপূর্ণ রেখেছ। তোমার সৃষ্টিশীলতার গৌরবে কবে আমি গর্ব অনুভব করতে পারব?

তোমার সৃষ্টির মধ্যে তোমাকে দেখতে চাই। তোমার কল্পনার রাশ ছাড়ার মধ্যে আমার জন্যে অনেক কিছু রেখেছ দেখলাম, প্রতিষ্ঠা, নিজের Production, আদর্শ Stage, আরো কতো কি! আর নিজের জন্যে? একটুখানি হয়তো প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

বাঙ্গালীর ঘরের সেই চিরন্তন লক্ষ্মীর নিঃস্বার্থ মনোভাব। কিন্তু এ চলবে না। নিজেকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে হবে, আকুল হয়ে উঠতে হবে,—অনেক দূরের তারায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। তোমার মনের ছোঁয়া পেয়ে আমার মন বিকশিত হচ্ছে, আর তুমি নিজে সেই অপরূপ ঐশ্বর্য নিয়ে একটুখানি হয়তো এগোবে?

বাঙ্গালীর ঘরে, দেশের অখ্যাত কোনায় কত মেয়ে আটকে পড়ে কাতরাচ্ছে, কত মেয়ে নিজেকে নিংড়ে নিঃশেষ করে দিচ্ছে নিজেদের আপনার জনের জন্যে, কত মেয়ে অসীম শক্তি নিয়ে থরথর করে কেঁপে ফুটে বেরোতে না পেরে একদিন শুকিয়ে মরে যাচ্ছে,—তাদের সকলের অব্যক্ত কান্না তোমার কাছে পৌঁচেছে, তুমি চীৎকার করে বলবে না? কতশো বছরের যে মহান বাংলা সংস্কৃতি, মানবতাবোধের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ যেখানে—তার ধারাকে বয়ে নিয়ে এসে আজকের মহাসমুদ্রে ঢেলে দেবার দায়িত্ব কার?

যে জ্বালা, যে দীপ্ত অনুভূতি তোমার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, তাকে প্রকাশ তোমাকে করতেই হবে। আর তারই মধ্যে দিয়ে সার্থক হয়ে উঠবে তুমি, হয়ে উঠবো আমি।

দুঃখের পাথার আছে সামনে। অনেক অভাব, অনেক কষ্ট, অনেক

অবজ্ঞা সহ্য করা এখনও বাকী, একথা জানি। আর এও জানি আমাদের দুজনের মেলার মত এত বড় ঘটনাটা যখন ঘটে গেছে, তখন সবকিছু আমরা পেরোবই, আর পেরিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করছে আদর্শ সাধনের মধ্যেকার যে তৃপ্তি, যে আনন্দ, তাকে পাবই। তাই আমি এখন বেপরোয়া, এবার রওনা হব। আমি তৈরী। তুমি কেন আর দেরী করবে?

সমরেশ বসু এখানে আছে, তার সঙ্গে লেখা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। সে বলে, তোমার ও আমার লেখা এই মুহূর্তে সে বই করে ছাপার ব্যবস্থা করে দিতে পারে। আমার উপর তার অত্যন্ত শ্রদ্ধা। 'বিসর্জন' এখন পুরোদমে চলছে। এখানের সবাই অত্যন্ত মুগ্ধ।'

৮

বোম্বে
১৬.১২.৫৫

'আমার মনে হচ্ছে, অনেক কিছু আবার বোধহয় মোড় ঘুরতে চলেছে। প্রথমতঃ যে গল্প তৈরী করেছিলাম, সেটা মুখার্জীর পছন্দ হয় নি। সে আরো বোম্বাই মার্কা ব্যাপার করতে চায়। সেরকম করে কখনো ভাবিনি, আর ভাবতেও ভাল লাগে না, কাজেই জানি না কতদূর তার পছন্দসই করে বদল করতে পারব। তবে লড়াই না করে ছাড়ব না, আপ্রাণ চেষ্টা করব যতখানি প্রাণবন্ত রাখা যায় গল্পটা। গল্প অদলবদল নিয়েই ভয়ংকর খাটতে হচ্ছে এখন। এটা এখন এমন পর্যায়ে এসে পড়েছে যে reject-ও হয়ে যেতে পারে, আবার আমার কথামতও হতে পারে।

এ বিষয়ে আশা করছি এক সপ্তাহের মধ্যেই স্থির হবে। এইসব ঝামেলার মধ্যে আমার মাইনে বাড়ার কথা চাপা পড়ে গেছে। আমি চিঠি দিয়েছিলাম Officially, উত্তর দেয় নি।

ইতিমধ্যে নিরঞ্জন সেনের ভাই মটা এসে ঝোলাঝুলি করছে, ওর কোম্পানী থেকে বিমল রায় একটা বাংলা ছবি Produce করছেন, সেটা পরিচালনা করে দেবার জন্যে। সেটা কলকাতায় করতে হবে।...

কলকাতায় ফিরলে রাধা ফিল্মস এখনই আমাকে পরিচালনার দায়িত্ব দিতে চায়। সেটা মটার through দিয়ে রাধার মালিক জানিয়েছেন— সেজদার চিঠিতে জানলাম, অরোরার ওরাও আমাকে পেলে কাজ দেয়। এসব ধরতে পারা যায়, যদি সম্মানের সঙ্গে একটা কাজ হাতে নিয়ে কলকাতায় ফিরতে পারি। অন্ততঃ ছয়মাসের security নিয়ে ফিরলে হয়তো চেষ্টা করা যায়।

এখান থেকে পালাবার কথা ভেবে মন খুসী হচ্ছে, আবার কলকাতায় আর্থিক জীবনের কথা ভেবে দমে যাচ্ছি, যা হয় করব। সমস্ত development-এর বিষয়ে তোমাকে যত শীঘ্র পারি জানাব। নেই একটা ঝুঁকি, কি বল প্রাণের লক্ষ্মী?'

৯

১লা জানুয়ারী
১৯৫৬

'...আজ পয়লা জানুয়ারী আমার মন একদিকে বড় মুষড়ে গেছে, আর একদিকে কাজের কথা খালি মাথায় এসে ভীড় করছে।

পঞ্চান্ন সালে পেলাম কি? আর হারালাম কোথায়? প্রথম পাওয়া তোমাকে...ও বছরটা আরম্ভ করেছিলাম রিক্ত অবস্থায়, কোথাও কিছু ছিলনা আমার, পার্টি থেকে অবাঞ্ছিত, আর্থিক চরম জঞ্জালে, দৈহিক শ্রান্তিতে বোঝাই, মনে পরম দীনতা, আশা মৃত, কোনদিন কিছু হবে না আমার এই ধারণা বদ্ধমূল, প্রতিকূল স্রোত তখন জোরে বইছে। আমার জীবনে কোন ঘটনা ঘটবে একথা মনে হত না। একলা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ, বন্দীজীবন। গোটা কয় ছেলে আর তুমি, আমার শেষ আশ্রয়। সেদিনের যা কিছু করেছি, কোন জিনিসই সফল সার্থকতায় পৌছয়নি। এই হচ্ছে, ১৯৫৫ সালের ১লা জানুয়ারী।

আর আজ? তুমি আমার হয়েছ। নিজেদের কাছে নয়, সামাজিক ভাবেও। আমার পরম সম্পদ, জীবনের চিরকালের বিস্ময়, তোমাকে আমি

আপন করেছি এই বছরটার মধ্যে। তোমার মধ্যে দিয়ে আমি সমাজ-জীবনে শিকড় খুঁজে পেলাম।

এখন শত আঘাতেও সহ্য করতে পারি। কোন বিপদেই মন আগের মত মুষড়ে পড়ে না, অদ্ভুত একটা জোর সবসময় মনের মধ্যে আছে। একজন আমাকে ভালবাসে, একজনের কাছে আমি সার্থক, সে আমার শত দোষ সত্ত্বেও সম্পূর্ণ গ্রহণ করে,... এই ঘটনা যে আমার মাথা উঁচু করে তুলছে, তা লিখে বোঝানো যায় না। আমি আজকাল প্রতিপদে এটা অনুভব করছি। আমি আমার জীবনের ব্রতে সফল হবই।

এ বছরে হয়েছে একটা চাকরী। অত্যন্ত দীন। কিন্তু নিজে উপায় করে গ্রাসাচ্ছাদন করার পথ একটা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিত পাচ্ছি আজকে, আগামী দিনে শিল্পজীবনে সার্থকতা হয়তো আসবে। অর্থাৎ সংগ্রাম করার আশা আজকে আছে। কিছু বন্ধু পেয়েছি আবার। আবার নিজেকে প্রসারিত করে দেবার অবকাশ বুঝি তৈরী হল।

কিন্তু চিরদিনের মত পার্টি আমার হারালো—জীবনে আদর্শ যা ছিল, জলাঞ্জলি গেল। আমার প্রতিজ্ঞা করতে ইচ্ছে করছে, আবার পার্টিতে সগৌরবে একদিন ফিরে যাবই। পার্টির গলদ যাবে, আমাকে বুঝবে, আমার আশেপাশে আবার কাজের উদ্যম আর ব্যস্ততা চলবে। এর মধ্যে ঢুকে যেতে না পারলে জীবনে কিছুতেই আনন্দ নেই।

আর এসে জুটেছে এ বছরে এক ক্লেদাক্ত ঘৃণ্য পরিবেশ। এই যান্ত্রিক শহরের সমস্ত পচা নোংরামি আমায় ক্রমশঃ পাগল করে তুলছে। কী করে এবছর ফুরোবার আগেই নিজের জমিতে ফিরে গিয়ে গ্রাসাচ্ছাদন করা যায়, শিল্পসৃষ্টি করা যায়—তার পরিকল্পনা করতে হবে।

কলকাতায় ছবি পরিচালনা করার সুযোগ আগামী জুনের মধ্যে করতেই হবে। এবং এবার সুযোগ পেলে, তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার প্রাণ ঢেলে করতে হবে। তার ওপরেই নির্ভর করছে ভবিষ্যতে শিল্পচেষ্টার সুযোগ ও দেশে থেকে খাবার অবকাশ।

এই হচ্ছে আমার বছরকার মূল কাজ। আমাকে বাংলায় একটি ছবি সম্পূর্ণ করতে হবে আমার সমস্ত ক্ষমতা উজাড় করে দিয়ে।

দ্বিতীয়তঃ তোমার লেখাকে আঁকড়ে ধরতেই হবে এবার থেকে।

তোমার প্রচণ্ড সংবেদনশীল মনকে এবার সবার সামনে তুলে ধরতে হবে। সেই Introductionই হচ্ছে আমার প্রধান করণীয়। এইসঙ্গে আমার লেখাও আবার শুরু করতে হবে। এবং আমি তা করব। লেখক হিসেবে নাম আমাকে করতে হবে। এর সঙ্গে, যে ছেলেগুলো আমার চরম বিপদের দিনে আমার সঙ্গী ছিল, তাদের নিয়ে নাটক তৈরী করতেই হবে। এ বছরের মধ্যে Group Theatre-এর অন্ততঃ একটি নতুন নাটক পেশ করতে হবে।

১৯৫৭ সালের ১লা জানুয়ারী আমাদের গর্বের সঙ্গে বলতেই হবে, এগুলো আমরা অর্জন করেছি।

এইসঙ্গে পার্টি ও জনতার কাজে আরো কাছে এগিয়ে যাব আমরা। হয়তো এত শীঘ্র পুরোটা হবে না, কিন্তু পথে যে এগোচ্ছি, তার আভাস পাব।

আমরা কি ফুলেফলে ভরে উঠব না?'

১০

৮.১.৫৬
বোম্বে

'তুমি আসার সময় উমাটাকে কি শৈলেনটাকে নিয়ে এলে জমবে খুব। নাটক জমছে। ফেব্রুয়ারীতে show আর অনেক নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। সলিলও আমাকে কেন জানি না হঠাৎ ভালবেসে ফেলেছে। সেদিন আচমকা বলল, আমার জন্যে সত্যি ও একটা টান অনুভব করতে আরম্ভ করেছে। সেটা আমিও দেখতে পাচ্ছি।

মার জন্যে, সেজবৌদির বাচ্চাদের জন্যে, সেজদার জন্যে আজ আমার বড় মন কেমন করছে। ওদের সকলকে ভাল করে আদর শ্রদ্ধা করে এস। মাকে বোল, যে করে হোক প্রতিমাসে আমি টাকা পাঠাবই।

তোমার শেষ চিঠি সম্বন্ধে আর কি লিখব। আমার সমস্ত কল্যাণ কামনা রইল তোমার জন্যে, তোমার জন্যেই আমার সমস্ত কিছু উৎসর্গ করা রইল।

তুমি না থাকলে কোথায় চলে যেতাম, ভাবতে ভয় করে, তুমি থাকতে কোথায় যাচ্ছি, ভাবতে জোর আসে।'

চিঠিগুলো পড়তে পড়তে ও অনুলিপি করতে করতে চলে গিয়েছিলাম সুদূর অতীতে। বার বার মনে হচ্ছে ওই সময়কার অবস্থা, চিন্তাধারা ও মনোভাবের প্রকাশ, যে ভাবে আছে, আমি নিজের ভাষায় লিখে তা ব্যক্ত করতে পারতাম না। মনে পড়ে কী গভীর স্নেহভালোবাসা ও একটি মঙ্গ লাকাঙ্ক্ষা ঘিরে ছিল আমার জীবনকে।

সমস্ত হতাশা, বেকারি, অর্থাভাব, অবজ্ঞা, অপমানের থেকে জীবন ফুলে-ফলে ভরার প্রতিজ্ঞা নিয়ে শুরু হল ১৯৫৬ সাল।

জীবনে একটি অধ্যায়ের শেষ।

৪

১৯৫৬ সালের কথা মনে হলেই মনে পড়ে মা'র কথা। আমি কিছুদিন শিলংয়ে বাবার কাছে থেকে, বোম্বে যাবার আগে ক'দিন কলকাতায় মা'র কাছে ছিলাম। মা'র কাছে ওই ক'দিন থাকা আমার জীবনের উজ্জ্বলতম ও মধুরতম স্মৃতি।

বিয়ের আগেই মা'র সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল। বিয়ের পরে মা আমার বাবাকে চিঠি লিখেছিলেন: '...বাড়ীতে সকলের ছোট বৌ হোল ও, কাজেই লক্ষ্মীকে খুব আদরের সঙ্গেই সবাই গ্রহণ করিয়াছি।...আমার সাধ্যানুযায়ী লক্ষ্মীর আদর যত্নের কোন ত্রুটি হইবে না'...মা আমাকে ঘোমটা দিতে বারণ করেছিলেন। আর বার বার বলেছিলেন—'তুমি মেয়ের মতো থাকবে।' ওই চিঠিতেই আমার দিদিমা সম্বন্ধে লিখেছিলেন—'শ্রীমতির সাথে যে সব মিষ্টি আসিয়াছে, এখনকার দিনে এ সকল মিষ্টি দুর্লভ তৈরী

ও অতি চমৎকার হইয়াছে। আমার শাশুড়ীর মৃত্যুর পরে এই চিড়া জিরা প্রথম দেখিলাম। যিনি এই সকল খাবার করিয়াছেন, তিনি আমার নমস্যা।'

দিদিমার তৈরি মিষ্টি নাতনিজামাই বিয়ের দিন সারাদিনই খেয়েছিলেন।

এই সময় তাঁর আদরযত্নের কথা জীবনে ভুলব না। রোজ সকালে জিজ্ঞেস করতেন 'আজ কী খাবে?' আর বলতেন, 'আজ লক্ষ্মী রান্না করবে।' এরপর গুছিয়ে দিলে নিজেই রান্না করতেন। আমি ওই ফাঁকে তাঁর ঘর, বিছানা, জামাকাপড় পরিষ্কার করতাম, রোদে দিতাম। বিকেলে সবাইকে বলতেন—লক্ষ্মী এই করেছে, ওই করেছে।

রোজ সকালে কাসুন্দি ইত্যাদি রোদে দিতাম। বলতেন, 'তোমাকে সব শিখিয়ে দেব।'

পৌষসংক্রান্তির দিন বহু বছর পর পিঠে করলেন, সেইদিন ও যে ক'দিন ছিলাম রোজ বলতেন: সামনের বছর আমি থাকব না তুমি বা তোমরা করবে।' ভাবতাম বয়স হয়েছে তাই এই রকম বলছেন। বোম্বে চলে আসার দিন বার বার বললেন 'দুজন মিলে সুখেশান্তিতে ঘরসংসার করো।' আরও বহু কথা।

বিয়ের পর যেদিন প্রথম আসি সেদিন বলেছিলেন: 'তুমি আমার শেষজীবনে এসেছ, আমি তোমাকে অনেক কিছু দিতে পারলাম না, কিন্তু প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি। আর টাকাপয়সাটা জীবনে বড় নয়, মনের শান্তিটা বড়।'

আমার দিদিমাও বিয়ের সময়ে আশ্চর্যভাবে এই কথাই বলেছিলেন: 'জীবনে টাকাটা বড় নয়, মনের শান্তিটাই বড়।

দিদিমা ছিলেন হাকিমগিন্নি। আমার দাদামশাই ছিলেন E. A. C., মা ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেটগিন্নি। সুতরাং দু'জনেরই মুখে সেদিন ওই কথাগুলো শুনে অবাক হয়েছিলাম।

আজ ভাবি, এর আগেও বার বার মনে হয়েছে—মা ও দিদিমার আশীর্বাদেই জীবনে বড় বিপদের দিন পার হয়ে এসেছি। আর তাঁদের আশীর্বাদেই বোধহয় জীবনে একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছোব।

বোম্বে চলে আসি। তিন দিন পরেই টেলিগ্রাম এল, মা'র খুব খারাপ

অবস্থা। আমরা সে-দিনই কলকাতা রওয়ানা হই। সকালে পৌঁছে প্রণাম করি। ওই অসুস্থতার মধ্যেও প্রণাম করলে মা আশীর্বাদ করেন। রাত্রে আমার ভাগনিকে বলি, 'আজ রাত্রে আমি মা'র কাছে বসব ও জাগব।'

ভোরে মা শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।

পরম স্নেহশীলা, ধৈর্যশীলা ও একজন মহীয়সী মহিলা হিসাবে মা'র স্মৃতি আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। মাকে কোনও দিন ভুলব না।

টেলিগ্রাম পেয়ে কলকাতা যাবার আগে শশধর মুখার্জি কিছু টাকা অগ্রিম দিয়েছিলেন। এমনিতে স্নেহও করতেন। এবার বেশ-কিছুদিন উনি বোধহয় চিকিৎসার জন্য বিলেতে ছিলেন। ফিরে আসার আগেই 'মধুমতী'র চিত্রনাট্য লেখা আরম্ভ হয়েছিল। ফিল্মিস্তানের জন্য 'রাজা' গল্পটিই চিত্রনাট্য আকারে লেখা চলছিল। বার বার অনেক বদলাতে হচ্ছিল। কিছুতেই পছন্দ হয় না, এদিকে মাইনেও বাড়েনি। সুতরাং চাকরি ছেড়ে দেওয়াই স্থির করেন। শশধরবাবুকে লিখেছিলেন ওই সময়ে।

177, Jawaher Nagar
Goregaon,
Bombay, 10th April '56.

Mr. Mukherjee, Sir,

I take this opportunity to express my heartfelt good wishes for your quick and complete recovery. Believe me, Sir, I was extremely anxious about you when I heard of the operation. I was also touched by your most impassioned letter written to the staff.

I, of all persons, have much reason to feel grateful to you. You know the reasons. As you know, I took up this position here in Filmistan to be near you and to watch the inner workings of the most successful filmmaking process in India from close quarters.

I have done so for about ten months now.

I think I have learnt a point or two. At least my vision has changed to a great extent by coming here from the back waters of Bengal.

This I owe solely to you.

One day, in the very beginning, you told me that you are not interested in developing personal relations with me, your sole concern being work.

In the past agonising and inactive months, you have had opportunities to know me for all my worth and you must have formed your opinion. My sincere desire is to see your opinion translated into action.

I am ever ready to take the rough with the smooth.

But, before taking the plunge, one thing seems to be my duty, I must speak out my reactions.

This I will do, because I know you are always full of thought for your work. You know everybody is a nonentity minus his work. And so, how to improve, how to keep up the pace, how to scare again and again, these are always upermost in your mind.

In your bed of convalescence, you have a rare opportunity for a re-appraisal. This chance will be denied to you the moment you set foot here.

I consider you the most incisive intellect I have met in this industry. Your range is wide, you can contact any subject, any emotion, any new mode of approach. If you suffer you suffer by default,–by a negative surrounding which constantly beds you down into the sure of dogma and groves of well set patterns.

This is your struggle.

But to-day you are in a country where you can see the pictures which will make you feel that it all is not bluff, and one thing you may become conscious of Filmi's increasingly becoming adult. Approach of naive hypocrisy and pandering to the baser intincts of men alone is not always enough to day for delivering the goods.

Even with the fear of boring you with a long and uncalled for letter I must put forward a suggestion.

To-day, a window has to be opened,

This has become the prime necessity for everyone who wants to go forward.

You are a worshipper of facts, Sir, And what is more, you are also a manufacturer of facts. You know facts are not born, they are made.

My request is to you, please create a corner where new facts can be made.

Make a department for experimental film making Appoint persons with necessary flares, put all sorts of hurdles before them,–a low budget, no stars, no good equipments, no fancy name in technicians, no massive sets, no legendary music director, and also, no colour,–just ideas. Let them get out of the studios and shoot out of doors, let them know that any story can be a great story with proper treatment, and also treatment mainly includes camera treatment. Let them see the world thru' of the camera, let them explore possibilities of editing table, creative sound track, camera set-up.

I have learnt from you that film scores thru intoxication. Intoxication is easier to dish out without art. All great art is intoxication but all intoxication is not art.

And when the genuine article arrives, falsehood withers away.

Get hold of sincere workers. They themselves are intoxicated with their ideas. If properly guided, they can move mountains and can turn deserts into gardens.

This country, specially in all India field, is yet to see an honest picture. All it has met with hitherto are progressive bluffs. Things are changing. After five years, it things go on in the same way, these bluffs are bound to be at the top, in absence of the genuine article.

But the man who surreptitiously opens an window today and goes on truing to manufacture facts, is bound to scare in one of his innumerable attempts. Then the fact at the box-office will be firm. The fact then, will be worshipped by hardheaded businessman. He is you.

This is, incidentally, the way of survival. There is no other way, in the long run. The name of Filmistan, with its creator, will fade in public memory within a short time, otherwise.

Create the small corner, nurture it with step-motherly affection. Hurl obstacles in its path, those who will grow, will be sturdy. Yourself lend the specialised knowledge of unique seccess in box-office, but do not make a compromise.

Judge the results by the total effects, synthetically and not unnecessarily analytically, that is mere details approach and handling of a subject. Sometimes all the matter go down the drain when you start weighing water with a sieve.

I do not know whether this will ever come up, but if it does, I will weep in ecstasy.

You have all the qualities of being the pioneer. You can break all barrier by bringing in a fresh and powerful mind, you can throw your boys all over the country with a camera and a heart. Once the idea takes hold of your mind, the practical implementation and organisation part of it will be easy.

I, presonally, do not feel like staying here if such a small corner is not made. I do not aspire after position or money but I must feel that I am livingt a worthy life. It is better to go away anywhere else and fight tooth and nail for such intoxicating film making. I do not see any future in this smug complacency. This environment is fetter.

After all if I miss the bus I can always fall back upon my second line of defence, whatever it may be.

But what about you, Sir? You must crown your career with something profound, something enobling, something which will bring a meaning in your existence, you must have such an youthful Laboratory.

Believe me, Sir, I have not written this with any personal motivation, nor to hurt you. I have written because somchow I found somcthing which I have not found anywhere else.

In the meanwhile, I have finished detail work on the script of 'Raja' which Mr. Kaul is not doing, also I have written two stories for Sachin Sarkar about a dancer's life, and am now wirting a story about a coalmine for Bedi. All these are awaiting your return.

I do not know whether I have done right or worng by being so brutally frank with you, but I cannot ever be a

professional job-hunter in search for a career. I would rather take the risk. If I have hurt you or made you angry, pardon me. It was unintentional.

My deepest regards to you and Mrs. Mukherji.

I am, Sir,

Your faithfully
Ritwik Ghatak

শশধর মুখার্জি দেখা করবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন। উদয়শংকরের ভাই শচীনশংকরের সঙ্গে আমাদের খুবই হৃদ্যতা হয়েছিল। আমাদের গোরেগাঁওয়ের বাড়িতে আসতেন। মহেশ কাউলের বাড়িতেও দু'-একবার গিয়েছি। ফিল্মিস্তানে গল্প লেখার সময় আলোচনা হত দু'জনে মিলে। 'মধুমতী' লেখা প্রায় শেষ হয়। ঋষিদার প্রথম ছবি 'মুসাফিরে'র স্ক্রিপ্ট লেখা শুরু হয়। হৃষিদা ও সলিলদার সঙ্গে মিলে তিন বন্ধুতে ঠিক করেন গল্পটি। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ—তিনটি ঘটনা একই বাড়িতে ঘটছে, এই নিয়ে গল্প। লেখার সময় কিছু কিছু শুনেছিলাম। কিন্তু ছবিটি আমার দেখার সুযোগ হয়নি। আমি তখন শিলং ছিলাম।

৫

গোরেগাঁও ছেড়ে ওয়ার্ডেন রোডে একটা ফ্ল্যাট পেয়ে আমরা চলে আসি। ফ্ল্যাটটিতে ছিলেন পরিচালক সত্যেন বসু। গোরেগাঁওতে কেষ্ট মুখার্জি ও শৈলেন ঘোষ আমাদের বাসায় ছিল। ভূপতিদা ও সমীরণ দত্তকেও আনার ইচ্ছা ছিল। হয়ে ওঠেনি।

ওয়ার্ডেন রোডে আসার পর রাঙাদা (মেজো ভাসুর) নাগপুর থেকে আসেন। দেবতুল্য লোক ছিলেন তিনি।

এরপর একবার কলকাতায় গিয়ে 'নাগরিক' রিলিজ করবার শেষ চেষ্টা হয়। কলকাতা যাবার পরই চিঠি পেলাম—'মা'র কথা বার বার মনে হচ্ছে। চারিপাশে মা'র স্মৃতি। লক্ষ্মী, আমি আরো ভাল হব এবার থেকে। আরো দায়িত্ব নেব। কাজ করব।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত চেষ্টা সফল হয়নি। যতটুকু আমার মনে আছে যা বুঝেছি—ডিস্ট্রিবিউটর চৌধুরী ছবিটি লুকিয়ে লুকিয়ে মফস্‌সলে কিছু কিছু দেখিয়েছিলেন। কলকাতায় রিলিজ না করে মফস্‌সলে দেখানোর রেওয়াজ নেই। সুতরাং শেষ চেষ্টার ওইখানেই শেষ হয়।

ছোড়দা ও ডলিদি ও আমাদের ছোট্ট ভাগনিটিকে নিয়ে বোম্বে ফিরে আসেন। এই সময় প্রায়ই আসত অনীশ ও গীতা। আর আসত আমার বড় ভাগনি টুস্‌কী। টুস্‌কীকে নিয়ে আমরা একবার খাণ্ডালা বেড়াতে গিয়েছিলাম।

ভাগনে-ভাগনিদের প্রতি ওঁর স্নেহ-ভালোবাসা ছিল অসীম।

'মধুমতী'র শুটিং আরম্ভ হয়। শুটিং দেখতে একদিন গিয়েছিলাম। দিলীপকুমারের সঙ্গে হৃদ্যতা ছিল খুব।

জুহু বিচে বলরাজ সাহানীর বাড়িতে মাঝে মাঝে যেতাম। একদিন আলোচনা করতে করতে রাত হয়ে যায়। আর বাড়ি ফেরা হয় না।

'মুসাফির'-এর পরেই হিতেন চৌধুরী একটি গল্পের স্ক্রিপ্‌ট লেখান। গল্পটি পরে ছবি করাননি।

মেরিন ড্রাইভের কাছেই ডাঃ পুরন্দরের নার্সিং হোমে বড় মেয়েটির জন্ম হয়। মেজদি দু'মাস ছিলেন। চলে যাবার পর সারাদিন মেয়েটিকে নিয়ে একাই থাকতাম। রাঙাদাও কিছুদিন ছিলেন না। মধুমতীর শুটিং চলছিল আন্ধেরীতে, সেইখান থেকে বান্দ্রাতে এসে হিতেনদার গল্পের স্ক্রিপ্‌ট লিখে বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেত। কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরলে, এসেই প্রথম ছোট্ট মেয়েটিকে কোলে নিয়ে বসতেন।

'বিসর্জন'-এর পর 'মুসাফিরোঁকে লিয়ে'র রিহার্সাল চলছে। শেষের দিকে নাটকের রিহার্সাল ওয়ার্ডেন রোডেই হত, আমদের ফ্ল্যাটের কাছেই। তখন আমিও প্রায়ই যেতাম। নাটকটির আলোর কাজ করবার জন্য তাপস সেন এসেছিলেন।

মন ক্রমশ কলকাতা যাবার জন্য তৈরি। বোম্বে থাকলে হয়তো টাকা হত, কিন্তু মনের মতো কাজ হত না। আমি একটি কথাও বলতাম না। বিয়ের আগে, বিয়ের পরে বিরাট চাকরি, বিরাট টাকার কথা কখনও ভাবতাম না। টাকা তো কাজ করলেই আসবে। বড় কথা শিল্পীমন ও

দার্শনিক গভীরতার প্রকাশ। আর আমি স্ত্রী তো নিশ্চয়ই, কিন্তু তার চাইতেও বড় সংগ্রামী সাথী, বন্ধু ও শুভ্যানুধ্যায়ী।

সাংসারিক ক্ষেত্রে, প্রতিদিনের জীবনে অস্বাভাবিকতা ছিল। সেটা বুঝতে একটু সময় লেগেছে, তারপর তা মেনে নিয়েছি। টাকাপয়সা সমস্ত আমার হাতে দিতেন। আয় থেকে ব্যয় বেশি করা, দায়িত্ব বেশি নেওয়া ইত্যাদিও ছিল—কিন্তু চলে গেছে।

ওয়ার্ডেন রোডের সাততলা বাড়ির পাঁচতলার ওই ফ্ল্যাটটি খাদির জিনিসপত্র কিনে সাজানো হয়েছিল। খাদির জিনিস খুব পছন্দ ছিল। পোশাকও পছন্দ ছিল খদ্দরের পাঞ্জাবি, গেরুয়া কলিদার পাঞ্জাবি ইত্যাদি।

ফ্ল্যাটটির বারান্দায় কাঁচের বড় জানলায় দাঁড়িয়ে দূরে দেখা যেত আরব সাগরের নীল জল, কাম্বালার সমুদ্র-তীরে যেন আকাশের নীল রঙের সঙ্গে মিশে আছে। রোজ রাত্রে দাঁড়িয়ে শুনতাম সমুদ্রের গর্জন ও জলোচ্ছ্বাস, অন্ধকারে দূরে দেখা যেত ছোট বড় পাথরের মাঝে মাঝে আছড়ে-পড়া নীল সমুদ্রের ঢেউ।

১৯৫৬ সাল শেষ হল।

পরের বছর মার্চ মাসে আমরা কলকাতা চলে আসি। ঝাপসা হয়ে আসে বোম্বে, গোরেগাঁও, ওয়ার্ডেন রোডের সমুদ্র সৈকত।

'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'র চিত্রনাট্য লেখা চলছিল তখন। এমনি কাজকর্মের চেষ্টাও চলছিল। বি. এন. সরকার বলেন, দেড়-দুই মাসের মধ্যেই সরোজ রায়চৌধুরীর 'নতুন ফসল' আরম্ভ করবেন।

আমরা কলকাতায় আসায় সুভাষদা (কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়) খুব খুশি হন। লেখা ও সাহিত্যিক জীবন সম্বন্ধে ওঁর সঙ্গে আলোচনা হত অনেক।

শেষ পর্যন্ত 'নতুন ফসল' হল না। বি. এন. সরকার একটি চিঠি দিয়ে জানান, ছবিটি এখনই তাঁর পক্ষে করা সম্ভব নয়। চিঠিটা এই রকম:

11.6.57

Dear Mr. Ghatak,

After you had left last evening I had been thinkimg things over about the prospects of my being able to start and finish a production.

With the heavy commitments over Studio No. I of N.T. I do not think it will be possible for me to know the exact financial position till at least the end of August.

I do not want once again to find myself in an unpleasant situation due to conditions beyond my control.

I have, therefore, to request you to take up some other engagement. I shall contact you again when I feel that I am certain about being able to finish a picture satisfactorily.

I have made the position frankly clear and I hope to b excused for any inconvenience that I may have caused yo inadvertently.

Thanking you,
Yours Sincerely
B.N. Sircar

বি. এন. সরকার মহাশয়ের কাজ আরম্ভ করতে দেরি হবে, তাই তখন শিবশংকর মিত্রের লেখা 'আর্জান সর্দার' বইটি ছবি করবার জন্য আলোচনা ও স্ক্রিপ্ট লেখা চলছিল। ছবিটি কেন হল না, মনে নেই। বোম্বেতেই ফিরে যেতে হত।

শেষ পর্যন্ত আশ্চর্য ভাবে শুরু হল 'অযান্ত্রিক'। অযান্ত্রিক গল্পটি আগেই দীনেন গুপ্ত ও উমাপ্রসাদ মৈত্রের সঙ্গে মিলে কিনে রাখা হয়েছিল। প্রমোদদা তখন দুটো ছবি (পরশপাথর, লৌহকপাট) আরম্ভ করেছিলেন, তবু তাঁদের স্নেহের ঋত্বিককে দিয়ে তৃতীয় ছবি আরম্ভ করানো অসীম সাহসের পরিচয়।

'অযান্ত্রিক'-এর কথা ভাবলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে আসে মন। ছোটগল্প-লেখকদের মধ্যে সুবোধ ঘোষের নাম বিখ্যাত। এবং তাঁর বিখ্যাত গল্পগুলোর মধ্যে 'অযান্ত্রিক' একটি। সেই গল্প নিয়ে ছবি করার সুযোগ এল আকস্মিকভাবে। একটি ভাঙা গাড়ি আর তার ড্রাইভার বিমল আর ছোটনাগপুরের উপত্যকা ও প্রাকৃতিক সম্পদকে মূলধন করে শুরু হল 'অযান্ত্রিক' ছবি। প্রথম শট নিয়ে ছবি আরম্ভ করার পরই চিঠিতে জানলাম খুব ভালো শট হয়েছে।

রাঁচী

২.৭.৫৭

'আজ দুপুরে এখানে এসে পৌঁছোলাম। দুরাত কাটছে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ওপরে। সঙ্গের জগদ্দল প্রচণ্ড ঝামেলা করছে। বহুকষ্টে এলাম। পুরো ইতিহাস গিয়ে বলব।

'আজ প্রথম 'শট নিয়ে ছবি আরম্ভ করলাম। খুব ভাল শট্ হয়েছে। এতবছর বাদে আবার সুযোগ এল জীবনে, খালি মনে হচ্ছে। জানিনা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারব কী না। বৃষ্টি নেই একফোঁটা, হয়তো গল্পবদল করতে হবে।

'আজ তোমার কথা খুব মনে হয়েছে। আর মার কথা। মা বেঁচে থাকল না আজ পর্যন্ত। থাকলে শান্তি পেত।'

এত বছর বাদে আবার সুযোগ এল জীবনে। তখন মনে ভাবনা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করা যাবে কিনা।...এত দিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা-ভাবনা, দর্শন মূর্ত হয়ে উঠল ছবিতে—বিমল ও তার ভাঙা গাড়ি। হর্নের আওয়াজ,

গাড়িটি চলার সময় চারপাশের প্রকৃতি, শব্দের ব্যবহার ও আবহসংগীতের সুর। রাঁচী ও নেতারহাটের শুটিংয়ের অনেক লোকেশনই দেখেছি, স্বপ্নের মতো আজ সব মনে আসে—কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জায়গা ও ঘটনাটির কথা ভুলব না।

সেটা হল ওরাওঁদের নাচের দৃশ্যাবলী। আগের দিন গ্রামে গ্রামে খবর দেওয়া হয়েছিল। পরদিন সকাল থেকে দূর-দূরান্তের গ্রামের আদিবাসী ওরাওঁ ছেলেমেয়েরা নাচতে নাচতে আসছিল। এই আদিবাসীদের সম্বন্ধে আগে রাঁচীতে লেখা চিঠি থেকে জেনেছিলাম। সেদিন এদের গান, বাঁশি, হাত-ধরাধরি করে আসা ছেলেমেয়েদের নাচের ছন্দ, সরলতা ও লাবণ্য বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছিল। আর আসছে তো আসছেই, কোনও শেষ নেই।

সত্যি এরা আমাদের দেশের সম্পদ। সেদিন শট নিতে নিতে সন্ধে হয়ে এসেছিল। এই আদিবাসীরা ছবিটির প্রাণ। বিমল এদেরই মতো সরল ও শিশু। কিন্তু কী হল এদের সংগ্রহ করার ফল? কতটা নিল একে দেশের লোক? 'চলচ্চিত্রচিন্তা' প্রবন্ধে আছে:

'আমার ভুল হয়েছিল, সর্বজনগ্রাহ্য বস্তুর মধ্যে দিয়ে ব্যাপারটিকে টেনে আনতে পারিনি। কিন্তু উপায়ও ছিল না, বিষয়বস্তু এবং পটভূমিকার জন্যে।...কাজেই esoteric হয়ে থাকতে হলো, সাধারণগ্রাহ্য হওয়া গেল না।

যে নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান আমি অযান্ত্রিকে দেখিয়েছি তাতে 'কোথা বেঞ্জা', 'খাতুরা', 'চালি বেনো', 'ঝুমের', 'লুঝরি' ইত্যাদি বহু সাংকেতিক নৃত্যের সমাবেশে মহাযাত্রাদৃশ্য সন্নিবিষ্ট ছিল। এতে করে প্রকাশ পাচ্ছিল জন্ম, শিকারে যাওয়া, বিবাহ, মৃত্যু, পূর্বপুরুষের প্রতি পূজা এবং নবজন্ম,—এই সমস্ত cycleটা।

অযান্ত্রিকের main theme মৌল উপজীব্য ছিল একটাই। যাকে আমরা 'the law of life'; জীবনের নিয়ম বলতে পারি। পাগলের নতুন গামলা পেয়ে পুরানটি ভুলে যাওয়ার সেই নিষ্ঠুর দৃশ্য এবং সর্বশেষে এক শিশুর হাতে জগদ্দলের ক্রেংকার ধ্বনি, যাতে বিমলকে উপলব্ধির হাসিতে

ভুলিয়ে দিয়েছিল—এগুলোতে সেই কথাই প্রকাশ করেছে। এ যেন variation on a minor scale of the main theme, a sort of echo, যা যে কোন Symphonic structure-এর প্রাণবস্তু।'

এখানে বুঝতে পারি মনের চিন্তাধারা কোনদিকে পরিণতি লাভ করছে। 'অযান্ত্রিক'-এর সংগীত নিয়ে লেখা দুটো খাতাতে নিজের হাতে বিস্তৃতভাবে সব লেখা। মাঝে মাঝে দুই-একটা স্কেচও আছে।

Music	1. Bimal's music (slow) orchestra	5 times.
	2. Bimal's solo Swarode	2 times.
	3. ঝাল (piece)	1 time.
	4. ঝাল (full)	1 time.
	5. Last Scene–Crescendo TKI Reserve TK2	
	6. তিলককামোদ	1 time.
	7. সরোদ ভৈরবী 1st piece (sign music 8 times included hue)	2 times.
	8. সরোদ ভৈরবী 2nd piece	Reserve.
	9. ,, ,, 3rd piece	Reserve.
	10. ,, ,, 4th piece	Reserve.
	11. ,, ,, 5th piece	2 times.
	12. সরোদ তেহাই	1 time.
	13. Title piece	1 time.
	14. J' Sign music	8 times.
	15. Title piece 2. প্রিন্ট-এ দেবে না	1 time.
	16. Hill sound (M.O.)	15 times.
	17. Mouth organ crash	1 time.
	18. Mouth organ train	1 time.
	19. Mouth organ jud back—ও—effect	1 time.
	20. Mouth organ church এক টুকরো রাখতে হবে	2 times.

21. Kajal music	3 times.
22. Hashi music	2 times.
23. তানপুরার ঝংকার—খানিকটা দরকার	1 time.
24. Night stn & stand	1 time.
25. Kesto last	1 time.
26. Kuli new dress	1 time.
27. প্রণাম করা	1 time.
28. বাঁশী Solo (তিলংকোষ) লাগবে	1 time.
29. কিতারা বাঁশী (1st piece 8 times)	1 time.
30. মুরোজ (cuts)	2 times.
34. Kajal Return Orchestra	1 time.
35. Kajal Return Violin	1 time.
38. মুরোজ 3rd Sg. begin	1 time.
41. সেতার ও সরোদ (শেষটা ভাল)	1 time.
42. সেতার solo (করুণ সন্ধ্যা)	1 time.
43. সেতার solo (তিলংকোষ)	1 time.
45. সেতার সন্ধ্যারাগ	1 time.
	Reserve.

মিউজিকের রেকর্ডিং যখন হচ্ছিল, তখনকার কথা কিছু মনে পড়ছে। বিরাট অর্কেষ্ট্রা, অনেক লোকজন। আছেন আলি আকবর খাঁ, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিশিরকণা ধরচৌধুরী। মধ্যরাত্রি পর্যন্তও কিছু কিছু লোকজন ছিলেন। তারপরে কেউ নেই। সীতাদি ও আমি শেষ পর্যন্ত বসেছিলাম। মেয়ে দুটিকে ল্যাবরেটরিতে শুইয়ে রেখেছিলাম। পরিচালক ও আলি আকবর খাঁ মাঝে মাঝে একটু একটু মদ্যপান করছেন। শেষ রাত্রে নেশা কমলেও কাজের বিরতি নেই।

ভোর হয়ে আসে। আস্তে আস্তে দেখি শুয়ে পড়তে। মুখে বার বার একটা কথা—'আমি আমার জীবনের সব-কিছু দিয়ে বইটা করেছি। জীবনসংশয় করে শট্ নিয়েছি।'

সেটা অবশ্য খোকার (দীনেন গুপ্ত) মুখেও শুনেছিলাম। কাজের মধ্যেই ছিল সমস্ত মন, প্রাণ, জীবন।

সেদিন ছিল আমাদের বিবাহবার্ষিকী।

সন্ধ্যার সময় আলি আকবর খাঁ'র বাড়িতে যাই।

সেদিনই প্রথম অন্নপূর্ণাদিদির সঙ্গে পরিচয় হয়।

আলি আকবর খাঁ অনেকক্ষণ সরোদ বাজান।

বউদি রান্না করে খাইয়েছিলেন।

অযান্ত্রিক মুক্তি পাবার পরদিন আমি ও ভবী হলে যাই। সেদিন বোধহয় প্রেসের লোকজনদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, পার্টি ইত্যাদি ছিল। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি ও ধুতি—কিন্তু সমস্ত মুখ লাল। প্রচুর খাওয়া হয়েছে। এরই রেশ চলল, কাজ পেলে আনন্দে, কাজ না পেলে দুঃখে।

বেশ কিছুদিন পর আমি শিলং চলে গেলাম। অনেকদিন পর চিঠিতে (৯.১০.৫৮) জানলাম 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' ও 'কত অজানারে' বই দুটি করা ঠিক হয়েছে। লিখছেন: 'হঠাৎ কালী (ব্যানার্জী) এসে 'কত অজানারে' ছবিটা করার জন্য চেপে ধরেছে। ও নিজে করছিল, এখন আমাকে দিয়ে করাতে চায়। ওই নিজের পকেট থেকে আজ চারশ টাকা দিয়ে গেল আগাম হিসেবে। ও আমার সম্বন্ধে বেশ sentimental বলে মনে হল।'

এর পরের চিঠিতেই (১৪. ১০. ৫৮): 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' জনতা পিকচার্সে আজ contract সই করেছি। পঁচাশী হাজার টাকা দেবে। ওতে ছবিটা হয়ে যাবে। লাহিড়ীদের বাড়ী থেকে একপয়সাও দিতে হবে না। নভেম্বরের মাঝামাঝি সুটিং আরম্ভ হবে।'

২

যে শিশুমনে ছোটবেলায় একদিন রূপকথার ছবি জেগেছিল, 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' ছবির মধ্যে মনে হয় সেই মনের প্রকাশ। এল ডোরাডোর কাহিনী অরিনক নদী, গহন আফ্রিকার জঙ্গল কাঞ্চন কল্পনা করে।

'বাড়ী থেকে পালিয়ে' মহানগরীর যান্ত্রিক জীবনে—'সুখী রাজপুত্রের' গল্প, হরিদাসের কাহিনী...'কোনো এক গলির মোড়ে মাকে দেখা,' মাসি,

গঙ্গার ওপরে জাহাজ দেখে দূর দেশে যাওয়ার স্বপ্ন।...আবার বাড়ি ফিরে আসা। 'বাড়ীই সব থেকে ভাল।'

কাঞ্চনের স্বপ্ন দেখার দৃশ্য, মায়ের ভূমিকায় পদ্মাদেবীর ও হরিদাসের ভূমিকায় কালী ব্যানার্জির অভিনয়, প্রমোদদার ছেলের কাঞ্চনের ভূমিকায় ও ছোট মেয়েটির অভিনয় ছবিটিকে জীবন্ত করেছিল।

এই একটি মন সব সময়েই ছিল। ছোড়দাকে বোম্বে নিয়ে যাওয়ার পর—পরে আবার কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। দুই ভাইকে এবার প্রায়ই বলতে শুনেছি, 'আমাদের পকেটে সব সময়েই একটা দুষ্টুমি লুকিয়ে থাকে।'

'বাড়ী থেকে পালিয়ে' সম্বন্ধে ওঁর নিজের লেখা—'শিবরাম চক্রবর্তীর যুদ্ধ পূর্বোত্তর বাংলা একটা ছবিকে টেনে আনার চেষ্টা করেছি—যুদ্ধোত্তর বাংলা দেশে। আমি জানি না কতখানি সফল হয়েছে। তবে মূল বক্তব্যটাকে আমি নিশ্চয়ই বদলে দেবার চেষ্টা করেছিলাম।'

কিন্তু 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' ফ্লপ হল। 'কত অজানারে' শেষ হল না।

'অযান্ত্রিকের বিমল, 'বাড়ী থেকে পালিয়ে'র 'হরিদাস' কালি ব্যানার্জিকে দেখে আমরা মুগ্ধ ছিলাম। 'কত অজানারে' ছবিতে 'বারওয়েল' সাহেবের অভিনয়ও ছিল নিখুঁত। একদিন সাহেব ধুতি-চাদর পরে বাড়ি এসেছেন। Makeupটা দেওয়া হয়েছিল আমার শ্বশুরমশাইয়ের। তিনি যে-রকম চুল আঁচড়াতেন, গোঁফ যে-ভাবে পাকিয়ে রাখতেন, অবিকল সেইরকম। অনিল চ্যাটার্জি, উৎপল দত্ত, ছবি বিশ্বাস, অসীমকুমার, গীতা দে, করুণাদি; সকলের অভিনয়ই মনে পড়ে।

এরপরে এল 'মেঘে ঢাকা তারা'। আগেই লিখেছি 'স্ত্রীর পত্র'র পরে নাটক করা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ওই সময় থেকে প্রচুর প্রবন্ধ লেখা শুরু হয়। আর সংগীতের প্রতি অনুরাগ ও জ্ঞান বিশেষভাবে মনে পড়ে। প্রতি মাসে প্রচুর বই ও রেকর্ড কেনা হত।

সব সময়ই একটা কথা শুনতাম 'বইপড়া আমার ধর্ম'। বুদ্ধের ওপরে অনেক বই পড়তে দেখেছি।

অসীম শ্রদ্ধা ছিল বুদ্ধের প্রতি। আর শ্রদ্ধা ছিল বিদ্যাসাগর, এব্রাহাম লিংকন ও লেনিনের প্রতি। নাটক, ফিল্ম ছাড়া প্রচুর বই জমিয়ে ছিলেন আর্কিয়োলজি র উপর।

বুদ্ধের সম্বন্ধে কয়েকটি বই।

1. *Goutama: The Buddha*: Ananda K. Coomaraswamy & I. B. Horner. 2. *Studies in the Origins of Buddhism*: Govind Chandra Pande. 3. *Sacred Books of The Buddhists* Vol. XIX. 4. *The Mahavastu* Vol. III: Translated from the Buddhist Sanskrit. By J.J. Jones.

আর্কিয়োলজি-র ওপরে কয়েকটি বই:

1. *Dark Age Britain*: Edward Thurlow Leeds. 2. *The Most Ancient East*: Gordon Childe. 3. *Piecing Together the Past*; Gordon Childe. 4. *The Prehistory of Scotland*: Gordon Childe. 5. *Archaeology in the U.S.S.R.*: Alexander Mongait 6. *The Art of Indian Asia*: Heinrich Zimmer. 7. *The Personality of India– Pre & Proto-Historic Foundation of India & Pakistan*: Bendapudi Subbarao. 8. *History Unearthed*: Leonard Wooley. 9. *The Wonder that was India*: A.L. Basham. (A survey of the culture of the Indian Sub-Continent before the coming of Muslims.) 10. *The Tombs of the Tibetan Kings: Seric Orientale*: Roma Giuseppe Tucci.

কিছু প্রিয় বই:

1. *The Collected Works*: C. G. Jung. 2. *The Great Mother: An Analysis of the Archetype*: Erich Neumann. 3. *Before Philosophy*: H. Frankfrot & others. 4. *The Outlines of*

Mythology: Lewis Spence. 5. *The Historical Development of Indian Music*: Swami Prajnanananda. 6. *The Dance of Shiva*: Ananda Coomaraswamy. 7. *Play Production*: Henning Nelms. 8. *A Source Book in Theatrical History*: A.M. Nagler. 9. *Directing the Play: A source book of stagecraft*. 10. *Method of Madness*: Robert Lewis. 11. *Practical Make-up for the Stage*: T.W. Bamford. 12. *Aristophanes*.

ফিল্ম—

1. *Preface to Film*: Raymond Williams & Michel Oppom. 2. *Kino: A History of the Russian and Soviet Films* 3. *Quene Viva Mexico*: M. Eisenstein. 4. Sergei Prokofiev. 5. Sergei Eisenstein: *Notes of a Film Director*. 6. *Composing for the Films*: Hanns Eisler. 7. *The Little Fellow–The life and work of Charles Spencer Chaplin*: Peter Catis & Thelma Niklans. 8. Sergei M. Eisenstein: Marie seton.

নাটক—

1. *Bertolt Brecht*: Marianne Kesating. 2. *The Living Stage*: Kenneth Macgowan and William Melnity. 3. *Stage and Film Decor*: R. Myerscougl Walker. 4. *Moscow Theatres*: V. Komissarzhevsky. 5. Vakhtangov *The School of Stage Art*: Nikolai Gorchakov. 6. *Parables for the Theatre*: Bertolt Brecht. 7. *Theatre: The Rediscovery of Style*: Michel Saint Denis. 8. Sophocles: *The Theban Play: King Oedipus*: E. F. Watling. 9. *The Technique of Play Production*: A. K. Royd. 10. *On Actors & The Art of Acting*: George Henry Lewis. 11. *Staging the Play*: Norali Lambourne. 12. *Theatre Arts*

Anthology. 13. *Masters of The Drama*: John Gassner. 14. Brecht: *A Collection of Critical Essays*. Edited by Peter Demetz. 15. Stanislavsky: *On the Art of the Stage*. 16. Ashely Dukes.

রেকর্ডের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ছিল বিটোফেনের সিম্ফনি। প্রায় সবই ছিল। 5th Symphony বহু জায়গায় সংগীতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'তেও ছিল।

সন্ধ্যার পর কাজকর্ম সেরে বাইরের ঘরে বসে বিয়ার খাচ্ছেন, ঘরে রেকর্ড বেজে চলেছে Beethoven: Choral, Tchaikovsky–Swan lake, Sleeping Beauty, Hamlet, Beethoven: Violin Concerto, Carnival of the Animals, Nutcracker Suite, Leonara, Moonlight. The Gambler. কখনও Paul Robeson-এর Old Man. River, Old Folk at home, Poor old Joe, Songs my mother taught me, Trees ইত্যাদি। কিংবা শচীন দেববর্মন, আব্বাসউদ্দীন বা বিভিন্ন রবীন্দ্রসংগীত।

বই, রেকর্ড, প্রবন্ধ লেখা, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ। বাড়িতে একটা পরিবেশ ছিল তখন। জানতাম এমনি করেই জীবন চলবে—আরও বই আরও রেকর্ড, আরও লেখা, আরও কাজ জীবনকে অনেক বিস্তৃত করবে, উন্নত করবে। যে-স্বপ্ন একদিন দেখেছিলাম সফল হবে।

আমি তখন নতুন করে এম এ. ক্লাস করছি যাদবপুরে। শেষ হয় 'মেঘে ঢাকা তারা'। নানা সময়ের প্রবন্ধ—'মেঘে ঢাকা তারা' সম্পর্কে উনি নিজে লিখছেন;

'এর নামটাও আমার দেওয়া। 'চেনামুখ' নামে কোন এক জনপ্রিয় কাগজে এ গল্পটা বেরিয়েছিল। এর মধ্যে কোন একটা জিনিষ আমাকে আঘাত করেছিল। তাই Bill শেক্সপীয়রের "The cloud clapped star" এইটে আমার মাথায় এসে দাঁড়িয়েছিল। এবং সম্পূর্ণভাবে ভেঙে আমি এই ছবির Script করি। এটা খানিকটা sentimental হতে পারে, কিন্তু এর মধ্যে থেকেই আমার ছবিতে overtones throw করার ব্যাপারটা

আসতে আরম্ভ করে। এইখানে আমি ভারতীয় Mythologyকে ব্যবহার করা শুরু করি। যেটা আমার জীবনের একটা অংশ।

'এখানে আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক। কারণ একটা Universal theme নিয়ে আমি কাজ করছি। এবং নিজেকে পরিব্যাপ্ত করে ফেলার চেষ্টা করেছি আমাদের ঐতিহ্যের মধ্যে। গত সাত-আটশো বছরের বাংলাদেশে একটা বড়ো মজার ব্যাপার গড়ে উঠেছিল যা একেবারেই বাঙালী। স্মার্তপ্রভাবপুষ্ট বাঙালী সমাজ গৌরীদানেতে পাগল হয়ে উঠেছিল। সেই অষ্টমবর্ষীয় শিশু খেলার আঙিনা ছেড়ে অজানা গাঁয়ের অজানা বাড়ীতে গিয়ে চারিপাশের ভ্রূকুটি-কুটিল মুখগুলো দেখে বড়োই ভয় পেত, বড়োই তার নিজের বাড়ির জন্য মন কেমন করতো।

এই ব্যথা আমাদের লোককথায় শাশ্বত কালের জন্যে বিধৃত হয়ে আছে। এই কান্না ঝরছে আমাদের আগমনী বিজয়াতে। তাই দুর্গা আমাদের মেয়ে, তাই শরৎকাল বড়ো মন কেমন করা।

Great Mother archetype এর এই বিচিত্র বহিঃপ্রকাশ।...তাই আমার নীতার জন্মদিন হয় জগদ্ধাত্রী পুজোর দিন। তাই যক্ষ্মার আবিষ্কারের সময় মেনকার বিজয়ার বিলাপোক্তি শোনা যায় 'আয় গো উমা কোলে লই।' নীতা মহাকাল পাহাড়কে জীবনভোর দেখতে চায়, দেখে তখনই যখন মহামিলন ঘনিয়ে আসে, মহাকালরূপী সংহারদেব তাকে আলিঙ্গন দেন সেই পরম অবলুপ্তিতে।'

ছবিটি সকলের মনকে মথিত করে। সংগীতের প্রয়োগও বইটিকে একটি বিশেষ পর্যায়ে নিয়ে যায়। অনিল চ্যাটার্জির গলায় (এ. টি. কাননের গাওয়া) সুর সাধার সময় বার বার যে ক্লাসিকাল সংগীতের সুর শোনা যায়—সংগীতজ্ঞ হয়ে ফেরার পর সেই সুর সমস্ত পরিণতি নিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে 'লাগি লগন পতি পতি' গানে। নীতার যক্ষ্মা ধরা পড়ে—সরোদের সুর বাজে তীব্রতম সুরে আর 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি' মনের বেদনাকে প্রকাশ করে সমস্ত ব্যঞ্জনায়।

ছবিটির শেষ দৃশ্যে নীতা বাঁচবে না মারা যাবে, এই নিয়ে একটু মতদ্বৈধ ছিল। তাই শিলং পাহাড়ে দুই রকম ছবি নেওয়া হয়। 'দাদা আমি বাঁচতে চাই' দৃশ্য শিলং পিকে। অন্য দৃশ্য স্প্রেডিকেল ফলসের ধারে।

'মেঘে ঢাকা তারা' মুক্তিলাভ করার পর অনেক চিঠি আসে। বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়ের একটা চিঠি আসে; 'ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।' এরপরে বিষ্ণু দে ও প্রণতিদির চিঠি। সবাই এত খুশি হয়েছিলেন—চিঠিতে তারই উল্লেখ। বৌধায়নবাবু পরে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। মণীন্দ্র রায় ও তপতীদিও চিঠি লিখেছিলেন। স্টেটসম্যান পত্রিকায় একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক সেন প্রভৃতি কয়জন মিলে। চিঠিটি ছাপা হয়নি।

এদিকে আবার ওই সময়ই স্টুডিয়োতে সাধারণ টেকনিসিয়ানদের নিয়ে ইউনিয়ন গড়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সে-সময়কার একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পের কলাকুশলীদের সম্পর্কে লেখা। বছরের পর বছর টেকনিয়সিয়ানরা কী সামান্য বেতনে কাজ করে সেটা কল্পনার বাইরে। কোনও ভবিষ্যৎ নেই, উন্নতি নেই। অথচ একটি ছবি করতে হাজার হাজার টাকা খরচ হয়। নায়ক-নায়িকাদের টাকার অঙ্ক বেড়েই চলে। এই চরম দুর্দশা ও দারিদ্রের মধ্যে কর্মরত কলাকুশলীদের সম্বন্ধে লেখা প্রবন্ধটি এখানে উল্লেখ করবার মতো।

চলচ্চিত্রশিল্পীদের কলাকুশলীদের সম্পর্কে

'বাংলা দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের কলাকুশলীদের কথাটি বলার ভার আমার ওপর পড়েছে। জানি না আমার কোন্ উপযুক্ততা আপনারা দেখেছেন। সে যাই হোক, আমার দুঃখী ভাইদের হয়ে দুকথা বলার সুযোগ দিয়ে আপনারা আমায় কৃতজ্ঞ করলেন।

বাংলাদেশের কলাকুশলীদের অবস্থা যে ঠিক কতখানি পরিমাণে, কত চরম ভাবে খারাপ, তা দেশের লোক জানেন না। আমাদের গ্ল্যামারের পাশেই যে হতাশা আর অবসাদের বাসা, তার একমাত্র তুলনা হতে পারে উজ্জ্বল প্রদীপের তলার নিকষ কালো আঁধারের সঙ্গেই। কলকাতা সহরের মত জায়গায় ষোল বছর নাগাড়ে চাকরী করার পরেও একজন সুদক্ষ

কলাকুশলী মাসে পঞ্চাশ টাকা মাইনে নিয়ে ছেলেপুলে নিয়ে ঘরসংসার করে হাড়ভাঙ্গা খাটুনী করতে বাধ্য হন। কর্মরত অবস্থায় কর্তৃপক্ষের বিবেচনার দোষে মারা পড়েন যে কলাকুশলী, তাঁর পরিবার না পায় তার কোন ক্ষতিপূরণ না হয় দুর্ঘটনার ন্যায্য বিচার। কত কলাকুশলীদের যে হকের টাকা মারা পড়ে, তার ইয়ত্তা নেই। এসব কথা লিখতে বসলে হাজার হাজার সত্য ঘটনা আমারই অভিজ্ঞতা থেকে আমি খাতার যত পাতা ভরে লিখে যেতে পারি। এবং তার প্রমাণ দরকার হলে উপস্থিত করতেও আমি দ্বিধা করব না।

এবং এই যে আমাদের অবস্থা, তা দিনের পর দিন খারাপই হয়ে চলেছে। অবস্থা এমন হয়েছে যে, ভাবতে গেলে দম আট্‌কে আসে। আমাদের চোখের সামনে আশার আলোও আজ নেই। এবং এটা তখনই ঘটছে যখন বাংলা ছবি ভারতের মুখ উজ্জল করছে, সংস্কৃতির উন্নতি করছে, দেশবিদেশের মানুষকে তৃপ্ত করছে।

এ অবস্থা থাকতে পারে না, এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস তা থাকবেও না। দেশের মানুষের দৃষ্টি আমাদের দিকে ফিরবেই।

আমাদের বলা হয়, চিত্রশিল্পের সংকট ঘনীভূত হচ্ছে, এবং তার ফল হিসেবেই এসব কিছু ঘটছে।

আমি বলব, এটা ডাহা মিথ্যে কথা। সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। পশ্চিম বাংলা সরকারের হিসেবেই তার প্রমাণ রয়েছে। এই শিল্প থেকে সরকার আমোদকর হিসেবে বার্ষিক আয় করেন চার কোটি টাকা (আজকাল আবার আমোদকর বাড়ানো হয়েছে)। সমস্ত মালিকরা মিলে লাভ করেন পাঁচ কোটি টাকা। যে শিল্প বছরে আয় দেয় নয় কোটি টাকা, এবং যার আয় বছর বছর বেড়েই চলেছে, তার কি ধরনের সংকট হতে পারে, সেটা সহজেই অনুমান করা চলে। সে সংকট হচ্ছে, মানুষের তৈরী। সত্যিকারের সংকট সেটা নয়।

কোন্ মানুষ? চিত্রপ্রদর্শক।

যে যাই বলুন, আমি পরিষ্কার বলব, ছবিগুলোর মালিকরাই হচ্ছেন কেন্দ্রবিন্দু, যাঁরা এই সংকে

টর জন্ম দিয়েছেন। এবং সর্বপ্রকার অজুহাত দিয়ে সেটিকে টিকিয়ে রেখেছেন। দেখুন, একটা ছবির শতকরা ষাট ভাগেরও বেশী আয় কেড়ে নিয়ে যান প্রদর্শকরা, অথচ এর সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁরা এক পয়সাও ব্যয় করেন না ছবি তৈরী করার জন্য। এমনকি তাঁদের ছবিঘরগুলোও সাজিয়ে দেন প্রযোজকরা। 'হোল্ডওভার' আর 'হাউস প্রোটেকশান' বলে দুটি মোক্ষম কথার তাঁরা জন্ম দিয়েছেন, যার বাংলা মানে হচ্ছে,—Head I win, Tail you lose! তাঁদের সাপ্তাহিক লাভের গায়ে (তাঁদের খরচের নয়, তাঁদের ন্যূনতম hundred percent লাভের গায়ে) তাঁরা আঁচড়টি পর্যন্ত লাগাতে দেবেন না।

এই যে কোটি কোটি টাকা তাঁরা নিয়ে যাচ্ছেন এই Industry থেকে, তার এককণাও তাঁরা Industry-তে ফেরত পাঠাবেন না, এখানে টাকা লগ্নী করবেন না। তাতে নাকি ভীষণ ঝুঁকি। তার বদলে তাঁরা সেই টাকায় Switzerland-এ হাওয়া বদলাতে যাবেন, Mosaic করা প্রাসাদ তুলবেন, মিল-কারখানা করবেন।

একটা Industryর যেটা আয় হয়, তার একটা বড় অংশ যদি নিয়মিত ফিরে এই Industryতেই লগ্নী না হয়, যদি সেটা (অর্থাৎ এই Creamটা) যদি চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে যায় একটা ছ্যাঁদা কুঁজোর জলের মত, তাহলে যে রক্তশূন্যতা দেখা দেবে, এটা যে-কোন অর্থনীতিবিদ অতি সহজেই বুঝতে পারবেন।

আজকাল এঁরা সব ছবিঘরেই panoramic screen করে তাঁদের রুচির পরিমাণ দেখাচ্ছেন। আচ্ছা বলুন তো আমাদের কাজ করতে হয় সেই মান্ধাতার আমলের ভাঙ্গা ক্যামেরা দিয়ে, এরকম বিষণ্ণ রসিকতা তাঁরা করছেন কেন?

এরকম যুক্তিহীন ফ্যাসাদ খুব কমই আছে। হপ্তায় একটা মর্নিং শো এঁদের থাকে, তার মধ্যে হয়তো দশটা পাঁচটা ছবি Wide screen-এর হয়, তার জন্যে তাঁরা এতশত ঘটা করে ছবির পর্দাটাকে ছড়িয়ে দিলেন বেঢপভাবে। আর যেটা রেগুলার ছবি, এই অধমদের কাজগুলো, সেটাকে প্রতি হপ্তায় দেখাতে হয় একুশটি বার করে। আর তার প্রত্যেকটিরই হয়

ছবির মাথা কাটে, নইলে তলা দেখা যায় না। কারণ ওপরে নিচে নর্মাল Screen-এর বেজায় গরমিল। আপনি নায়কের চোখের তলা থেকে মুখটা দেখছেন, তারপরেই ঝপাস্ করে অপারেটার ফ্রেমটা নামিয়ে ঠোঁট দুটো কেটে চুল পর্যন্ত দেখিয়ে দিল, আর সর্বক্ষণ সংলাপ চলছে। এ ঘটনা হামেশাই ঘটছে।

এই হচ্ছে এঁদের সমস্ত ব্যবহারের একটা প্রতীকী ব্যাপার। আর এই হচ্ছে, আমার মনে পড়ে যায়, আজকালকার প্রায় বীভৎস Star System-এর কথা। বাংলাদেশের তেমন জুড়ী একটিই আছেন। এঁরা সমস্ত কলাকুশলীদের বিশটা ছবির পারিশ্রমিক একটা ছবিতেই নিয়ে যান। এঁদের ছাড়া নাকি ছবি চলে না। এই আর একটা ডাহা মিথ্যে কথা। এটারও জন্ম দিয়েছেন কিছু সুবিধাবাদী লোক। এবং আজও তাঁরা উচ্চকণ্ঠে সেকথা ঘোষণা করতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন না। কিন্তু এই কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে একনিশ্বাসে আমি এত ছবির নাম করে যেতে পারি, যার একটাতেও এই কামধেনু দুটি নেই। আপনারা কখনও হিসেব করে দেখেছেন, যতগুলি Golden Jubilee ছবি গত কয় বছরে হয়েছে (যেমন রাণী রাসমণি, ক্ষুধিত পাষাণ, শেষ পর্যন্ত, মায়ামৃগ এবং আরো), তার কয়টিতে এই জুটি দেখা গেছে?

অথচ এঁদের গ্ল্যামার তৈরী করি আমরাই। আমার ঐ আধপেটা খাওয়া Electrician যদি ঠিক মত আলোটা না দিত, আর আমার পরিচালক যদি ঠিকমত তাঁকে ব্যবহার না করতেন এবং আমি যদি ঠিকভাবে তার মুখখানা না তুলতাম—তবে তার মুখখানিতে যে ঐ Glamour-এর এক কণাও থাকত না।

আমি বিশ্বাস করি, পরিচালকই হচ্ছেন সব। তিনিই আমাদের চালক, তিনিই আমাদের তৈরী করেন। তিনি অভিনেতা অভিনেত্রীকে যেমন প্রতিষ্ঠিত করেন, ঠিক তেমনি আমাদের কলাকুশলীকেও তাঁদের সুযোগ দেন। তৈরী করে নেন। ছবির স্রষ্টা হচ্ছেন পরিচালক। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার বদলে কিছু অভিনেতা অভিনেত্রীকে নিয়ে নাচানাচি শুধু অজ্ঞতার পরিচায়ক নয়। রীতিমত পীড়াদায়ক।

সবশেষে আমি একটা অনুযোগ করব। আমি সে অনুযোগ করব আমাদের কল্যাণরাষ্ট্রের কর্ণধারদের কাছে।

তাঁদের জানা দরকার, যে সব ছবি আজ বাইরে ভারতের মুখোজ্জ্বল করছে, সেগুলো তৈরী হচ্ছে কেমনভাবে। তাঁদের অনুরোধ করব, আমাদের স্টুডিও ল্যাবরেটরীগুলো তাঁরা এসে দেখে যান।

দেখে যান দুটো কারণে। দেখুন আমরা কি ভোজবাজী করছি কি জিনিস দিয়ে। যে সব লক্কড় যন্ত্রপাতি দিয়ে আমরা সোনা ফলাচ্ছি— বিদেশের কথা দূরস্থান বোম্বে মাদ্রাজের কুলাকুশলীরাও এগুলো দেখলে আঁতকে উঠত। ছুঁতেই সাহস পেত না।

দ্বিতীয় কারণটা হচ্ছে, তাঁরা দেখুন -কাকে বলে প্রদীপের তলায় অন্ধকার। তাঁরা ছবিঘরগুলোর ঝকঝকে তক্‌তকে চেহারা দেখছেন— একবার এসে পরিদর্শন করে যান আমাদের বাংলা স্টুডিওগুলোর ছেঁড়া চট, অস্বাস্থ্যকর ফ্লোর, আর দারিদ্রপূর্ণ আমাদের কুশ্রী চেহারাগুলো।

তখন বুঝবেন, বাংলার ছেলেরা অসাধ্যসাধন আজও করছে।

তাঁরা যে চারকোটি টাকা শুধু তুলে নিয়ে যাচ্ছেন, তার একটা অংশও কি তাঁরা আমাদের, আমাদের Industry-র এবং আমাদের আর্টের উন্নতির জন্যে লাগাতে পারেন না?

তাঁদের অনেক জ্ঞানগম্যি আছে, আমার তা নেই। তাঁরা কি পারেন না নতুন যন্ত্রপাতি আমদানি করে আমাদের প্রযোজক-স্টুডিও মালিকদের হাতে তুলে দিতে? (অবশ্য ধার হিসাবে।) তাঁরা কি এইসব কলাকুশলীদের Co-operative করে টাকা দিতে পারেন না প্রামাণ্য তথ্যচিত্র করার জন্য, এমনকি Feature Film করার জন্য? তাঁরা কি আমাদের Welfare-এর জন্য ব্যবস্থা করতে পারেন না হাসপাতালের বেড্ দেওয়া থেকে আরম্ভ করে Dearness allowance দেওয়ার মধ্যে দিয়ে?

আমার মনে হয়, তাঁরা সবই পারেন। তাঁরা এই ছবিঘরের মালিকদের অন্যায় শোষণ থেকে আমাদের ছবিকে মুক্তি দিতে পারেন। তাঁরা এইসব রাঘববোয়াল Starদের কালোটাকা নেওয়া বন্ধ করতে পারেন। তাঁরা চাকরীর সুযোগ আমাদের বাড়িয়ে দিতে পারেন।

আমি বিশ্বাস করি, তাঁরা এগুলো করবেন। এবং তার মধ্যে দিয়ে দেশের মানুষের কল্যাণকর ছবি দেখার সুযোগ আরো বাড়িয়ে দেবেন এবং বিদেশে আমাদের মাথা আরো উঁচু করে দেবেন।

আমরা মরে আছি। তাঁরা আমাদের বাঁচাবেন।"

যতটুকু মনে পড়ে, এই সময়ই 'গ্যালিলিও চরিত' নাটকটি অনুবাদ করা হয়। নাটকটি সুনীল দত্ত ছাপিয়েছিলেন। তাতে একটি ছোট ভূমিকা আছে। আর একটি ভূমিকা ব্রেখট সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল।

৩

সমস্ত দিক থেকে ব্যাপক, কর্মময় এই জীবনের মধ্যেই শুরু হয় 'কোমল গান্ধার'।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছবিটির পটভূমিতে গভীরতর এক দেশপ্রেমের সুর ধ্বনিত হচ্ছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মুখে বার বার শোনা যায় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নবজীবনের গান। লোকসংগীতের সুর পদ্মার চরে। বাইরে শো করতে গিয়ে একজন ছেলেহারানো-মা তাঁর মৃত ছেলের একটি মেডেল নায়ককে দেন ও মুকুন্দ দাসের কথা বলেন।

অনসূয়ার মা'র কথা বলার সময় আবহসংগীতের সুরে মূর্ত হয়ে ওঠে একটি করুণ দেশপ্রেমের সুর।

ভৃগুকে আক্রমণ করার পর যখন নায়ককে একা রেখে একে একে সবাই চলে যায়—তখন গগন নিয়ে আসে নতুন নাটক ঃ

'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা।'

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা। নাটকটির শোয়ের আগে ভৃগু অনসূয়াকে দেশপ্রেমের কথা বলে উদ্‌বুদ্ধ করছে। সেদিন ছিল শিক্ষক ধর্মঘট। শিক্ষকরা রাস্তায় বসে আছেন। একজন কর্মী আসে অনসূয়ার কাছে টাকা চাইতে। একটি ছোট ছেলে অনসূয়ার আঁচল টেনে ধরে। 'দিদি পয়সা দে না'। অনসূয়া বাংলাদেশের প্রতীক, শকুন্তলার প্রতীক।

'কোমল গান্ধার প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

'পতিগৃহে যাত্রাকালে শকুন্তলাকে তার বহু পরিচিত জগৎ, ঐ আজন্ম বাসভূমি আশ্রম থেকে নিজেকে ছিন্ন করে নিতে হয়েছিল।

বাংলাদেশের শকুন্তলার প্রতিমূর্তি এ ছবির নায়িকা, আর একালের যুবচিত্তে যে বিক্ষোভের প্রসার, তারই প্রকাশ নায়কের চরিত্রে, সে সম্পূর্ণ সুস্থও নয়, প্রকৃতিস্থও নয়, অবদমিত, কিছুটা বিকারগ্রস্ত।

রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ, দীনমলিন নাট্য-আন্দোলন ও দলাদলির প্রায় বাস্তবানুগ চিত্রায়ণ ও তৎসমান্তরাল কৌতুকাবহ প্রেমাখ্যান এ সমস্তই পরিকল্পিত ও সন্নিবেশিত হয়েছে মূল পরিকল্পনা অনুসারে—রূপকগুলিকে সমৃদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে। একটি বাস্তবধৃত, বহু বিষয়-সমন্বিত জটিল নক্সা (Pattern) প্রস্তুত করাই ছিল অভিপ্রেত।'

'মানবসমাজ, আমাদের ঐতিহ্য' প্রবন্ধে ঃ

'কোমল গান্ধার। শকুন্তলা বাংলাদেশে পরিণত হয় আমার কাছে। রবিঠাকুরের সেই আশ্চর্যসুন্দর প্রবন্ধটি শকুন্তলা এবং মিরাণ্ডার অপূর্ব তুলনা যেখানে রয়েছে, সেটি আমাকে প্রভাবিত করে। চারপাশের যে দ্বিধা, যে ভাঙন আমি জানি— তার মূল হচ্ছে ভাঙাবাংলা। পূর্ববাংলার লোক বলে একথা মনে করিনা। গোটা বাংলার ঐতিহ্যটা আয়ত্ত করার চেষ্টা করি বলেই একথা জানি যে, দুই বাংলার মিলন অবশ্যম্ভাবী। তার রাজনৈতিক তাৎপর্য আমার হিসাব করার কথা নয়, কিন্তু সাংস্কৃতিক মূল্য আমার কাছে অবধারিত।

তাই 'কোমল গান্ধারে'র মূল সুর হচ্ছে মিলনের। স্তরের ওপর স্তর দিয়ে, রূপকের ওপর রূপক চাপিয়ে, বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো যদি কোথাও সেই জীবন-সত্যটিকে ছুঁতে পারি সেই চেষ্টাই করেছিলাম।'

'চলচ্চিত্র চিন্তা' প্রবন্ধে ঃ

'কোমল গান্ধার। এখানে আমার সমস্যা কাহিনীর তিনস্তরের বিবরণ। আমি অনসূয়ার দ্বিধাবিভক্ত মন, বাংলার গণনাট্য আন্দোলনের দ্বিধাগ্রস্ত

নেতৃত্ব এবং দ্বিধাবিভক্ত বাংলাদেশের মর্মবেদনা, তিনটিকেই একত্রে টানতে চেয়েছিলাম। শব্দের দিক থেকে বহুশত শতাব্দীর সুরকথাকে মিলিয়ে ছবির ওপরে নতুন দ্যোতনা অভিনিবিষ্ট করতে চেষ্টা করেছিলাম। Archetypally, এদের বিরোধী হচ্ছে বিবাহ, মিলন। *'আমের তলার ঝামুর ঝুমুর কলাতলায় বিয়া। আইলেনগো সোন্দরীয় জামাই মটুক মাথায় দিয়া।। মিস্ত্রী বানাইছে পীড়ি চাইরকোণা তুলিয়া।। ব্রাহ্মণে চিত্রাইছে পীড়ি মধ্যে সোনা দিয়া। আজই হইব সীতার বিয়া'।।*

এই গানগুলির ব্যবহারের পিছনে একটি চিন্তার্থ ছিল তা হচ্ছে মিলনের ভাবখানি, যা অবশ্যম্ভাবী। 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার মনে মনে' রবিঠাকুর বলে গেছেন। বিষ্ণু দে তাকে নিয়ে এগিয়ে গেছেন বাংলাদেশেতে। আমি সেইখান থেকে শুরু করেছিলাম।

এই দেশপ্রেম ও মিলনের সুরে 'কোমল গান্ধার' বড় পবিত্র ছবি। কিন্তু দর্শকের আনুকূল্য লাভ না করায় যে আঘাত আসে, সমস্ত জীবনটাকে তা ছিন্নভিন্ন করে দিল।

British Film Institute-এর ডিরেক্টর James Quinn-এর সঙ্গে এই সময় 'অযান্ত্রিক নিয়ে কথাবার্তা হয়। ছবিটি লন্ডনে পাঠানো হয়। কিন্তু ফেরত আসে। James Quinn চিঠিতে জানান :

December 15, 1961.

Dear Mr. Ghatak.

Thank you for your letter of November 10. I am sorry for the delay in replying to it. We considered carefully the possibility of including " Ajaantrik" in the London Film Festival, but owing to pressure on screen time I am afraid we were not able to do so. We do, however, like your film and should it prove possible to arrange an Indian Film Season at the National Film Theatre at some future date we would like to include "Ajaantrik."

For the record, you will wish to know that your Film was despatched by the Institute on November 9 and should reach you very shortly, if it has not already arrived.

With kind reagards,

Yours sincerely,
James Quinn.
Director.

৪

এত কিছুর পর এবার শুরু হল 'সুবর্ণরেখা'। এই ছবিটির কথা মনে হলেই 'আমার ছবি' প্রবন্ধটির কথা মনে পড়ে :

"আমরা এক বিড়ম্বিতকালে জন্মেছি। আমাদের বাল্যকাল বা আমাদের কিশোর বয়স যে সময় কাটে সে সময় দেখেছি বাংলার পরিপূর্ণ রূপ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দিগ্বিজয়ী প্রতিভায় সাহিত্যকীর্তির তুঙ্গে অবস্থান করছেন। কল্লোলগোষ্ঠীর সাহিত্যকর্মে বাংলা সাহিত্য নব-বিকশিত। স্কুলকলেজ ও যুবসমাজে জাতীয় আন্দোলন পূর্ণপ্রসারী।

রূপকথা, পাঁচালী আর বারোমাসের তেরোপার্বণের গ্রামবাংলা নবজীবনের আশায় থৈ থৈ করছে। এমন সময় এলো যুদ্ধ, এলো মন্বন্তর, মুসলিম লিগ আর কংগ্রেসরা দেশের সর্বনাশ ঘটিয়ে দেশটিকে টুকরো করে দিয়ে আদায় করল ভগ্ন-স্বাধীনতা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বন্যা ছুটলো চারদিকে। গঙ্গা-পদ্মার জল ভাইয়ের রক্তে লাল হয়ে গেল। এ আমাদের নিজের চোখে দেখা অভিজ্ঞতা। আমাদের স্বপ্ন গেল বিলীন হয়ে। আমরা এক লক্ষ্মীছাড়া জীর্ণ বাংলাকে আঁকড়ে ধরে মুখ থুবড়ে পড়ে রইলাম। এ কোন্ বাংলা, যেখানে দারিদ্র্য আর নীতিহীনতা আমাদের নিত্যসঙ্গী, যেখানে কালোবাজারী আর অসৎ রাজনৈতিকের রাজত্ব, যেখানে বিভীষিকা আর দুঃখ মানুষের নিয়তি।

আমি যে কটি ছবিই শেষের দিকে করেছি, কল্পনায় ও ভাবে এই বিষয় থেকে মুক্ত হতে পারিনি। আমার সবচেয়ে যেটা জরুরী বলে বোধ

হয়েছে সেটা এই বিভক্ত বাংলার জরাজীর্ণ চেহারাটাকে লোকচক্ষে উপস্থিত করা, বাঙালীকে নিজেদের অস্তিত্ব, নিজেদের অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা । শিল্পী হিসাবে সর্বদাই সৎ থাকতে চেষ্টা করেছি, কতটুকু কৃতকার্য তা ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীরাই বলবে।

'মেঘে ঢাকা তারা' আর 'কোমল গান্ধার' করার পর 'সুবর্ণরেখা' ছবিতে হাত দিই। ..... যে কটি পাঁচিল অতিক্রম করে এই ছবি করতে হল সে প্রসঙ্গ বাদ দেওয়া যাক।.....

'সুবর্ণরেখা' ছবিতে যদি অভিরাম আর সীতা, হরপ্রসাদ আর ঈশ্বরের সমস্যাকে যথাযথ মূর্ত করে ধরতে পারি তবে অভিরামের মায়ের মৃত্যু, পতিতালয়ে ঈশ্বরের সীতাকে আবিষ্কার প্রভৃতি ঘটনাকে খুব অসম্ভব বলে ঠেকবে না।

বিভক্ত জরাজীর্ণ বাংলার যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করছি দিনের পর দিন, তার ঐ পতিতালয়ে সীতার মতোই দশা। আর আমরা অবিভক্ত বঙ্গের বাসিন্দেরা যেন উন্মত্ত নিশাযাপনের পর আচ্ছন্নদৃষ্টি বেঁচে আছি।"

'সুবর্ণরেখা প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে :

'প্রত্যক্ষভাবে 'সুবর্ণরেখা' ছবিতে উপস্থাপিত সংকট উদ্বাস্তুসমস্যাকে অবলম্বন করে আছে। কিন্তু 'উদ্বাস্তু' বা 'বাস্তুহারা' বলতে এ ছবিতে কেবল পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদেরই বোঝাচ্ছে না— ঐ কথাটির সাহায্যে আমি অন্যতর ব্যঞ্জনা দিতে চেয়েছি। আমাদের দিনে আমরা সকলেই জীবনের মূল হারিয়ে বাস্তুহারা হয়ে আছি এটাও আমার বক্তব্য। 'বাস্তুহারা' কথাটিকে এইভাবে বিশেষ ভৌগোলিক স্তর থেকে সামান্য স্তরে উন্নীত করাই অভিষ্ট, ছবিতে হরপ্রসাদের মুখের সংলাপে, (আমরা 'বায়ুভূত, নিরালম্ব') কিংবা ছবির প্রথমেই এসে একজন কর্মচারীর মুখে, 'উদ্বাস্তু! কে উদ্বাস্তু নয়?' এই কথায় সেই ইঙ্গিতই দেওয়া হয়েছে।.....

'সুবর্ণরেখা'কে আমি ক্রনিকল্ প্লের ভঙ্গিতে ধরার চেষ্টা করেছি। পরিচয়লিপি থেকেই তার ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করেছি। এ-ধরনের ক্রনিকলের যা রীতিনীতি হওয়া উচিত সেগুলোকে বজায় রেখে মাঝে মাঝে লেখা এনেছি।.....

এ ছবি করতে গিয়ে একটা স্তরে রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থ' আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। সেটা শুধু শেষে গিয়ে দুটো লাইন জুড়ে দেবার ব্যাপার নয়। গোটা ছবিময় গোড়া থেকে টুকরো টুকরো সংলাপে, কিছু কিছু সংগীতের ব্যবহারে, কিছু কিছু ঘটনার সংস্থাপনে 'শিশুতীর্থ' অনিবার্যভাবেই এসে পড়েছে। এবং সেই জন্যই শেষের তিনটি লাইনও অনিবার্য। ওটা নিরাশারও নয়, অবক্ষয়েরও নয়।

আর ভাল করে অনুধান করতে বলি ছবিতে ব্যবহৃত বেদ ও উপনিষদের শ্লোকগুলি। অনেক ভেবে, অনেক বাছাই করে ঐ কটিকে আমি গ্রহণ করেছিলাম। তাদের প্রত্যেকটির বিশেষ ব্যঞ্জনা আছে এবং আমার অর্থ প্রকাশের পক্ষে তারা খুবই সাহায্য করেছে।"

'চলচ্চিত্র সাহিত্য ও আমার ছবি' প্রবন্ধেও আছে ঃ

'এটা বুঝতে হলে খানিকটা পরিমাণে উপনিষদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়। আমি যে শেষ করেছি 'চরৈবেতি' মন্ত্রের ওপরে এটাকে বুঝতে ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে খানিকটা যোগাযোগ রাখা দরকার।'

'চলচ্চিত্র চিন্তা' প্রবন্ধে আছে আর্কিটাইপাল ইমেজের কথা ঃ

'একটি শিশুমেয়ে তার দ্যোতনাময় নামটি হচ্ছে সীতা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এক প্রলয়ক্ষেত্রের মধ্যে পরমানন্দে হাততালি দিয়ে গেয়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ তার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো কালীমূর্তি the terrible Mother। মেয়েটি গেল ভয় খেয়ে। এরপরে প্রকাশ পেল ওটি ছিল একটি বহুরূপী। ...সুদূর অতীত থেকে যে archetypal image আমাদের haunt করছে সে আজকে দৃঢ় পায়ে সারা জগতে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে, তার নাম Hydrogen bomb, তার নাম Strategic Air Command, তার নাম হয়তো বা De Gaulle, হয়তো বা Adeneur, হয়তো বা উল্লেখ করা চলে না এমন কোন নাম। পরম বিধ্বংসী এই যে সংহার শক্তি, আমরা ঐ ছোট্ট সীতার মতন হয়তো তার সামনেই পড়ে গেছি। ..... খালি মনে হয়েছিল এক মহাপ্রলয়ের মূক

সাক্ষীর পর দাঁড়িয়ে এত আনন্দ ভালো না। এত সরলতা ভালো না। ধাক্কা দরকার।'

ছোট্ট সীতা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।..... উদ্‌বাস্তু কলোনি, সীতার নতুন বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছা। ঈশ্বরের চাকরি। সুবর্ণরেখা নদীর ধারে এসে অভিরাম ও সীতার আনন্দ। ভাঙা এরোড্রোমের বিস্তীর্ণ রানওয়ের ওপর দুটি সরল শিশুর দৌড়োনো, কথা! দৃশ্যটি অবিস্মরণীয়!

অভিরাম ও সীতা বড় হয়। ...সীতার গান শালবনে, বাড়িতে, ভাঙা এরোড্রোমের ওপর। ...অভিরাম বাগদিছেলে জেনে ঈশ্বরের বিরূপতা—সীতা মিথ্যা সহ্য করে না। বিবাহের রাত্রির দৃশ্য। সীতা অভিরামের সঙ্গে চলে আসে। বিবাহের মুকুট ভেসে চলে নদীর জলে।...

অভিরামের চাকরি হয় না। চেষ্টা করে বাড়িটা বদলাবার। সীতার ছেলেও নতুন বাড়ির স্বপ্ন দেখে। মায়ের মুখে গান শোনে 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা।' অভিরামের দুর্ঘটনা—সীতার পড়ে যাওয়ার দৃশ্য। ...মহাপ্রলয়ের পর বিনু মামার সঙ্গে সুবর্ণরেখা নদীর ধারে এসে ছুটে চলে ধানের খেত দেখে নতুন বাড়ির দিকে।...

এরই মাঝে হরপ্রসাদের কথা—*উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত। প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি*। ...অ্যাটম বোমা দেখে নাই। যুদ্ধ দেখে নাই। মন্বন্তর দেখে নাই। দাঙ্গা দেখে নাই। দেশভাগ দেখে নাই। অকারণ সেই পুরাতন সূর্যবন্দনা মন্ত্র ওঁ ভূর্ভূবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহিধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। তারপর কী আছে?

অন্তর্জলী করো, অন্তর্জলী করো। ...তারপর থাকবে কেবল মধুবাতা ঋতায়তে। মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। শান্তি শান্তি। ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।

সমস্ত ছবিটি একটি কবিতা। পুরোনো পুঁথির পাতায় লেখা দিয়ে শুরু হয়, শেষ হয় জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, চিরজীবিতের।

কিন্তু জানা গেল যে ছবিটি মুক্তিলাভ করবে না। একটি কথা এরপর

থেকে বার বারই শুনেছি, 'লক্ষ্মী, আমি মারা যাব।' 'আর দুই বছর', কখনও 'একবছর।' আমাকে আরো কষ্ট পেতে হবে।' —আমার চেতনা প্রায় লুপ্ত হবার মতো হত। কিন্তু কী করব? কথাগুলো তো শুনতেই হবে।

এত অস্বাভাবিকতার সম্মুখীন হতে হবে জীবনে কোনওদিন কি ভেবেছি? মা'র মৃত্যু ও একটির পর একটি ঘটনা জীবনকে অস্বাভাবিক থেকে আরও অস্বাভাবিকতারই দিকে এগিয়ে নিয়ে চলে।

৫

আলাউদ্দীন খাঁকে নিয়ে ডকুমেন্টারিটি করবার জন্য মাইহার যাওয়া আমার জীবনে একটি পবিত্র স্মৃতি। বাবা ও অন্নপূর্ণাদিদিকে কোনওদিন ভুলব না। ছবিটির অন্য একটি স্ক্রিপ্ট লেখা হয়েছিল। বাবার মেজাজ বুঝে বুঝে ছবি নেওয়া হয়। শেষ করতে পারলে অনবদ্য হত।

গ্যারান্টরের অভাবে আরণ্যক এফ.এফ.সি. অনুমোদন করেনি। সিনপ্সিসটা এখনও মনে পড়ে। কলকাতার জনাকীর্ণ রাস্তায় দেখা যায় একটি মহিষকে। কী অনাদর ও দুর্দশা। ...দৃশ্যটি মিলিয়ে যায়—ভেসে ওঠে লবটুলিয়া ও নাড়াবইহারের জঙ্গল—দাঁড়িয়ে আছে মহিষের দেবতা টারবাঁড়ো—বিরাট মাথা উঁচু করে।...

অবস্থা আরও খারাপের দিকে চলল। বোম্বেতে কিছু কাজের কথাবার্তা হয়েছিল। সেই সমস্ত কাজকর্মের চেষ্টার জন্য ও প্রতীক্ষায় বোম্বেতে কিছুদিন থাকতে হয়েছিল। ছোট্ট ছেলে ও দুটি মেয়েকে নিয়ে প্রতীক্ষায় আমার দিন কাটছে। এমন সময় পেলাম একটা চিঠি :

'খোকাবাবার নাম রেখেছি—ঋতবান্। চলন্তিকা দেখে নিও। কথাটার মানে 'ধার্মিক'। আশাকরি নামটা তোমার ভাল লাগবে। ..... অন্নপ্রাশনের ঘটা আমি গেলে যে করে হোক করব। এখন যদি পৌঁছতে না পারি ছোটখাটোভাবে করতে পার কিনা দেখো।'

দিদিমা'র মৃত্যুসংবাদ জেনে চিঠি—২৭/২/৬৪: 'দিদিমার সঙ্গে সঙ্গে সে যুগটা শেষ হয়ে গেল।'

এরপরে যে ভোজপুরী গল্পটি করার ঠিক হয় সেই গল্পটির ব্যাপারে

বছরের শেষের দিকে আবার কিছুদিন বোম্বে থাকতে হয়েছিল। তখন একটা চিঠি পাই ঃ

'এখানে এসে অবধি দম ফেলার অবকাশ পাচ্ছি না। তার ওপরে ভোজপুরী টাকার লোক এখনো আসে নি। ২/৩ দিন পরে আসবে। ...যাক্ সব ভালই চলছে। রবিশংকর দারুণ সুর করেছে। একটা ঘুমপাড়ানী গান—'সোনা ছেলে, ভাল ছেলে, আর কেঁদো না। পরীরাণী আসবে 'খনি।।' শুনলেই আমার ছেলের কথা মনে পড়ে। এবার Tape করে নিয়ে আসব।

ফিরে এসে এই গান রোজ ছেলেকে গেয়ে শোনাতেন আর বাইরে নিয়ে গিয়ে পায়রা দেখাতেন রোজ সকালবেলা।

...শুরু হল 'বগলার বঙ্গদর্শন'। গল্পটি হাসির এবং খুব সুন্দর। আমরা প্রতীক্ষা করছিলাম কবে ছবিটা শেষ হবে। ছবিটিতে কাঞ্চনের ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য বোম্বে থেকে আনা হয়েছিল ইন্দ্রাণী মুখার্জিকে। নায়কের ভূমিকার জন্য আসানসোল থেকে সুনীলকে। তখন মদের মাত্রা অসম্ভব বেড়ে গেছে। গোপাল একটি ভ্যানে মদ সাজিয়ে বা ঠিক করে রেখে দিত। প্রতিটি শটের কম্পোজিশন করে আসার পর একটুখানি খাওয়া হত। কিন্তু এর মধ্যেও যতটুকু কাজ হয়েছিল, এখনও মনে পড়ে, খুবই ভালো।

একদিন সকালে শুটিং হচ্ছে ইন্দ্রাণীকে নিয়ে। একটি গাছের নীচে শিউলিফুল ঝরে পড়ছে। ইন্দ্রাণীকে পরানো হয়েছে একটি চওড়া লালপাড় শাড়ি, কপালে বড় লাল টিপ। পায়ে নূপুর। ইন্দ্রাণী গাছের নীচে লাফাচ্ছে। শিউলিফুল ঝরে পড়ছে, উজ্জ্বল লাগছে কপালের টিপ।

এই দৃশ্যটি বা কাঞ্চনের এই চেহারাটি কী ভাবে ছবিতে লাগানো হত জানি না, কিন্তু ছবিটির কথা ভাবলেই মনে হয় এই মূর্তিটি নিশ্চয়ই ছবিতে একটি বিশেষ রূপের ইঙ্গিত সৃষ্টি করত।

একটি সেটের কাজ শেষ হয়ে দ্বিতীয় সেট পড়েছে, জহর রায় পরিবেশক ঠিক করবেন কথা ছিল। কিন্তু ঠিক না হওয়ায় আর কাজ হয়নি। পুজোর ছুটি আরম্ভ হয়। রমণ মহেশ্বরী গৌরীপুর যাবার টিকিট

কেটে দেন। আমি ছেলে-মেয়েদের নিয়ে যাই শিমূলতলা। আমার শরীর তখন খুবই খারাপ।

গৌরীপুর যাবার অনেকদিন থেকেই ইচ্ছে ছিল। ওখানে প্রমথেশ বড়ুয়ার বাড়ি। প্রমথেশ বড়ুয়ার ভাই প্রকৃতিশ বড়ুয়া (প্রতিমা বড়ুয়ার বাবা) বা লালজি আছেন।

হাতি ধরার ওপরে একটি ছবি করার ব্যাপারে লালজির সঙ্গে সমস্ত আলাপ আলোচনা হয়। একটি গল্পও তৈরি হয়। ইন্দ্রাণী মুখার্জি ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে ছবিটি করার ইচ্ছে ছিল।

বহুদিন বাইরের ঘরে বসে অনেক আলোচনা হয়। ছবিটি কেন হল না এখন ঠিক মনে নেই।

তবে বহু পরিকল্পনাই তো কার্যকরী হয়নি। যেমন—'আরণ্যক', এই হাতি ধরার গল্প ও জসীমউদ্দীনের 'নকশী কাঁথার মাঠ'। 'নকশী কাঁথার মাঠ' করবারও খুব ইচ্ছে ছিল। নাচের কোরিওগ্রাফি করবার কথা ছিল উদয়শংকরের। এই বইটি সম্বন্ধেও বহু আলোচনা হয়েছে। কেন হল না, কেন সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হল, জীবন হতাশায় ভরে গেল, মদের মাত্রা বেড়ে গেল—শিমূলতলায় গিয়ে ভাবতাম। আমি তখন শিরদাঁড়ার ব্যথায় অসুস্থ। ওষুধ, ইঞ্জেকশন চলছে। গৌরীপুর থেকে শিমূলতলা এসে শুধু মহুয়া খাওয়া চলছিল। ফিরে এসে আর 'বগলার বঙ্গদর্শন' শেষ হল না। এই ছবিটির জন্য কয়টি গান টেকিং করা হয়েছিল। যেমন 'আমার অঙ্গে অঙ্গে...' আরতির গলায়, আর 'আমার মাহুত বন্ধু রে' প্রতিমা বড়ুয়ার গলায়। গান টেকিংয়ের সময় কোন কোন যন্ত্র বাজবে , কী ভাবে বাজবে, কতক্ষণ বাজবে, সব বার বার বলে দিতে দেখতাম। সংগীত পরিচালক হবার কথা ছিল হৃদয়রঞ্জন কুশারীর।

ওই দুটি গানই খুব পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু দেখা দিতে থাকে অ্যালকোহলিক ইনস্যানিটি। চরম অস্বাভাবিক অবস্থা। দিনেরাত্রে যখন-তখন টেপরেকর্ডারে ওই গানগুলো শোনা হত।

ভেবেছিলাম ছেলের জন্মের পরে একটি বড় ফ্ল্যাট ভাড়া করা হবে, কাজকর্ম ঠিকমতো করে জীবনটা সুন্দর হবে। কিন্তু মাথা ঠিক হল না। অসমাপ্ত হয়ে রইল কাজকর্ম।

৬

কিন্তু এর মধ্যেও, ওই '৬৩ ও '৬৪ সালেও, অনেক প্রবন্ধ লেখা হয়েছে।

'মানব সমাজ, আমাদের ঐতিহ্য, ছবিকরা ও আমার প্রচেষ্টা' এই প্রবন্ধটিতে লিখছেন :

'এইখানটিতে পুজো-আর্চার সঙ্গে ব্যাপারটির বেজায় মিল। এর প্রাথমিক স্তরে আছে—দেবতার সঙ্গে সাংসারিকের লেন-দেনের কারবার। একেবারে গভীরে গিয়ে সেই অনির্বচনীয়।

এই যে গভীরতম দিকটি, এর স্বরূপ বুঝতে Comparative mythology আমাদের প্রচুর সাহায্য করে। শুধু সিনেমায় নয়, সর্বকালের সব শিল্পেই।.....

এবং এই mythology দেখায় যে সমস্ত সভ্যতার ইতিহাস দুই রকম মানব চেতনার সংঘর্ষের ইতিহাস। এক হচ্ছে কর্মযোগীদের চেতনা, আর এক ভাবুকদের চেতনা। এই ভাবুকই কবি, শিল্পী Shaman, medicine man, ঋষি এবং মন্ত্রদ্রষ্টা।

এই tender mindcd-রাই অশান্ত চঞ্চল এবং এদের মধ্যেই archetype দ্যুতিময়ভাবে খেলা করতে থাকে। অর্থাৎ প্রকাশমান হয়। যেমন ধরুন না এই archetypeটি; প্রথম মানুষের যে শিল্পকলার নিদর্শন আমরা পাই, তা হচ্ছে প্যালিওলিথিক যুগের, স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী পিরেনিজ পর্বতমালার গভীর গুহাগুলিতে, নগ্ন মাতৃকামূর্তি! এবং এই Great Mother সারা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির চেতনায় আজও haunt করছে। এর দুই রূপ—এক হচ্ছে বরাভয়, Sophia, আর-এক হচ্ছে ত্রাসদাত্রী কালী, চণ্ডীর রূপ। আমাদের পুরাণে এই দেবীকে একত্রে দুই রূপে কল্পনা করা হয়েছে, 'দেবীসূক্ত'। এবং আমাদের সমাজের মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে আছে এই মাতৃভাবরূপী archetypeটি।

বাংলাদেশের সমস্ত আগমনী বিজয়ার গান, লোককথার সমস্ত গভীর দিকগুলো এই সাক্ষ্যই বহন করছে।'

ওই সময়কার বিখ্যাত প্রবন্ধ—'সারি সারি পাঁচিল' :

'একটি করে ছবি করার জন্য আমাদের যে কতগুলো পাঁচিল টপকাতে হয়, তা যদি আপনারা জানতেন তাহলে আর একটু হয়তো ক্ষমা করতেন আমাদের।...

অথচ আপনাদের হাতেই সব। আপনারাই সব। আপনাদের রায়ই সব। আপনারা আক্রমণ করুন, আঘাত করুন, বাঁচতে দিন।...

আপনারাও একটি বড় পাঁচিল। বোধহয় সবচেয়ে বড় পাঁচিল।

আমাদের দেশ রামায়ণ-মহাভারতের দেশ, আমাদের দেশের চাষী যে দর্শনের কথা বলে, তা মিলবে না বঙ্গদেশেই। আমরা আমাদের দুঃখকে ভালবাসি। আমাদের আনন্দকেও। তবু নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা আপনাদের ছাড়ব না। কিছু একটা জন্মাবেই, থরথর করছে আজ ছবির দুনিয়া।

আপনারা আমাদের অনুভব করুন, বুঝুন, আমরা একটা বহতা নদীর মাঝ দিয়ে বইছি, আজ এই মুহূর্তে আমরা যা, তাই আমাদের শেষ পরিণতি নয়। আমরা অনেক বড় হয়ে অনেকটা ছায়া দেব, শুধু জলসিঞ্চনের অপেক্ষা।...

এই যে, একটা ঢাকনার মতো মানুষের সব শুভকে ঢেকে রেখেছে শুধু প্রাণধারণের গ্লানি, সেটা হঠাৎ যেদিন উঠে যাবে, সেদিন হাইড্রোজেন শক্তির পরিব্যাপনের মতো মানুষের ইচ্ছা আর ক্ষমতা ব্যাপ্ত হবে। সেদিন আমরা আর কাঁদুনি গাইতে আসব না।

সেদিন রাস্তায় এত গুলিও চলবে না, এত মা-ও কাঁদবে না, আর আমরা চুটিয়ে ছবি করবই। কারণ, বহু পাঁচিল সেদিন ধ্বসে যাবেই।'

'ছবিতে শব্দ' প্রবন্ধে :

...'তখন আসে শব্দ সংমিশ্রণের স্তর। বিভিন্ন শব্দকে বিভিন্ন স্তরে বাজিয়ে তা সঠিক স্থানটিতে পৌঁছে দিতে হয়। কোনটি বা খুব জোরে,

কোনটিকে বা শুধু অনুভূতির স্তরে বাজিয়ে তবেই গিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়ায়।...

তাই বলছিলাম, স্থিরচিত্র মুক্তি খুঁজছে গতির মধ্যে। মূক চলচ্চিত্র প্রগল্‌ভ হতে চেয়েছে, সশব্দ চিত্র সে আয়তন বাড়িয়ে দিয়েছে, নগ্ন হয়ে গেছে, অন্য একটা কিছু খোঁজার মধ্যে। চূড়ান্ত শিল্প যে সংগীত তার নির্ব্যক্ত উদগ্র এককতায় পৌঁছবার সাধনা বোধহয় ওর।

তবে যে-কোন শিল্পই শিল্প হয় না, যতক্ষণ না তার একটা বাতাবরণ থাকে। চলচ্চিত্রে শব্দেরও একটা ধাঁচ, একটা গোটা নক্সা থাকে।

সেটিকে ধরবার চেষ্টা করা যেমন তৃপ্তিদায়ক, তেমনি ছবিটিকে বুঝতে, তাকে ওজন করতে, তা আমাদের সাহায্য করে।"

'শিল্প ও সততা' প্রবন্ধে:

'কথাটা হচ্ছে সব শিল্পকর্মেরই সত্যকারের শিল্পপদবাচ্য হতে হলে, সর্বপ্রথম হতে হবে সত্যবাদী। এই হচ্ছে শিল্পবিচারের দৃঢ়তম মানদণ্ড এবং যুগ যুগ ধরে স্বীকৃত।.....

আমাদের দেশের কথা ভাবতে গেলে, বিশেষ করে এইসব কথাগুলিই মনে হয়, জীবনের কাছে যাওয়া তাকে কঠিনভাবে ভালবাসা অথবা পবিত্রভাবে ঘৃণা করা, ছবির জন্য ছবি করা নয়— প্রাণের জন্য ছবি করা এ যেন এ দেশে নূ (Gnu) -র মতই দুষ্প্রাপ্য জন্তু।

প্রাথমিক চিন্তা, প্রাথমিকভাবে জীবনে কোন একটা ফলবান খণ্ডের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ, সৎভাবে নিজের উপলব্ধির গণ্ডীর মধ্যে বিচরণ, ছবি করার এই আদি শর্তগুলোই বড় দুষ্কর হয়ে পড়েছে এদেশে খুঁজে বের করা। নতুন যাঁরা আসছেন তাঁদের মধ্যেও সেই স্ফুলিঙ্গ দেখছি না।

তাই আমার মনে হয় আমরা এখনো বহুদূরে আছি। এখনও বোধহয় অনেকটা পথ যাবার আছে। মাঝে মাঝে মনটা অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

সেই সব সময়, হঠাৎ মেঘের ঝিলিক দিয়ে আন্তোনিওনির মত মহৎ শিল্পীদের উক্তিগুলো হাতের কাছে আসে।

তারা নতুন করে বল দেয়।'

'নাজারিন ও লুই বুনুয়েল' প্রবন্ধে :

'হিন্দুধর্ম সেদিক থেকে অনেক ফিচেল এবং বদ। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়। নাগার্জুনের শূন্যবাদ (বোধহয় তদানীন্তন কাল পর্যন্ত মানবচিন্তার উচ্চতম শিখর, কারণ নাগার্জুন ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের অন্যতম) যেহেতু বৌদ্ধদর্শনের (মহাযানবাদী) যুক্তিযুক্তভাবে পরম সিদ্ধান্ত, তাই যতদিন ভদ্দরলোক বেঁচে ছিলেন— হিন্দুরা চুটিয়ে গাল দিয়েছে তাঁকে। যখন তিনি নিরাপদভাবে একেবারেই মৃত এবং কিছু শতাব্দী কেটে গেছে, তখন arch-reactionary শংকর, সেটিকে আত্মসাৎ করে ও কুক্ষিগত করে বেড়ে অদ্বৈতবাদ বলে চালিয়ে দিলেন। এবং হিন্দুধর্মের একটা cornerstone হয়ে রইলো অদ্বৈতবাদ। যতদিন বুদ্ধ বেঁচে, (দৈহিকভাবে না হোক, মানুষের মনে এবং সামাজিক শক্তি হিসেবে) ততদিন তাঁর সঙ্গে প্রচুর কুস্তি চললো, আবার যখন তিনি আর নেই, তখন তাঁকে বিষ্ণুর অবতার করে ছেড়ে দেওয়া হলো। স্তোত্র লিখলেন জয়দেব।

এরকম ভূরিভূরি নমুনা দেখানো যাবে, যাতে করে ভারতীয় আর্যধর্মের বৈশিষ্ট্য এবং ফিচলেমি পরিষ্কার হয়ে আসে।'...

৭

১৯৬৪ সালের শেষে পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে লেকচার দেবার জন্য ডাকত। তাই মাঝে মাঝে পুণা যেতে হত। এর পরের বছরের প্রথম দিকে চালচলনের অস্বাভাবিকতা বেড়ে যায়। এরই মাঝে শেষ পর্যন্ত পুণার চাকরিটি হয়। তখন পর্যন্ত নিজেকে বদলাবার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। তখনকার চিঠিতে তার উল্লেখ আছে। ছেলেমেয়েদের জন্য চিন্তাও ছিল। আর খুবই ইচ্ছে ছিল 'বগলার বঙ্গদর্শন' শেষ করবার।

পুণা

১৭.১২.৬৪

যথাসময়ে এসে পড়েছি। এখানে এরা আমার প্রোগাম করে দিয়েছে। এরা চায়, আমি ৩০ তারিখ পর্যন্ত থাকি।

কিন্তু কলকাতায় কি ঘটছে, তার জন্যে মন ভীষণ খারাপ হয়ে আছে। যদি পার, নারানকে দিয়ে কুশারীর কাছ থেকে খবর নিয়ে জানিও। তার ওপরে এখানে থাকা ঠিক করব।

এদের এখানে অত্যন্ত আদর পাচ্ছি। এই একমাত্র জায়গা এখনও বাকী আছে, যেখানে সবাই আমার জন্য উদ্‌গ্রীব। মুরারী বলছে, যে কোন সময়ে আমি join করতে পারি। আমি ফ্রেব্রুয়ারীতে আসব বলেছি। কারণ 'বগলা' যদি হয়, শেষ করে আসতে হবে। আবার না হলে সংসার চলবে কি করে—যাই হোক, বলেছি, final date জানাব কলকাতায় ফিরে, এখানে বাড়ী পাওয়াও মুস্কিল। কাজেই এবার সেসব খোঁজও করে যাব।

দিনরাত ব্যস্ত। পরে আবার লিখব।

পুণা

২৭.১২.৬৪

আমি ৩১ তারিখে রওনা হয়ে খুব সম্ভব ২ তারিখে কলকাতা পৌছব। এরপরে এখানে আর থাকা যাবে না। চাকরীর ব্যাপারটা মোটামুটি পাকা। পাঁচ বছরের contract. আমি মার্চের গোড়ায় আসব বলেছি। কারণ, পরে আরো ২/১ মাস পেছোনো যেতে পারে। আমার এখন একমাত্র চেষ্টা হবে, রমণের ছবিটা শেষ করে দেওয়া, তারপর আর আমার ছবি করার মোটে ইচ্ছে নেই, কলকাতাও আর ভাল লাগছে না। এখানে সম্মান, বাঁধা মাইনে এবং মনের মত কাজ । Summer vacation-এর আগে join করতে পারলে আফগানিস্তানে ২ মাস গিয়ে Experimental Film করার সুযোগ আছে।

মুরারীর অগাধ আস্থা আমার ওপরে, ইন্দিরা গান্ধীও অনেক কিছু করেছে আমার জন্যে, গিয়ে বলব।

Part time ৩/৪ মাস আমি যে কোন সময়ে করতে পারি। সে কথা হয়ে গেছে। কিন্তু এখন Guaranteed একটা কিছু কয়েক বছরের জন্য করতে পারলে ভাল হয়। গিয়ে আর সব কথা বলব। নারানকে এ'কদিন কাছে রেখো।

পুণা

১৬.২.৬৫

...অজিতকে জিজ্ঞাসা কোর—পথে বা এখানে এসে একেবারে ছেড়ে দিয়েছি। এই ২/২½ আড়াই মাস হোক আমার চেষ্টা। দেখি, আবার সহজ জীবনে ফিরতে পারি কিনা।

টাকা যেমন পারি পাঠাচ্ছি, ২০ তারিখ নাগাদ শ'চারেক টাকা পাবে। ও মাসের গোড়ার দিকে মোটা টাকা পাঠালে অবিলম্বে বাড়ীটা ছাড়, ও বাড়ীটা আমার কাছে সবসময় এখন Death House মনে হয়, তোমাদের বলি না।

বাচ্চাদের জন্য যতখানি পার খরচ কর, তোমার জন্যে যা দরকার (স্বাস্থ্যের ভালর জন্যে), ইতস্ততঃ কোর না।

বেশী লিখলাম না। নারান নিশ্চয়ই থাকে। অজিত মাসকাবারে দিয়ে যাবে। আমি ৭৫্ দিয়ে একটা একা ঘর নিয়েছি। টুনু-বুলু-বাবুকে আপ্রাণ ভালবাসা। তোমাকে তো বটেই। সব থেকে তোমাকে বঞ্চিত করলেও তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। সব ছেড়ে টাকা টাকা করে ঘুরে সেটাকেই প্রকাশ করার বোধহয় চেষ্টা করি। জানি না ঠিক।

পুণা

২৭.২.৬৫

...আমার এখানকার চাকরী হবে বলেই মনে হচ্ছে। আর মাসখানেক বাদে থাকা হবে। আমার এ কাজই ভাল। তবে এখানে একা থাকা বড়ই কষ্টকর। মনটা সবসময় খারাপ থাকে।

টাকাটা এখন পাওয়া গেল না। হপ্তাখানেক পরে হয়তো পেতে পারি। কষ্ট করে আর ক'টা দিন চালাও, তারপর হয়তো একটা সুস্থির অবস্থা আসবে।

আমি বারো তারিখে রওনা হয়ে ১৪ই কলকাতা পৌঁছোচ্ছি। এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে যাচ্ছি। এখানে দম আটকে আসছে। তিনদিন কলকাতায় থাকলেও মনটা ভাল হবে।

তাছাড়া সুবর্ণরেখা France-এ পাঠানোর ব্যাপারটাও পাকা হয়েছে। সেজন্যে রমেশের দরকার এবং অনেক কিছু কলকাতায় করার আছে। আর একটু কথা বোম্বেতে হলে তোমাকে আমি কি কি করতে হবে লিখব, নারানকে দিয়ে সেগুলো করিও।

যাবার সময় আবার কিছু টাকা নিয়ে যাব। টুনু-বুলু-বাবুর জন্য জামা, তোমার জন্য শাড়ী।

পুণা

৪.৪.৬৫

...এখানে আসার পর থেকে আমি একদম খাচ্ছি না। এবং ইচ্ছে আছে আর খাবও না। এভাবে আমাদের সবার জীবন নষ্ট হতে দেব না। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যা গেছে তাকে আর ফেরানো যাবে না, কিন্তু এখনও অনেক কিছু করার ক্ষমতা আছে, তোমাদের আনন্দ দেবার আছে এবং সেগুলো আমি দেবই। কিন্তু পুণার চাকরী না নিলে কিছুতেই হবে না। ঐ পরিবেশ থেকে আমাকে কিছুদিনের জন্যে বেরিয়ে আসতেই হবে। অনেকবার বলেছি, এবারে কাজে দেখাতে হবে।

শরীরের চিকিৎসা কোর। পয়সার কথা একদম ভেবো না। বাকী সমস্যা এক এক করে সমাধান করে ফেলা যাবে।

—বেশী লেখা যায় না।

পুণা

৫.৬.৬৫

...শেষ অবধি আজকে সইটা করেই ফেললাম। এখন থেকে আমি এখানকার Vice-Principal।

নারানকে লিখছি Matric ও B.A. Certificate Original এবং Passport পাঠাতে। ওটা না এলে নাম Gazetted হবে না। মাইনেও পাব না।

আমার এলার্জি কমে গেছে, Drink রাত্রে। এখনই Permit নিতে যাচ্ছি। ওটা তৈরী হয়ে পড়ে আছে।

পুণা

১২.৭.৬৫

এতদিন তোমাকে লিখিনি। কারণ অসিতবাবুর টাকাটা আসার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। আজ এসেছে।

...আসার সময় তোমার যা চেহারা দেখে এসেছি, প্রতি মুহূর্তে আমার ভয় করছে। ভাল করে চিকিৎসা কর। আমি জানি, আমিই তোমার একমাত্র অসুখ. এবং আমি ঠিক না হলে তোমার ভাল হবে না। এবং তুমি আমার ওপরে সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়ে ফেলেছ।

আমার Task হচ্ছে, সেই আস্থাকে আবার জাগরূক করা। দেখি পারি কিনা। কিন্তু তোমাকে কোনদিনই দোষ দেব না। দোষ সম্পূর্ণ আমার। আমার শরীরটাও অসম্ভব খারাপ। জোর করে চেষ্টা করছি যাতে আবার স্বাস্থ্য ফিরে পাই।

'সুবর্ণরেখা' ৩০ তারিখে Release শুনছি। এখনও পাকা খবর পাই নি। পেলে জানাব। এটা হলে আমি ২৬/২৭ তারিখে দিন সাতেকের জন্য যাব এবং Distributor-এর পয়সায় একদিনের জন্য শিলং ঘুরে আসব। তোমাদের সবার জন্য কিছু জিনিষপত্র কিনেছি। সেগুলো তাহলে ডাকে পাঠাব না। না হলে ডাকেই পাঠিয়ে দেব।

কুশারীরা বলেছে ছবি সেপ্টেম্বরে শুরু করবে। ওদের খবরও আশা করছি এক সপ্তাহের মধ্যেই পাব।

'সুবর্ণরেখা' Veniceএ Selected হয়েছে। এখানের সরকার বাঁদরামো না করলে ওটাও একসপ্তাহের মধ্যে Venice যাবে।

এখানে কাজে ডুবে আছি। প্রচুর সম্মান এবং শ্রদ্ধা। এইটেই সান্ত্বনা। পত্রপাঠ জবাব দিও। টুনু-বুলু-বাবুর কথা সারাক্ষণ মনে পড়ে।

পুণা

১৯.৭.৬৫

তোমাকে ছেড়ে থাকা যায় না। এখনও মাইনে পাইনি ২১ তারিখে medical হবে। মনে হয়, অগাস্টের প্রথমেই মাইনে পাওয়া যাবে। প্রাণভরা ভালবাসা ভালবাসা, ভালবাসা।

Film Institute of India

Poona-4

20.7.65

আমার শ্রীমতি,

ভালবাসা, ভালবাসা, প্রাণভরে ভালবাসা।

আর কিছু আপনাকে লেখার নেই।

নমস্কার মশায়।

আপনারই একমাত্র

ঋত্বিক

পুণা

২৪.৮.৬৫

এখানে এমন বিশ্রী ঝগড়ার মধ্যে পড়ে গেছি যে, অন্য কিছু করার সময়ই পাচ্ছি না। চাকরিটা শেষ অবধি রাখব কিনা আমাকে ভাবতে হচ্ছে। যাকগে এসব নিয়ে তুমি একদম চিন্তিত হয়ো না। যা করার আমি করব।

তোমাদের চারজনের মুখ খালি খালি মনে পড়ে। এই নিয়েই বেঁচে আছি।

আমি সেপ্টেম্বরের ২০/২৫ তারিখে কলকাতায় যাচ্ছি। তখন শিলং-এ গিয়ে তোমাকে কলকাতায় নিয়ে আসব।

মনের উদ্বেগ একেবারে কাটিয়ে শরীরটাকে ভাল কর। প্রতি সপ্তাহে চিঠি দিও।

পুণা

৫.৯.৬৫

পুণায় বড় গণ্ডগোল। আমি তাই লিখতে পারিনি। আমি আগামী ১৮/১৯ তারিখে মাদ্রাজ হয়ে পণ্ডিচেরী যাব মিলির সঙ্গে দেখা করতে, ওর চিঠি সঙ্গে পাঠালাম।

কলকাতায় হয়তো ২৫ তারিখে যাব। গেলে শিলং পাহাড়ে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করব।

ভীষণ ব্যস্ত Riot-এর জন্য। চিন্তা কোর না।

এ খালি বদমাইসী।

আমার তিনপাখীকে পরম আদর।

তোমায় আপ্রাণ ভালবাসা।

কিছু বুঝতে পারছিলাম না কী হল। চিন্তা করতে বারণ করলেও খুবই চিন্তায় ছিলাম। আর কোনও চিঠি পাইনি। এরপরে হঠাৎ অক্টোবর মাসেই চাকরি ছেড়ে শিলংয়ে এসে উপস্থিত।

কলকাতা যাবার টিকিট কাটা হয়ে গেছে। ওই সময় একটানা সতেরো ঘণ্টা 'পণ্ডিতমশাই' গল্পটির স্ক্রিপ্ট লিখতে লিখতে অজ্ঞান, হ্যালিউসিনেশন, ডেলিরিয়ম, সেই সময়কার অবস্থা অবর্ণনীয়। কী চিন্তায় যে দিন গেছে।

একটু সুস্থ হবার পর আমাদের কলকাতায় নিয়ে এসে অস্বাভাবিকতা আর স্বাভাবিক হল না। অনেক ভেবে আমার ভাইকে চিঠি লিখলাম। হাসপাতালে ভরতি করা হল।..... এমনি ভাবেই শেষ হল ১৯৬৫।

৮

অথচ এই বছরটাতেই লেখা হচ্ছিল এইসব প্রবন্ধ:

'বক্তব্য আমার কিছু নেই, কারণ আমার পক্ষে ব্যবহারিকভাবে ছবি করা সম্ভবপর হচ্ছে না। কিন্তু একজন সাধারণ ব্যক্তি হিসেবে বলবো,—মানবজীবন যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে,—তাতে করে ভাবতে ভয় লাগে যে আজ থেকে পঁচিশ বছর পরে আমরা কোথায় থাকবো !

আপনারা মশাই ছবি করেন, দেখেন, ভালবাসেন। কাজেই আপনাদের কাছে আমার হয়তো কিছু বলবার অধিকার আছে। একটা কথা, যেটা আমার জীবন দিয়ে আমি বুঝেছি, সেটা বুঝতে গেলে আপনাদের খানিকটা পরিষ্কার হতে হবে। আপনারা সত্যিই ঘটনাটাকে ধরতে পারবেন না যখন আমি বলবো যে ছবি করতে হলে সর্বপ্রথমে ছবির জগৎটাকেই বাদ দিতে হয়। ছবি করার প্রথম শর্ত হচ্ছে মানবিকবোধ এবং বাস্তবজগৎ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান। জীবনকে উপলব্ধি করতে না পারলে শিল্পী হওয়া যায় না এবং শিল্পী না হলে, আপনার কোনো অধিকার নেই মানুষকে প্রবঞ্চিত করার।...

আমি এখন কলকাতা শহরে দেখছি যে মিথ্যাচরণ অপরিসীম ভাবে চলছে। আমার পক্ষে এগুলো সহ্য করা সম্ভব নয়। যতদিন আমি থাকবো পরিষ্কার একথা বলে যাব।...আপানাদের ধন্যবাদ যে আপনারা আমার বক্তব্য শুনতে এসেছেন।...আমি তো মুছে গেছি। এইটুকুর জন্যে আপনাদের আমার মনে থাকবে।

প্রথম যে ছবি আমি আরম্ভ করি তার নাম হচ্ছে 'নাগরিক'। সেটা ছিল অন্য যুগ। তখন আপনাদের ছবি দেখার আন্দোলন কিছুই ছিল না। সেটা ছিল উনিশ শ বাহান্ন সাল, তখন লড়াই করা গিয়েছিল এবং মোটামুটি ছবিটা খুব খারাপ হয়নি। আমার 'নাগরিক' ছবিতে একটা দৃশ্য ছিল যেখানে এক মা সমস্ত হারিয়ে কেবল এক শিশুপুত্রের জন্যে চিন্তা করছে এবং সে নিজে ফিরে গেছে তার শৈশবে। সেইখানে আমি যখন খাদের কাছে গিয়ে প্রভাবতী দেবীকে এই দৃশ্যটি বুঝিয়ে দিলাম তখন ওঁর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগলো। এবং আমাকে একবারও সে দৃশ্যের সংলাপ পুনরাবৃত্তি করতে হয়নি। উনি যে কি মহৎ ছিলেন সেটা আমি বুঝি কারণ এইসব মানুষগুলোর সঙ্গে আমাকে কাজ করতে হয়েছে। আমি তো একথা স্বীকার করে যাবো যে এত বড় শিল্পী আমি আর দেখিনি। এমন প্রাণ বহু কষ্টে পাওয়া যায়,—তার গভীরতা, তার উত্তাপ যারা সহ্য করেছে, তারা বুঝবে আর কেউই বুঝবে না। 'নাগরিক' ছবি করার মধ্যে এইটাই আমার সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা বা সঞ্চয় বা পরমার্থলাভ।'

এই সময়েই 'যুগান্তর' পত্রিকার ১৩.৮.৬৫ তারিখের সংখ্যাটিতে বেরোয় এই সংবাদবিবরণী :

'বেঙ্গল ফিল্ম জার্ণালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের (বি.এফ.জে.এর) সভ্যবৃন্দ কৃতী পরিচালক ও কলাকুশলীদের সর্বাধুনিক চিত্র এবং চলচ্চিত্রচিন্তা সম্পর্কে পরিচয়লাভের অভিপ্রায়ে যে আলোচনাচক্রের প্রবর্তন করেছেন, তার দ্বিতীয় অধিবেশনের (১.৮.৬৫) আলোচনাসভায় স্পষ্টবাদী শ্রীঋত্বিক ঘটক সাংবাদিকদের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরদানে যে অন্তরঙ্গ পরিবেশটি গড়ে তোলেন তা দীর্ঘদিন স্মরণে রাখার মতই।

জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্ন: তাহলে তো আপনি নৈরাশ্যবাদী? কেন, জীবনে কি আশার কোনো আলোকই দেখতে পান না আপনি? এর উত্তরে শ্রীঘটক বলেন, না নৈরাশ্যবাদী আমি নই। আশার আলোক আমিও দেখতে চাই। কিন্তু পথ কোথায়? সেই পথের সন্ধান করছি আমি। 'সুবর্ণরেখা'র মধ্যে ছেলেমেয়েদের দিয়ে দেখাতে চেয়েছি এই পৃথিবীর বাইরে একটি দিগন্ত আছে। সেইদিকেই চোখ ফেরাতে বলেছি আমি তাদের।...

...দর্শক আমার ছবি নেবে না এমন কথাও কখনো মনে করি না। কিন্তু তা বলে বক্স অফিসের চাহিদায় সায় দিয়ে ছবি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আনন্দের কথা, আজ দর্শকদেরও রুচি বদলেছে। অথচ ১৯৫৫ সালের পূর্বে, এখন যা দেখছি, সেই চিত্রটি ছিল না। এটাই যা আশার কথা।'

'৬৫ সালেই 'সুবর্ণরেখা' মুক্তি পায়। ছবিটি বিদেশে পাঠাবার আগে সাবটাইটেল করবার জন্য ফরাসিভাষায় অনুবাদ করা হয়। সেই সাবটাইটেলের কপিটি আমার কাছে আছে।

কিন্তু ছবিটি শেষপর্যন্ত বিদেশে যায়নি। পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপালকে লেখা তখনকার একটা চিঠি থেকে অবস্থাটা অনুমান করা যাবে :

6th August, 1965.

The Principal,
Film Institute of India,
Poona 4.

Sir

I am in receipt of the communication from Delhi about which you have kindly asked for my comments.

I request you to be a little patient and go through this note and then take any action that you may deem fit.

(1) Back in January, 1955,– when the International Film Festival was held. Mr. Georges Sadoul came to this country as a member of the Jury, He came to Calcutta also and saw my film "SUVARNA REKHA" and was comepletely over whelmed with it. He invited the film from Paris for last Cannes Festival. I had shown this film to other eminent critics like Lindsay Anderson, Madame Kawakita, Guy Cloverand others from allover the world. From their reactions and the praise that they expressed I could be quite sure that this film, if sent to any major festival of the world. will definitely bag one of the major awards and thereby bring prestige to our country.

(2) After the invitation from Mr. Groges Sadouul asked my distributors to spend money for sub-titling and making new copies etc. For this work quite a few thousands of rupees we have spent alredy. Then came the release letter from the Ministry for necessary froeign exchange so that the film could be subtitled in Paris. I may point out here that there is no subtitling facilities in India. Unfortunately the

Ministry saw fit to release froeign exchange on condition that the film will be shown in Non-Competitive Section. I and my distributors both felt that such an entry is not worth spending so much money upon and taking so much trouble with. Here it may be pointed out that every Festival Authority has full rights to invite film from individual producers form any country. My film was being entered in Cannes not as my official entry for India but on the individual strength of the film itself so the question of sponsoring this film at Cannes did not arise.

(3) Any way due to these reasons I could not send my film to Cannes in time. Then Mr. Sodoul sent invitations again for Venice Film Festival this year where also it was being accepted as individual entry.

But this time the Government did not find out case suitable for release of Foreign Exchange. They also pointed out that the film, to be eligible in a major festival, should be censored within 12 months prior to the holding of that festival. Fot this reason we again spent money, edited the film and censored it again, though the festival authorities have every right to invite any film of any period as I have told you earlier. Now after doing all these expenditure the Government did not consider us fit for release of foreign exchange.

As you can understand, as an Artist I am attached emotionally with my work. And I fear the whole episode was very much frustrating to me. After all this I have become a Government servant now, and I regret to have written

harshly to the Ministry' of Information & Broadcasting out of all the frustrations for which I apologise. That letter was written not as Vice-Principal of the Film Institute of India but in the capacity of Shri Ritwik Ghatak, Artist, Producer and Director of "SUVARNA REKHA".

Anyway, if any further explanation is necessary I am ready to do so at your command.

Thanking You

RITWAK GHATAK
Vice Principal

পুণাতে 'Fear' নামে একটি ছোট্ট ফিল্ম তৈরি করা হয় অ্যাক্টিং কোর্সের ছাত্রদের নিয়ে। আর একটি ছোট্ট ছবি 'Rendezvous'ও এই সময়ই তৈরি করা হয়। আরও একটি উল্লেখযোগ্য কাজ এই সময় করেছিলেন। পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের সম্পূর্ণ ডিরেকশনের কোর্সটি তৈরি করা হয়েছিল। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।)

পুণায় ছাত্ররা ভালোবাসত খুব। চাকরিটি ছেড়ে আসার সময় সবাই খুব দুঃখিত হয়েছিলেন। পুণার গল্প অনেক শুনেছি। বিরাট লাইব্রেরি ও ফিল্ম আর্কাইভ—Mr. Nair, প্রিন্সিপাল জগৎ মুরারী ও ছাত্রদের কথা বার বার বলতেন।

"পুণার চাকরির যুগ আমার সবচেয়ে আনন্দময় যুগের মধ্যে একটা। সেখানে নতুন ছেলেমেয়েরা অনেক আশা নিয়ে, অনেক বাঁদরামি নিয়ে আসে, বাঁদরামি মানে ঐ নতুন মাস্টার এসেছে তার পেছনে লাগতে হবে। তাদের মধ্যে গিয়ে আমি ঝপাঙ করে পড়লাম। তাদের মন জয় করা, তাদের বলা যে ছবি অন্য ধরনের হয় এর যা আনন্দ ঠিক বলে বোঝানো যাবে না, অন্য ধরনের আনন্দ যে অনেক ছেলেমেয়ে গড়লাম। আমার ছাত্রের দল সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গেছে, কেউ নাম করেছে, ঢেউ দাঁড়িয়েছে, কেউ ভেসে গেছে।

মণি-কাউল, কুমার সাহানী ও ঐ batch টা, K.T.John (কেরালাতে

আছে), শত্রুঘ্ন সিন্‌হা, রেহানা সুলতান, মহাজন, তারপর ধ্রুবজ্যোতি এরা সবাই আমার ছাত্র। দিল্লী গিয়ে দেখি Sound Engineer আর ক্যামেরাম্যানের মধ্যে ভর্তি আমার ছাত্র। ও সব দেখে একটা অদ্ভুত আনন্দ হয়, মাষ্টারদের আনন্দ, যাদের আমি পড়িয়েছি, লিখিয়েছি তারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, নিজের নিজের Sphereয়ে তারা Successful এর মধ্যে আমারো Contribution আছে বলে গর্বিত মনে করি, rightly or wrongly।

তারপর চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম। লোকের কাছে ভিক্ষে করব না, মাথা নিচু করব না, এই ভাবেই চলছিল, এর মধ্যে drinkingটা ভয়ঙ্কর বেড়ে গেল, বারবার অসুখে পড়তে লাগলাম, আপনারা সবই জানেন, পাগলা গারদের কথাও জানেন। তা এরই ফাঁকে ফাঁকে ছবিগুলো করেছি প্রচণ্ড অসুবিধের মধ্যে, কেউ পয়সা দিতে চায় না, ডকুমেন্টারীর কাজ পাওয়া যায় না। নানাধরনের ফ্যাঁকড়া। এর মধ্যে কোনটা একেবারে পয়সাবিহীন অবস্থায় করা, কোনটা একটু ভালভাবে করা! চেষ্টা করেছি ভালোভাবে করার।'*

এই উক্তি থেকে বোঝা যায় তখনকার অবস্থা। পুণার চাকরির যুগটা খুবই উল্লেখযোগ্য জীবনে। ওখানে থেকে কাজ করতে পারলে একদিকে ভালো হত। কিন্তু শিল্পীমন সরকারি নিয়মকানুনের মধ্যে থেকে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল।

আর কলকাতায় এসে এত আশার 'বগলার বঙ্গদর্শন'ই শেষ হল না। কুশারীবাবুরা তো চেষ্টা করেছিলেন।

তবে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সুস্থ থাকতে পারলে আবার কাজকর্মের সুযোগ আসত—আবার সব ঠিক হয়ে যেত। লূম্বেনি সুপারিনটেন্ডেন্টের চিকিৎসাও আর এগোল না। আমি নিজে চেম্বারে গিয়ে ওষুধ নিয়ে আসতাম। এরপরে হেমাঙ্গদা একবার পাভলভ ইনস্টিটিউটের ধীরেন গাঙ্গুলীর কাছেও নিয়ে গিয়েছিলেন।

---

* ১৯৭৩ সালে হাসপাতালে সাক্ষাৎকার, 'চিত্রবীক্ষণ'।

১৯৬৬ সালে কাজকর্মের সুযোগ এসেছিল, সুবর্ণরেখা আটটা পুরস্কার (B.F.JA.-র) পেয়েছিল। কিন্তু কিছু করা হল না। '৬৩, '৬৪ ও '৬৫ সালে দুঃস্বপ্ন ও অনেক বিভীষিকাময় দিনগুলোর মধ্যেও একটা আশা ছিল সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু' ৬৬ সালে সে আশা নির্মূল হল। আমি বুঝতে পারছিলাম ছেলেমেয়েদের রক্ষা করবার জন্য আমাকে একটা কিছু করতেই হবে। আমার মন দৃঢ় হয়। অসীম চেষ্টা সেজন্য আমাকে করতে হয়েছে। আমার দুঃসময়ে অনেক কথাই শুনেছি। সেগুলো অপ্রত্যাশিত, এবং আমার জীবনের সমস্যাকে কঠিন থেকে কঠিনতরই করেছে। আর—একটা কথা আমাকে বার বারই বলা হয়েছে, 'শিলং চলে যাও, বাবার কাছে চলে যাও।'

নিরুপায় হলে বাবার কাছে নিশ্চয়ই যেতাম, গেলে আশ্রয়ও পেতাম। কিন্তু বাবার বয়স হয়েছে, সুতরাং তাঁর কাছে যাবার আগে, স্বাবলম্বী হবার জন্য একটা শেষ চেষ্টা আমাকে করতেই হবে।

তা ছাড়া স্বর্গ তো আমার জন্য কোথাও তৈরি নেই, সুইট হোম কোথাও নেই। বাবার দুটো বাড়ি শিলংয়ে, আত্মীয়স্বজনে ভরতি। অনেক সমস্যা। আমার মা, বোন, দাদা, দিদি, কেউ নেই। একমাত্র ছোট ভাই বহুদূরে মাইশোরে থাকে।

স্বাবলম্বী হয়ে চলে আসতে আমার একটু সময় লেগেছে। এবং বাবা ভাই সাধ্যমতো আমার জন্য সবসময় করেছেন।

আর বাবা, ভাই ও আমার—এই তিনজনের সব সময়ই চিন্তা ছিল অসুস্থ মানুষটি সম্বন্ধে। বাবা তাঁর জামাইকে স্নেহ করতেন সন্তানের মতো। ভাই বার বার এসে সাধ্যমতো করেছে। শুভানুধ্যায়ীরাও সব সময়ই এগিয়ে এসেছেন। মনে পড়ে পরিচালক ও অভিনেতা দিলীপ মুখার্জি এসেছিলেন। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তমকুমার, তরুণকুমার প্রভৃতি। সবাই চাইতেন তাঁদের ঋত্বিকদা যাতে সুস্থ হয়ে কাজ করেন।

৯

১৯৬৬-৬৭ সালেও লিখেছিলেন অনেক প্রবন্ধ। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'আমার ছবি' প্রবন্ধটিতে লিখেছিলেন:

'আমার শিল্পীজীবনের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এই দুই অবস্থাতেই বুঝেছি যে, সংগ্রামকে শিল্পীজীবনের নিত্যসঙ্গী করে তুলতে হয়। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সংগ্রাম করে যেতে হবে। সাময়িকভাবে কোনো সংকট আচ্ছন্ন করে ফেললেও সামগ্রিকভাবে তা যেন আপোসের পথে টেনে নিয়ে যায়, অর্থাৎ সংকটের কাছে আমরা যেন বিবেক-বুদ্ধি সবকিছু নিয়ে আত্মসমর্পণ না করি।'

এর পরের উল্লেখযোগ্য একটি প্রবন্ধ 'চলচ্চিত্র চিন্তা'* থেকে :

'Comperative Mythology' বা 'তুলনামূলক পুরাণতত্ত্ব' বলে বিজ্ঞানটি ক্রমশই একটি বিচিত্র ঘটনাকে উদ্‌ভাসিত করে তুলছে। বিশেষ করে C.G. Jung সাহেব যখন কতকগুলি সূত্র তুলে ধরলেন, এক নতুন আলোকপাত হলো মানুষের এবং প্রাণের ইতিহাস ও প্রাক্‌ইতিহাসের ওপর। Collective *Unconscious*, যৌথ অবচেতনা ব্যাপারটা প্রকাশ করলো এই কথা যে আমরা আমাদের মাথার মধ্যে বহন করে চলেছি বিচিত্র সব চিত্র *যাদের জড়* শুধু মানুষের মানুষ হবার পর থেকেই নয়, তারও আগেকার কালে বিবৃত। এই কথা জানা গেল যে, বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে কতকগুলো মূলতম archetype পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। বিভিন্ন মানবসভ্যতার বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখি সেই একই Complex। জীবনচিত্র, কিভাবে archetypal image বা মৌলপ্রতিমার মধ্য দিয়ে Symbol অর্থাৎ প্রতীকে পরিণত হতে থাকে।...

Great Mother image 'মহীয়সী মাতা' প্রতিমার যে ব্যাপকতা তা আমরা এখন জানতে পারি Erich Neumann-এর মহামূল্যবান বইটি পড়ে। অথচ এই 'মহীয়সী মাতা', তার যে দুই রূপ, বরাভয় এবং ভয়ংকরী (the benevolent and terrible aspects), এদের সঙ্গে আমাদের সভ্যতার নিবিড় ঘনিষ্ঠতা সেই আদিকাল থেকেই এবং আমাদের পুরাণ, আমাদের

---

* ১৩৭৩ সালের 'শারদীয় ফিল্ম' পত্রিকায় প্রকাশিত। 'মুভি মমতাজ' প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৯৬৭।

মহাকাব্য, আমাদের শাস্ত্র ও আমাদের লোককথা তার প্রতি স্তরে স্তরে এই মৌলপ্রতীকটি আমাদের জড়িয়ে রেখেছে।....

আমার ছবিতে আমি বুঁদ হয়ে এ ধরনের ঐতিহ্যের মধ্যে হারিয়ে যেতে চেয়েছি।'

'পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক চিত্র এবং আমি' প্রবন্ধে আছে :

"ভারতে পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র অধিক নির্মিত হয়নি, যে কটিই বা হয়েছে, তার অধিকাংশই বাংলায়।

...আমরা সকলেই জানি যে পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুই আপেক্ষিক, তা হল চলচ্চিত্রের মধ্যে যে পরীক্ষা বা গবেষণা হয় তার সঙ্গে কিসের আপেক্ষিক সম্বন্ধ বিরাজমান?

এই সম্পর্কটি হচ্ছে মানুষ ও তার সমাজের সঙ্গে। শূন্যে তো কোন পরীক্ষা চলতে পারে না। সুতরাং কারো না কারো সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে হবে, এবং এই সংশ্লিষ্টতা হচ্ছে মানুষের সঙ্গে।...

আমার ছবিগুলিতে আমি যতদূর পেরেছি চেষ্টা করেছি আমার দেশ ও আমার দেশের মানুষের দুঃখকষ্ট ও নির্যাতনকে চিত্রিত করতে। আমার সাফল্য যতদূরই হোক না কেন, আমার আন্তরিকতায় কোন অভাব এতটুকুও ছিল না বলে মনে হয়।...

আমার 'কোমলগান্ধার' ছবিটি, আমার মনে হয়, এ দেশের চলচ্চিত্রে যে সমস্ত বাধাবিপত্তি আছে, সেগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পেরেছিল। এই ছবিটির যে মূল বক্তব্য এবং সেটিকে উপস্থাপন করা হয়েছে যে ভাবে, সেগুলি বিচার করলে এটিকে একটি পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্রের আখ্যা দেওয়া যেতে পারে হয়তো।

'সুবর্ণরেখা'—এই চিত্রটির দ্বারা আমি প্রচলিত ধারার উপর সরাসরি আঘাত হানতে চেয়েছিলাম।

এই ছবিটিকে মেলোড্রামা বলা হয়েছে এবং তাতে কিছু ভুল হয়নি। সমালোচকদের স্মরণে থাকা উচিত ব্রেশ্‌টের কথা। তিনি কিন্তু বিচিত্র

ঘটনা পরম্পরার উপরে নির্ভর করেছেন, এবং 'বিচ্ছিন্ন অনুভূতি'র একটা ব্যাপার তৈরী করেছিলেন, কথাটা মনে রাখা ভাল।

তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা আমাকে প্রভাবিত করেছে।...আজকে আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করবো।—

প্রত্যেক শিল্প একমাত্র সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেই সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। শুধুমাত্র সত্য দ্বারা শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নয় এ কথা সত্যি, কিন্তু সত্য ব্যতীত শিল্প সম্পূর্ণ হয় না। আমরা এটুকু মনে রাখলে ভাল করবো।'

'আজকের ছবির পরিণতি' প্রবন্ধের খানিকটা অংশ*:

''আজকের পৃথিবীতে ছবি সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা নানারকম হচ্ছে। সেগুলো সম্পর্কে যদি আমরা অবহিত হতাম, তা হলে সত্যই আনন্দ পেতাম।

প্রথমত গল্প ব্যাপারটাই মোটামুটি বাদ হয়ে গেছে। আজকে ছবির জন্য সারা পৃথিবীতে যে জোয়ার এসেছে, সেখানে গল্পের কোনো অবকাশ নেই। অতি সম্প্রতি মিৎসুগুচি মারা গেছেন। তাঁর কিছু কিছু কাজ দেখেছি। বা ধরুন আন্দ্রেই তারকুভসকির ছবি। অথবা ওজু এবং কুরোসাওয়ার ছবি। এগুলোর মধ্যে যে রসের সন্ধান পেয়েছি, তা সত্যিই অনবদ্য।

এদের সঙ্গে আমি বলব Fellini-র কথা। এই ভদ্রলোক অনেক গভীরে ঢুকেছেন। পোলাণ্ডে আঁদ্রেই ভাইদা (Wazda) কিছুকাল কাজ করেছিলেন।....

আমার সত্যিকারের শ্রদ্ধা যদি কারো ওপর থাকে তিনি হচ্ছেন লুই বুনুয়েল। আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে, উনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এখন পর্যন্ত নিজের বিবেক বিক্রি করেন নি।....

নাটক এবং ফিল্মের জগতে Bertolt Brecht-এর চিন্তাধারা প্রচণ্ডভাবে কাজ করছে এখন।.... মানুষজনকে গল্পে ভুলিয়ে কাঁদানো আর সাধারণ সস্তা দৈহিক ব্যাপার দেখানো, এসব দিয়ে কোনো সৎশিল্পী আর খুশি হতে পারছেন না।...

---

* দেশ, বর্ষ ৩৫ সংখ্যা, ৯, ১৩৭৪।

আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে বিশেষ কিছু বলার নেই। যদি কিছু করে থাকি, করেছি। ভবিষ্যতে কিছু করতে পারব কিনা তা ভবিষ্যতের মধ্যেই নিহিত আছে। তবে কিছু কথা বলে যেতে চাই। সেটা আমাদের দেশে ছবি কর'র ব্যবস্থা সম্পর্কে।

বাংলাদেশের ছবি আসলে পরিচালনা করেন প্রদর্শকরা। তাঁদের কথা ভেবেই ছবি হয় এবং তাঁদের হুকুমেই ছবি বন্ধ হয়। এঁরাই সর্বাগ্রে টাকা তোলেন। তারপরে এঁরা সুবিধামত পরিবেশকদের দেন। তারপরে পরিবেশক যখন ভাল বোঝেন তখন প্রযোজককে টাকা দেন। অথচ তাঁকেই অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় শেষ পর্যন্ত। এই ঘটনাটা সমস্ত ছবির জগৎকে গলাটিপে মারছে।

আর একটা ঘটনা আপনাদের শুনিয়ে দিই। চিত্রপ্রদর্শকদের একটি খুব ভাল ব্যবস্থা আছে m.g. বলে, তার সাহায্যে একটা লাভের ব্যবস্থা থাকবেই।....'হাউসফুল' না হলেই ওঁরা মনে করেন আমাদের ক্ষতি হোল। এ সম্বন্ধে সকলেরই খানিকটা ভাবা দরকার। এর যে কি প্রতিকার সেটা বলাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এ সমস্যাগুলোর সমাধান না হলে ভারতবর্ষে ভাল ছবি হবার কোনো সম্ভাবনা আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমি নিজে কিছু করি বা না করি, ভবিষ্যৎ পুরুষ যাঁরা আসবেন, তাঁদের জন্যে কথাগুলো বলে রেখে গেলাম। বোধহয় বলার দরকার ছিল।'

এই প্রদর্শকরা ছবির জগৎকে গলা টিপে মারছে, বহুদিন শুনেছি। অনেক মিটিংয়ে বক্তৃতা দিতে শুনেছি, চলচ্চিত্র ব্যবসাকে ন্যাশনালাইজ বা জাতীয়করণ করা হোক। ১৯৭৪ সালে মনে আছে একটি সভায় (ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে) এই জাতীয়করণ সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন। 'চিত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ' নামে অসমাপ্ত প্রবন্ধেও জাতীয়করণ সম্বন্ধে লিখেছিলেন : 'সোজাসুজি সব কটা দেশের চিত্রগৃহকে রাতারাতি সরকারী সম্পত্তি করে ফেলা।' ...২৪।৯।৬৭ তারিখে লেখা 'চলচ্চিত্রের স্বরূপ কি?' প্রবন্ধটি সম্ভবত কোনও ভাষণের খসড়া। এর আগে কোথাও প্রকাশিত হয়নি।*

'চিত্রবীক্ষণ', ঋত্বিক ঘটক।

'নিরালম্ব বায়ুভুত শিল্প কখনো শিল্পের পর্যায়ে ওঠে না। মানুষটিকে কোথাও না কোথাও আত্মীকরণ করতে হয়। ভাল না বাসলে শিল্প জন্মায় না। এর প্রকাশভঙ্গী বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, শিল্পীর মেজাজের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু মূল সূত্রটি সেই 'সত্যম্, শিব্ম সুন্দরম্।' ভাল করে তাকিয়ে দেখুন, প্রথমে সত্য। সত্যসিদ্ধ না হলে কোন শিল্পই শিল্পের পর্যায়ে ওঠে না। এটা প্রথম কথা। শিবম্ কথাটা বাংলায় খুব প্রচারিত নয়। কথাটার মানে হচ্ছে, যা কিছু শাশ্বত। এখানে প্রশ্ন আসে যে কি শাশ্বত?

সেইটাই শাশ্বত, যেটা আপনি দুঃখ দিয়ে অর্জন করেছেন। শাশ্বত হচ্ছে সেই জিনিসগুলো, যেগুলো আপনি আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে খুঁজে পেয়েছেন।...

সুন্দর! এর কোন সংজ্ঞা নেই। এটা সম্পূর্ণ আপনার রুচির উপর নির্ভরশীল। সৌন্দর্য্যের কোন মান নেই। দেশে দেশে, কালে কালে, সৌন্দর্য্যের মান বিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু সত্য এবং শিবকে অস্বীকার করে যে সুন্দর দাঁড়ায় তাকে ঘৃণা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

এই কথাগুলো মনে রাখলে ছবি সম্পর্কিত খানিকটা ভাবনাচিন্তা করা চলে। কারণ, ছবিকেও আজকাল শিল্প বলে মনে করা হচ্ছে।...আমি দুঃখিত যে ভাল কথা বেশী বলতে পারলাম না, তবে মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, রবিবাবুর এই কথাটা আমি মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করি। ভদ্রলোক কিছু ঠিকঠাক কথাবার্তা বলে গিয়েছিলেন। এবং সে কথাকে তিনি নিজের জীবনযন্ত্রণার মধ্য থেকে উৎসারিত করেছিলেন। সেইটাই আমাদেরকে এখানে খানিকটা পরিমাণে প্রেরণা দিচ্ছে।

মুখে বললে আমাদের মুখের ভাষাও হারিয়ে যাবে। বাংলাভাষার, যে ভাষার আমরা এখন কথা বলি, সে ভাষার জন্ম দিয়েছেন তিনি।

ওঁকে প্রণাম।'

এই ১৯৬৭ সালেই 'সুবর্ণরেখা'র প্রয়োজক রাধেশ্যাম ঝুনঝুনওয়ালা একবার এসেছিলেন। 'আরণ্যক ছবিটি করবার খুবই ওঁর ইচ্ছা ছিল জেনে ব্যারাকপুরে

শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দু'জনে কথা বলতে যান। ওই সময়কার একটি চিঠি আছে এই রকম।

আরণ্যক
২১.৬.৬৭
ব্যারাকপুর

সবিনয় নিবেদন,

ঋত্বিকভাই, আপনার চিঠি আমি পেয়েছি। সেই সুন্দর চিঠির জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আরণ্যক আপনার হাতে উঠেছে এ আমার এবং আমার ছেলের অনেক কামনার জিনিস। অর্থ দিয়ে সত্যি এর পরিমাপ হয় না।—কিন্তু তবুও প্রয়োজনের তাগিদে আপনাকে ব্যস্ত করতে হচ্ছে বলে আমি ভীষণ লজ্জিত হয়েও আপনার কাছে আবার লোক পাঠালাম।

আমার বাবা ভীষণ অসুস্থ।...

আপনার শরীর কেমন আছে? আপনার স্ত্রী? ছেলেমেয়েরা ভাল আছে তো? এখানে *সুবর্ণরেখা* হল কাল চ্যারিটি শো। আমাদের বাড়ীর সবাই খুব উৎসাহ করে গেল দেখতে। বাবুলকে জানেনতো, আপনার মুগ্ধভক্ত। প্রীতি এবং শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন।

ইতি
আপনার দিদি
রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

শরীরটা ভালো ছিল না এই সময়। রাধেশ্যামের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে গেল। আমাদের দুর্ভাগ্য, 'আরণ্যক' হল না।... চেষ্টা চলছিল 'রঙের গোলাম' ছবিটি করবার। একদিন দুটি গান টেকিং করার সময় হঠাৎ ল্যাবরেটরিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ক'দিন খুব অসুস্থতা চলল। ১৯৬৫ সাল থেকেই অনিয়মিত স্নানখাওয়া ও পরে হঠাৎ অজ্ঞান হওয়া আরম্ভ হয়। ভীষণ দুর্ভাবনায় দিন কেটেছে। ডাক্তারেরা ছাড়াও মহেন্দ্র ওই সময় খুব করেছে। বাবা শিলং থেকে অহোরাত্র স্বস্ত্যয়ন করে আশীর্বাদ পাঠান।...

আমি ইতিমধ্যে বুঝি যে যোগ্যতা না বাড়ালে চাকরি পাবার আশা নেই। ১৯৬৮ সালে বিহারীলাল কলেজে ভরতি হই। তিনটি ছেলেমেয়েকে রোজ স্কুলে পাঠিয়ে ক্লাসে যেতাম ও পড়াশোনাও করতে হত। খুবই ব্যস্ত ছিলাম। ওরই মধ্যেই শুধু দেখতাম, বাইরের ঘরে অনেকে এসে লেখা নিয়ে যান। সে বছরেও অনেক লেখা হচ্ছিল। 'অভিনয়দর্পণ'-এর সম্পাদক হিসেবে সম্পাদকীয়গুলি ওই সময়েই লেখা।

১০

মনে পড়ে ছেলেকে প্রায়ই গল্প শোনাতেন। খুবই প্রিয় ছিল 'রাজকাহিনী' বইটি। রাজকাহিনীর—'আজু কি আনন্দ'—গানটির প্রয়োগ অবিস্মরণীয় হয়ে আছে 'সুবর্ণরেখা'য়।...এই 'রাজকাহিনী'র 'গায়েবগায়েবী'র গল্প ছেলেকে যে কত দিন কত বার বলা হয়েছে তার সীমা নেই। গল্পটি বলতে বলতে ও গল্পটি শুনতে শুনতে বাবার চোখ দিয়েও জল পড়ত, ছেলের চোখ দিয়েও জল পড়ত। সে এক দৃশ্য।...

যাঁর মনে এত স্নেহভালোবাসা ও দরদ, তিনি কেন জীবনের ওই আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেন না ভেবে পাই না।

... .

"আমার ছবি করলে কি ভঙ্গিতে এগোব।...এটা অবিশ্যি হবে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল ভাবনা।

কলকাতার বস্তি।

একটা হতকুচ্ছিত ঘর।

একটা মা, রুগ্‌ণ শিশুর পাশে। বাইরে থেকে একটা গলা। মা-টি উঠে কোণের এক পাত্র থেকে খানিকটা চোলাই মদ নিয়ে বাইরে গেল।

রুগ্‌ণ শিশুটি কেঁদে উঠল।

বাইরে একটা সদ্য-জ্বালানো উনুনের ধোঁয়া। মদের পাত্র মা একটি লোকের দিকে এগিয়ে দিলো।

বাচ্চার কান্না ছাপিয়ে পুলিশের হুইসিল বেজে উঠল। চারপাশ থেকে অনেকগুলো লোক দৌড়ে এসে ঘিরে ফেলল।

পুলিশের হুইসিল...বাচ্চার কান্না...

একটা রকেটের তীব্র স্বরে উঠে যাওয়ার শব্দ!

একটা মার্কিন বোমারু বিমান। শূন্যপথে মাঝখানে দু-ভাগ হয়ে গেছে। এক্ষুণি পড়বে। (অবশ্য স্থিরচিত্রে, কারণ ভিয়েতনামের সত্যিকারের যুদ্ধ আমার সব সময়ই স্থিরচিত্রে আনার ইচ্ছে আছে। তার সঙ্গে ছন্দে ছন্দে দোলায়িত করব জীবন্ত চলন্ত দেশের ছবি।)

এইভাবে আরম্ভ করে আমি দেখিয়ে যেতে চাই আমাদের দেশের সাধারণ দরিদ্রতম মানুষের নিরুপায় অপরাধ, সাধারণত যেগুলোকে চোখ এড়িয়ে গিয়ে আমরা খালি জনসাধারণের সংগ্রামী চেহারাটাকে কেতাদুরস্ত করে লোকের সামনে উপস্থিত করি। বাস্তবতার সমগ্র চেহারা তা আমি দেখাব—এই সেইসব তথাকথিত অপরাধ, তার নিম্নতম অভিব্যক্তিগুলো আমাদের সংগ্রামী জনতার কঠোর বাস্তব। দেখাবো তার কার্য-কারণ সম্পর্ক। ভিয়েতনামের ছবিগুলো তার সঙ্গে ব্যাখ্যা হিসেবে আসবে।

তারপরে চলে যাব একটি অধ্যায়ে, যেখানে পদদলিত মানুষের স্বপ্নকে আমি স্বপ্ন হিসেবেই দেখাব। সেই অধ্যায়টা হবে সম্পূর্ণ সঙ্গীতধর্মী এবং কিছুটা পরিমাণে নৃত্যধর্মীও বটে। সেখানে আমি শুধু বাস্তবতাবাদের কথাই রাখব না। এর সঙ্গে জ্যোতি হিসেবে আসবে ভিয়েতনাম এবং জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের বীর ছেলে মেয়েদের একটার পর একটা আক্রমণের দৃশ্য। যেন এই স্বপ্নগুলোকেই ওরা মূর্ত করে তুলতে বদ্ধপরিকর। এবং সমস্ত অধ্যায়টা আমি শেষ করব একটা সাঙ্গীতিক আনন্দ-উচ্ছ্বাসের দৃশ্য দিয়ে যেখানে হাজার হাজার কচি ছেলেমেয়েরা নাচবে। ওদের নাচ আর ট্রেঞ্চের ওপর দিয়ে মুক্তযোদ্ধাদের লাফিয়ে লাফিয়ে এগোনো একই ছন্দে বাঁধা হবে।

এবার আসছি শেষ অধ্যায়ে। এখানে আমি জোর দেবো জনতার সংগ্রামী রূপকে তুলে ধরতে। হো-চি-মিনের কবিতার অনুবাদ উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারিত হতে থাকবে, আর আমাদের চোখের সামনে দিয়ে সংগ্রামী মেহনতী মানুষের উচ্ছল কর্মকাণ্ডের দৃশ্যাবলী বয়ে যাবে। এই উচ্ছলতা আগের অধ্যায়ের স্বপ্ন সম্ভব করার উচ্ছলতা। এইখানে আমি সেই

প্রাণস্পন্দনকে ধরতে চেষ্টা করব, যা কিনা শোষকদের কাছে রহস্য। সেই যে জীবনীশক্তি, যা মাটিতে শেকড় গেড়ে রস আহরণ করে, সেই যে জীবনীশক্তি, যা কঠিন ইস্পাত আর গায়ের ঘামে জন্মগ্রহণ করে, সেই যে জীবনীশক্তি, যা কিনা ধ্যানের গভীরতায় বিরাজ করে—যেখানে রয়েছে প্রগাঢ় শান্তি—আমি চাইব তাকে ছবিতে মূর্ত করতে।—

জানি না ব্যাপারটা ধরতে পারব কিনা, তবু চেষ্টা করব।

আমার ছবি শেষ করব এইভাবে।

একটি গুলিবিদ্ধ তরুণ ছেলে। সে ছাত্র হতে পারে, কৃষক হতে পারে। তার আর্তনাদমিশ্রিত উল্লাসের চীৎকার ভেসে আসবে, আর ছেলেটি আছড়ে পড়বে জমির উপরে। মরণের মুখেও সে দুই হাত দিয়ে জমিকে আঁকড়ে আঁকড়ে ধরবে। হাত দুটো পেরিয়ে আমার ক্যামেরা চলে যাবে ওর চাপ চাপ রক্তের ওপরে—ধরণী যা শুষে নিচ্ছে।—

ওইখানে জন্মাচ্ছে আর একটা ভিয়েতনাম। যে ভিয়েতনাম অমর।"*

এই ছিল ওঁর ভিয়েতনাম নিয়ে ছবি করবার পরিকল্পনা।

এই লেখাটিরই ভূমিকায় লেখা ছিল:

'ভিয়েতনাম সম্পর্কে কোনো ছবি করার কথা ভাবা বর্তমান পৃথিবীতে যে-কোন চলচ্চিত্রকারের পক্ষে চরম দুরূহ ও পরম পবিত্র একটি চিন্তা।...কোথায় যেন কিভাবে একটা আভাস পেয়ে গেছি যে, ঘটনাটা ইতিহাসের একটা পাতা ওল্টানোর ঘটনা।...ভিয়েতনাম পৃথিবীটাকে একটা মোড় ঘুরিয়ে দেবে।... ভিয়েতনামের লড়াই এখানকারও লড়াই।...আজকের জগতে যেখানে যত কিছু শোষণ, ভিয়েতনাম তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক।'

'শিল্প, ছবি ও ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধে আছে :

'লড়াইয়ের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যোদ্ধা কাউকে ক্ষমা করে না। এখানেই তবে প্রশ্ন তুলছি: শিল্পী কমিটেড কিনা, শিল্পী কোথাও বাঁধা আছে কিনা?

---

* 'ভিয়েতনাম নিয়ে যে ছবি করতে চাই'। পশ্চিমবঙ্গ যুব-উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকপত্র, ১৯৬৮।

কমিটমেন্ট কথাটার মানে কি? নিজেকে কোথাও সংলগ্ন করে রাখা।...শিল্পীর জীবনেও তাই। তাকে কোথাও না কোথাও লাগতে হবে।...

যদি না পারেন, তবে বাইরের একটা বস্তু খুঁজতেই হবে, সেটা কি?

মানুষ।

শিশু।

জীবন মৃত্যুকে অস্বীকার করে। সকল শিল্পকে তাই হতে হবে জীবন অনুগামী।

জন্মই জীবন।

শিল্পজন্ম।

এই কথাটা আমরা কখনো ভুলে না যাই। যতো, ক্লেদাক্ত, বিষাক্ত অভিশাপের ভেতর দিয়ে আমাদের বেরতে হবে, হবে। শিল্প আমাদের এই দায়িত্ব দিয়েছে।'*

---

* 'শিল্পী, ছবি ও ভবিষ্যৎ', আনন্দবাজার পত্রিকা, সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা।

১৯৬৮ সাল শেষ হয়ে এল। আমার টেস্ট পরীক্ষা দেবার পর সেদিন কলেজের শেষ ক্লাস। আমার ছেলেটির জন্মদিন। পাঁচ বছর পূর্ণ হবে। হঠাৎ দুটি ছেলে এসে বলে—'রাস্তায় ঋত্বিকবাবু অজ্ঞান হয়ে গেছেন। মুখের ভেতরে একটা টাকার নোট।'...

সেদিন কলেজে গিয়ে বন্ধুদের কাছে ভেঙে পড়েছিলাম। এরপর মাথায় অসহ্য যন্ত্রণার জন্য পড়াশোনা করতে পারতাম না। বন্ধুরা আসতেন, আলোচনা করতাম। এই ভাবেই পরীক্ষা কী ভাবে শেষ করেছি জানি না। মরণপণ চেষ্টা। শেষ আমাকে করতেই হবে।...পরীক্ষার শেষের দিন প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করে বলি 'মমতাদি। আমার একটি চাকরির খুব দরকার।'...

মনে পড়ছে এই সময় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঋত্বিক ঘটকের প্রথম চলচ্চিত্র উৎসব হয়েছিল। সেই সময় সুভেনিরে লেখা নেবার জন্য সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন এসেছিলেন। দেশভাগ সম্বন্ধে বলতে গিয়েই তখন তীব্রতম ভাষায় বলা হয়, স্বয়ং গান্ধীজিও দেশভাগ সমর্থন করেননি। ভাষাটা নিয়ে তখন অ্যাসেম্বলি ও পার্লামেন্টে আলোচনা ওঠে। এদিকে যাদবপুরে একটি সেমিনারে ঋত্বিক ঘটককে ডাকা হয় বক্তৃতা দেবার জন্য। সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছি ওই অ্যালকোহলিক অবস্থায় অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে গান্ধীজি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য বিস্তৃতভাবে বলেন। এইটাই আশ্চর্য, কিছু বলবার সময় বা লিখবার সময় অন্য মানুষ। এইখানেই মানুষটির বৈশিষ্ট্য।

১৯৬৯ সালে ওঁকে মেন্টাল হসপিটালে ভরতি করা হল। কয়দিন নারায়ণ ও মহেন্দ্র আসতে পারেনি। তাই আমার বাড়িওয়ালার ছেলে বিবেককে নিয়ে হাসপাতালে যাই। কিছুদিন আগে থেকেই দাড়ি রাখতেন। জামাকাপড় আর চেহারার অবস্থা তখন শোচনীয়।

ডাক্তারবাবুর সামনে বসে চশমাটি কপালে তুলে: আপনি কোনটা follow করেন? ইয়ুং না এডলার? পাভলভ না ফ্রয়েড?'

ডাক্তারবাবু ধীরকণ্ঠে বলেন, 'আমি কিছুই করি না।'

'না, একটা কিছু তো করেন।'

'আমি লন্ডন স্কুল ফলো করি। ইংল্যান্ডে দশবছর কনসাল্টেণ্ট সাইকিয়াট্রিস্ট ছিলাম।'

'ডাক্তারবাবু! আমার একলাখ টাকার একটা কাজ পড়ে আছে। আমি কাজটা শেষ করে চারটার মধ্যে ফিরব। এক ফোঁটা ড্রিঙ্ক করব না, সত্যি বলছি স্যার।'

ধীরকণ্ঠে উত্তর—

'একলাখ টাকা কেন? অনেক লাখ টাকা রোজগার করতে পারবেন, আমি আপনাকে নিয়ে যাব''

'স্যার! একটু আমাকে খেতে দিতেই হবে।'

'এক ফোঁটাও না। শরীর খারাপ বোধ করলে দায়িত্ব আমার।'

আমার ও বিবেকের অবস্থা অবর্ণনীয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডাক্তারবাবু ওঁকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বন্ধ করেন। ভেতরে কারুর যাবার হুকুম নেই।

'এক সপ্তাহ পরে আসবেন' বলে ডাক্তারবাবু চলে যান।

এক সপ্তাহ পরে নারায়ণকে নিয়ে যাই। গেট থেকে ভেতর পর্যন্ত একটি কথাই সবার মুখে শুনি, দেখা হবে না। ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টারে গিয়ে অনুমতি নিয়ে আসি। চেহারা দেখে চমকে উঠি। দাড়ি নেই, চুল নেই, এত দুর্বল। শুনলাম সকালে একবার, দুপুরে একবার ও রাত্রে একবার ৮ সি.সি. করে ইনজেকশন চলছে

আর একমাস পরে চেহারা দেখে আবার চমকে উঠি। পরিষ্কার জামাকাপড় পরা, অপূর্ব চেহারা। হাসিমুখ।

ডাক্তারবাবু আমাকে রিপোর্ট লিখে দিতে বলেছেন। কিন্তু আমার মাথার যন্ত্রণার জন্য লেখাপড়া করতে পারতাম না। সুতরাং কী করে লিখব?

ডাক্তারবাবু বলেন, 'আমি আপনাকে ওষুধ দেব। খাবেন? আমি বলি, 'নিশ্চয়ই খাব।'

ডাক্তারবাবু আমাকে হাসপাতালের আউটডোরে রোগী করে নেন।

ওষুধ খেয়ে দিনরাত্রি ঘুমিয়ে পড়তাম। চোখ খুলতে পারতাম না। তিনটি ছেলেমেয়েকে কোনও রকমে স্কুলে পাঠিয়েই আবার ঘুমিয়ে পড়তাম। বুড়ি ঝি এসে ডাকলে ঘুম ভাঙত।

সাতটি মাস তিনটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে একা ওই বাড়িতে ছিলাম। কেউ কোনওদিন আসেননি, হাসপাতালেও না। নারায়ণ অফিস-ফেরত আসত, মহেন্দ্রও খোঁজ নিয়ে যেত।

বাবা শিলংয়ে জন্ডিসে অসুস্থ, ভাইটি অনেক দূরে মহীশূরে। সংসার চালাবার টাকা তাঁরা পাঠিয়ে দিতেন।

ডাক্তারবাবু যেখানে দরকার নিজে গাড়ি করে নিয়ে যান। রাইটার্স বিল্ডিং, ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, ক্রিকেট খেলা দেখবার জন্য রেডিয়ো অফিসের ছাদে, এইসব। বাড়িতেও নিয়ে আসতেন। ওই সময়ই 'সেই মেয়ে' নাটক ও 'কুমারসম্ভব'-এর 'অষ্টমসর্গ' লেখা হয়ে গেল।

একাও মাঝে মাঝে ছাড়তেন। কিন্তু বাড়িতে এলেই তো 'লক্ষ্মী, পয়সা দাও, ড্রিঙ্ক করব!'

ডাক্তারবাবুকে বলি, 'আমাকে আর অনুরোধ করবেন না। আমি চাকরি পেলে ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে যাব।' ডাক্তারবাবু প্রথমে বলেন, 'কিন্তু ঋত্বিকবাবুর দেখাশুনা কে করবে?'

'ঋত্বিকবাবু মদটা একটু কমালেই সুস্থ হয়ে কাজ করতে পারবেন। কিন্তু আমার অবস্থা ভেবে দেখুন। আপনি কেন আমার চিকিৎসা করছেন?'

ডাক্তারবাবু তখন বলেন, 'আপনার মধ্যে আপনার মা, দিদিমার রক্ত ও ঐতিহ্য আছে, তাই আপনি পেরেছেন ও করেছেন, যে-কোনও বিদেশি মহিলা হলে অনেক আগে চলে যেতেন।'

মনে পড়ে '৬৫ সালে হাসপাতাল থেকে বেরোবার পর একদিন অজিত লাহিড়ী আমার ভাইকে বলেন, 'আসুন ক্ষীরুবাবু! সংসারটা আমরা তুলে দিই।'

অজিত লাহিড়ী আমাদের বিশেষ বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী। তবু কথাটা শুনে আমি চমকে উঠি। আমি তখন পর্যন্ত ভাবতাম আমি থেকেই এই অবস্থা, সুতরাং আমি চলে গেলে মানুষটির কী হবে? সুতরাং কোনও রকমে যদি সংসারটা রক্ষা করা যায়। আমি এই চেষ্টাই করেছি। তারপর ধীরে ধীরে আমার মনকে প্রস্তুত করতে হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি কোনও মহিলাই একদিনে কোনও সিদ্ধান্ত নেন না। বহু চেষ্টা বহু প্রতীক্ষা বহু অপেক্ষা করার পরই বোধহয় একটি সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন।...

তাই আমাকেও ধীরে ধীরে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। একজন সম্পূর্ণ অ্যালকোহলিক ও অসুস্থ মানুষের ওপর নির্ভর করে সংসার ছেলেমেয়ে রক্ষা করা যায় না। তাই শেষপর্যন্ত একটি চাকরি পেয়ে জীবনের একটি অধ্যায়ে যবনিকা ফেলে আমি চলে যাই।

পয়লা জানুয়ারির উৎসবমুখর কলকাতাকে ও আমার সংসারটিকে চিরজীবনের জন্য পেছনে ফেলে যখন স্টেশনে এসে ট্রেনে উঠি ও ট্রেন ছাড়ার সময় হয়, তখন চোখে জল এসে যায়। নারায়ণ বলে, 'বউদি, তোমার ভালো হবে।' মহেন্দ্র বলে, 'বউদি! আপনাকে আমি শান্তিনিকেতনে বাড়ি করে দেব।' তপন আমার সঙ্গে ছিল।

আমি চলে আসবার আগে বাবা বড়দা ও সেজদাকে চিঠি লিখেছিলেন। তা ছাড়া তাঁর সন্তানসম ঋত্বিককে বলেছিলেন, 'লক্ষ্মী চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছে। তুমি সুস্থ হও।'

'বাবা! আমার মদ খেয়েই জীবন কাটবে। লক্ষ্মী যাচ্ছে, খুব ভালো করছে।'

মাত্র বারো দিনের ছুটিতে বারো বছরের সংসার আমাকে তুলতে হয়েছে। বার বার জিজ্ঞেস করি, 'কোনও জিনিসের দরকার আছে নাকি?'

'শুধু বই ও রেকর্ডগুলো থাক।'

'বই ও রেকর্ডগুলো রেখে গেলেই বিক্রি করে মদ খাওয়া হবে। তাই ওগুলো দেব না। ছেলের জন্য যত্ন করে রাখব। বড় হয়ে পড়বে ও শুনবে।'

'তা হলে শুধু পাখাগুলো থাক।'

আমি রাজি হই। যদিও জানতাম, চলে গেলেই বিক্রি করে মদের বোতল আসবে।...

আসবার আগের দিন সারারাত আমি ও তপন বসে জিনিস গুছোচ্ছি। রাত বারোটায় পয়লা জানুয়ারির বাঁশি শুনতে পাই। আজও মনে পড়ে, প্রতি পয়লা জানুয়ারিই মনে পড়ে।

চলে আসার সময় কী আকুল দৃষ্টি!

তবু এসে ট্যাক্সিতে উঠি।

কী করব, আমি মা! তিনটি ছেলেমেয়েকে তো আমাকে রক্ষা করতেই হবে।

আর সাত দিন পরেই বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। বাবার মন বেদনায় ভারাক্রান্ত। বাবা দীর্ঘ কর্মময় জীবনের পর লেখাপড়া নিয়েই ব্যাপৃত থেকেছেন। বই ছাপা হয়েছে। এই সময় 'সাহিত্যে ও সাংবাদিকতায় শ্রীহট্টের অবদান' ও 'শিলঙের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও তৎকালীন সমাজব্যবস্থা' বই দুটির জন্য তিনি ব্যস্ত ছিলেন।

ওই সাতদিন বাবা রোজ তাঁর সন্তানসম ঋত্বিককে দেখতে যেতেন। বাবার সম্বন্ধে অনেক দিনই বলতে শুনেছি, 'লক্ষ্মী! বাবা একজন God।'

বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার দিন ওপর থেকে মাসিমা তাঁদের ঋত্বিকবাবুর জন্যে লালগোলাপের তোড়া পাঠিয়েছিলেন। মনে পড়ে মাসিমা বলেছেন 'লক্ষ্মী! তোমার ও তোমার বাবার অনেক পুণ্যের ফলেই ঋত্বিকবাবু এখনও বেঁচে আছেন।'

ওই মৃত্যুপুরীর জীবন ওইখানেই শেষ হল।

(২)

সাঁইথিয়া শহরের নোংরা ও ধুলোর মধ্যে একটি ছোট্ট বাসা ভাড়া করে তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আছি। আমার বেতন খুবই সামান্য।

পাঁচ মাস পরেই এল এই চিঠি :

বোম্বে

৭.৫.৭১

লক্ষ্মী,

আজ পঁচিশে বৈশাখ। বেশ ক'বছর গেল যাক। এখানে ছবিটা নিয়ে বড়ই বিব্রত আছি। যত তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারব ভেবেছিলাম, হচ্ছে না। Colour Film নিয়ে প্রচুর ঝামেলায় পড়েছি। ২০।২২শে হয়তো শেষ হবে। তখন কিছু টাকা পাঠাতে পারব।

এ ছাড়াও অন্যান্য কিছু কাজের কথা চলছে। সেও আর এক-সপ্তাহের মধ্যেই বোঝা যাবে। এসব হলে এখানে একটা Flat নেব, একঘরের। হয়তো এমাসের শেষে দু'একদিনের জন্যে কলকাতা যাব, Film Finance Corporation-এর একটা প্রস্তাবের ব্যাপারে।

ও মাসের গোড়ায় যোধপুর যাচ্ছি, দিন দশেকের জন্যে, হলে একটা বড় ঘটনা হবে।

এখানের কাগজগুলোয় আমাকে নিয়ে খুব বড় বড় লেখা বেরোচ্ছে। বাংলাদেশের ওপর একটা বিরাট সভায় খুব জমানো গেছে।

টুনু-বুলু-বাবুকে ভালবাসা।

ঋত্বিক।

নয়াদিল্লী

২৭।৬।৭১

ভালোবাসি। টয়েনক্সকে, বাবুলকে, বাবুইকে।

বোধহয় তোমাকেও।

আসছি।

চার পাঁচদিন জ্বালাব। না, শান্তিনিকেতনে থাকব। একবার করে দেখে যাব।

তারপর রামপালান পালাব।

চিরকালের মত।

দেখি, পারি কিনা।

Incidentally, P. C. Joshi আজকে আমাকে জড়িয়ে আদর করে চুমু খেয়ে বলেছে Ritwik, you are the only People's artist in India.

আর কিছু চাই না।

ঘৃণা—ঋত্বিক।

বোম্বে
১৫।৭।৭১

ভালবাসা।

চিঠি পেয়ে প্রাণ ভরে গেল। এরকম গালাগালি আরো দিও। Separation is essential—খুব ভালো কথা। তবু মাঝে মাঝে দেখতে দিও।

আমার জীবন কেটে যাবে, যে করে হোক।

'আমার লেনিন'টা মস্কো Festival-এ গেছে। বোধহয় একটা Prize পাবে। 'দুর্বার গতি পদ্মা' Yugoslavia, GDR, Poland-এ বিক্রি হবার একটা ব্যবস্থা করে এসেছি দিল্লীতে।

বাংলাদেশের refugee-দের ওপরে একটা ছবি বোধহয় আরম্ভ করব। টাকাটা পাঠাতে দুদিন দেরী হবে। তবে এমাসেই পাবে।

বাবুর অসুখ কেমন? বাবুলাল কেমন আছে? টুনির খবর কি? আমি এখন বৌদির কাছে আছি।

আবার ভালবাসা—

বোম্বে
৩১ আগস্ট, ৭১

ঘটনা ঘটেছে। Film Finance Corporation প্রায় পাঁচ লাখ টাকা দেবে বলে ব্যবস্থা করেছে। আমার নতুন গল্প 'যুক্তি-তক্কো আর গপ্পো,' এটা করছি আগামী মাসের মাঝামাঝি থেকে।

তিন তারিখে সকালের Flight-এ কলকাতা আসছি। চার তারিখ কয়েক ঘণ্টার জন্য তোমার কাছে যাব। শক্তি সামন্তর জন্যে 'মেঘে ঢাকা তারা' হিন্দী একটা বানাচ্ছি। ওটা নভেম্বরে আরম্ভ করব।

বৌদির জন্যে একটা হিন্দী ছবি করব। গল্পটা ভাবছি। এটাও ডিসেম্বর নাগাদ চালু করব। রাজেশ খান্না আর শর্মিলা ঠাকুরকে নিয়ে।

বান্দ্রায় একটা ছোটো বাড়ী নিয়েছি। এখন বোম্বাইতে বেশ কিছুদিন থাকতে হবে মনে হচ্ছে। 'মরিসাস'-এ একটা ছবি করার জন্য যেতে হবে। আমি আগামী ফ্রেব্রুয়ারিতে যাব বলেছি। একবছর থাকতে হবে। কিছু পয়সা নিয়ে যেতে পারব বলে মনে হয়।

বাকী সাক্ষাতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর আমার এক ভাগনিকে নিয়ে সাঁইথিয়া আসেন। আমার ননদ ভবী (প্রতীতি) ওর ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকে ঢাকা কুমিল্লায়। ওরই মেয়ে ছিল সঙ্গে। মুক্তিযুদ্ধের ওপরে তোলা ছবিটি আমি দেখিনি।

আমার সমস্ত কাগজপত্র ও চিঠিপত্র রেখে দেওয়া অভ্যেস। তাই ওই সময়ের চিঠিগুলোও রেখে দিয়েছিলাম। চিঠির মধ্যে যে বউদির উল্লেখ আছে, সেই বউদি হলেন শ্রদ্ধেয় মনোবীণা রায়। বিমল রায়ের স্ত্রী। বউদি তাঁর দেওরকে খুবই স্নেহ করতেন। 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' লেখার সময় তাঁর বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। খুব আদর-যত্ন করতেন। গল্পটির স্ক্রিপ্ট ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনে জমা দেবার সময় যে-টাকা জমা দিতে হয়, সেই টাকাও দেওরকে দিয়েছিলেন।

এর পরেই স্ক্রিপ্টটি আমাকে সাঁইথিয়া এসে শোনালেন একদিন। টাকা পকেটে থাকলেই নবাব বাহাদুর। কলকাতা থেকে সাঁইথিয়া গাড়ি করে আসা হয়েছিল। সঙ্গে ছিল শুভেন্দু। আর শাড়ি ও জামাকাপড়।

সাঁইথিয়া এসে খুব মদ খেলে যদি আমি কিছু বলতাম, শুনতে হত 'লক্ষ্মী। তুমি আমাকে divorce করবে? আমি তা হলে তোমার বারান্দায় এসে শুয়ে থাকব।" ফলে আমি সব সময়ই চুপচাপ থাকা শ্রেয় মনে করেছি। মনে পড়ে সাঁইথিয়া এসে দু'-একদিন থাকলে 'সঞ্চয়িতা' পড়তেন। আশেপাশে সহ-শিক্ষয়িত্রীদের মেয়েরা এসে জ্যাঠাকে ঘিরে থাকত। 'ছেলেটা' কবিতা খুব প্রিয় ছিল ওঁর। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, যে-কোনও নাটক বা

স্ক্রিপ্ট পড়ার সময় অভ্যেস ছিল প্রতিটি চরিত্রের অভিনয় করে পড়া। কোনও ক্লান্তি ছিল না পড়ায়।

(৩)

এর পরে একটা চিঠি পাই শান্তিনিকেতনে যাবার জন্য। ওখানে ঢাকা থেকে হাবিবুর রহমানকে নিয়ে আসেন। 'তিতাস একটি নদীর নাম' বইটি ছবি করার জন্য স্ক্রিপ্ট্ আকারে লেখা হয়েছে।

হাবিবুর রহমান বলেন, 'একটা চেষ্টা করব।' কিছু টাকাও দেন।

আমি বলি, 'আমি দূর থেকেও আপনার সঙ্গে আছি। কারণ কাজ করলে আমার চাইতে বেশি খুশি কেউ হবে না। অন্য কোনও কিছু আমি আর এখন ভাবি না। শুধু একটি ইচ্ছার কেন্দ্রবিন্দুতে আমার সমস্ত চিন্তা আচ্ছন্ন ও পরিব্যাপ্ত।'

'তিতাস একটি নদীর নাম' আগে পড়েছিলাম। একটি উপন্যাস লিখেই অদ্বৈত মল্লবর্মন মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু একটি বইয়ের জন্যই তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। অদ্বৈত মল্লবর্মণ জাতিতে মালো। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিতাসের পারের জেলেদের নিয়ে লিখেছেন বিখ্যাত উপন্যাসটি।

সুতরাং তিতাস স্ক্রিপ্টটি ছবি করার কথা শুনে খুবই খুশি হয়েছিলাম। স্ক্রিপ্টটি শুনে মুগ্ধ হই। আগেই লিখেছি কোনও কিছু পড়তে কোনও ক্লান্তি নেই। আর চরিত্রানুযায়ী অভিনয় করতে করতে পড়া। বিরাট পটভূমিকায় উপন্যাসটি লেখা। এপিক ধরনের।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে ছবিটির শুটিং আরম্ভ হয়। আর্টিস্টদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শুনেছি রোজির কথা।

একবার বাংলাদেশ থেকে গাড়ি করে বহরমপুর হয়ে সাঁইথিয়া এসেছিলেন। প্রডিউসার ও সেবক গাড়ি চালিয়ে এসেছিল।

এদিকে কলকাতায় এসে 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'রও শুটিং চলে। নানা রকম অসুবিধার মধ্যে নিজে অনেক কিছুরই ব্যবস্থা করে, অসুস্থ অবস্থায় কাজ করতে হয়।

মনে পড়ে একদিন বাইরে রাত্রিতে শুটিং হয়েছিল। তপতীদির কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে রাত্রিতে শুটিংয়ের জন্য নিজেই লাইটের বন্দোবস্ত করেন। প্রায় সারা রাত শুটিং চলে।

গলায় টিউমার নিয়ে দেবব্রত বিশ্বাসের গাওয়া গান লিপ দিতে দেখে স্তম্ভিত হই। এরপরে টিউমারটি ফাটে। সেই অবস্থাতেই শিলং গিয়ে চুলে কলপ লাগিয়ে রোম্যান্টিক দৃশ্যটি নেওয়া হয়।

কলকাতার কাজ শেষ হল। বীরভূমের শুটিংটা তখনও বাকি। কিন্তু তক্ষুনি সবাই সহযোগিতা না করায় শুটিংটা শেষ করা সম্ভব হয়নি। রামপুরহাটের দিকে কিছু কাজ হয়। সেখানে দু'দিন সারা রাত শুটিং চলে। পরদিন নকশাল ছেলেদের সঙ্গে ফায়ারিং-য়ের দৃশ্যটি তোলা হয়। যে-ছেলেটি মেসিনগান চালাতে চালাতে মারা যায় সে বাংলাদেশের ছেলে। নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকায় অভিনয় বাস্তব ও স্বাভাবিক হয়েছে।

আমি সাঁইথিয়া আসি। তার পরেই ঢাকা থেকে অজ্ঞান হবার চিঠি পাই।...এরপরে সাঁইথিয়া ঘুরে যাবার পর একটা চিঠি।

ঢাকা

১১.১.৭৩

গতকাল বিকেলে শুটিং শেষ করে ফিরেছি। কাজ প্রায় শেষের দিকে। তবু Editing ইত্যাদি করে ফিরতে ফিরতে আরো একমাস অন্তত লাগবে। আর একেবারে সব সমাপ্ত করে ফিরতে চাই, কারণ এখানে election মার্চের গোড়ায়। যত ঐ সময়টা এগোবে, ততই সাধারণভাবে কাজ করার অবকাশ কমতে থাকবে। বুঝতেই পারছো।

এখানে এসে খবর পেয়েছিলাম, কে যেন আমাকে বারবার Trunk-Call করার চেষ্টা করেছিল। মনে হয়েছিল, তোমরা। পীযুষকে phone করিয়ে, (অন্যের through দিয়ে) জানলাম, তোমরা ভালো আছ। যাই হোক, খবর জানিও।

আর একটি কাজ। তুমি অতি অবশ্য পত্রপাঠ তপনকে চিঠি লিখে রমেশকে যোগাযোগ করে Production-এর বর্তমান অবস্থা detail-এ

আমাকে লিখে জানাতে বোল। তপন যেন পীযূষের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানে, পীযূষ নিজের কাজে কত ব্যস্ত, মণিদি শাঁওলি angle-টার আর কিছু development হয়ে গেছে কিনা আর বাব্‌লি জাতীয়রা কী করছে এখন।

দেবু বড়ুয়ার সঙ্গে দেখা করে যেন জানে, টাকা Bank-এ পড়েছে কিনা। রমেশকে জিজ্ঞাসা করে, Editing আলমারিতে আমার Script-টা ঠিকমত আছে কিনা। প্রত্যেকটি কথা আমার এ চিঠি থেকে quote করে লিখো তপনকে। ও যেন সোজা আমায় লেখে, তোমাকেও লেখে।

তুমি কি ৫০০০ টাকা পেয়েছ দেবুর কাছ থেকে?

আমি বোধহয় ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে একমাস কাজ করে, যুক্তিতক্কো শেষ করতে পারব।

পরে আবার লিখব। খবর দিও। ভালবাসা—টুনু-বুলু-বাবুকে আদর।

বাংলাদেশ ও কলকাতায় দুটি ছবি একসঙ্গে করতে গিয়ে অসম্ভব চাপ ও ড্রিঙ্কের সুইংয়ে ভয়ানক অসুখ হল।

ঢাকা থেকে নিয়ে আসার পর হাসপাতালে বসে 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' কী ভাবে শেষ করা হবে, সব সময় এই কথাই বলতেন। কলকাতার তখনকার রাজনৈতিক পটভূমিকায় গল্পটি লেখা। ছবিটি শেষ করতে দেরি হলে ওই পটভূমিকা থাকবে না।

মেডিক্যাল কলেজে বসে এফ.এফ.সি.-কে একটা চিঠি লেখা হয়েছিল শিগ্‌গিরই একজন অফিসার পাঠিয়ে দিতে—একটা কালবৈশাখীর ঝড়ের দৃশ্য নেওয়া হবে। ওই ভয়ানক অসুস্থ অবস্থায় চিঠিটা লিখে পাঠাবার জন্য অস্থির। শেষ পর্যন্ত পাঠিয়েছিলাম।

টি.আর.এ চেস্ট হাসপাতালে বসেও ওই একই কথা। ছবিটি শেষ করতে দেরি হলে কী হবে? প্রায় আট মাস হাসপাতালে থাকার পর হঠাৎ রিস্ক বন্ড সই করে সাত দিনের জন্য বম্বে গিয়ে, কাজকর্ম শেষ করে পুণা গিয়ে ভয়ানক ড্রিঙ্ক করে আবার অজ্ঞান। টেলিগ্রাম ও ট্রাংক কল আসে।

হাসপাতালে আরও কিছুদিন থাকার কথা ছিল। চিকিৎসা শেষ হয়নি। কিন্তু তার আগেই বেরিয়ে আবার অসুস্থ। বার বার এই খবর ও অসুস্থতা

মানুষ কি নিয়ে বাঁচবে? দৈনন্দিন খাওয়া পরার ঊর্ধ্বে একটি অজানা অস্খলিত সৃষ্টির ছন্দ চলেছে, যে মানুষ জীবনে সেই ছন্দের সন্ধান পেয়েছে, সে পেয়েছে জীবনের অমৃতপাত্রের সন্ধান। প্রাণসংগ্রামের অমোঘ অস্ত্রগুলির সন্ধান। প্রাচীনকালে তাই মৈত্রেয়ীর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছিল যো বৈ ভূমা তৎ সুখং। নাল্পে সুখমস্তি। ভূমা কিনা বিরাট মরণহীন, ক্ষয়হীন বিরাট। এই ভূমার সাধনাই সবচেয়ে বড় সাধনা।

এখানে সাহিত্যের প্রয়োজন। সাহিত্য দেয় সেই লোকের ইঙ্গিত দৈনন্দিন প্রয়োজনের অতীতে দিগ্‌বলয়রেখার ওপারে যে লোক অস্পষ্ট। যে লোকের স্পষ্ট সন্ধান মেলে উপনিষদের কবিতায়, গীতার বাণীতে, রবীন্দ্রনাথের গানে। আমি আরণ্যক-এ মুক্তরূপা ধরিত্রীর যে চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেছি, 'দেবযান'-এর শেষের পাতায় যে নিদ্রিত দেবতার কথা বলেছি, এদেরও মূলে সেই একই কথা—অঙ্গুলি সংকেতে ভূমাকে দূর থেকে দেখানোর ক্ষীণ প্রচেষ্টা। ভগবানকে ভালবাসে, আমার মনে হয় ভূমার আস্বাদ সে সহজেই পায়।

তোমার বয়স অল্প। এ বয়সে বিলাসী হয়ে যেও না। ভূমার সাধনে মন দাও, সাহিত্যের মধ্যে তার ঠিকানা মিলবে। জীবনে শান্তি পাবে।

বিশ্বের দেবতাও মস্ত বড় একজন কবি, অনাদ্যন্ত মহাযুগ ধরে এই রকম কত শিলাস্তৃত ঝরনার তটে, অনন্ত নীহারিকা ছড়ানো আকাশের পটে, বনকুসুমের পাপড়ির দলে, বনবিহঙ্গ কাকলিতে, জাতির ও দেশের ও মহাদেশের অবনমনে ও পুনরুত্থানে তিনি আপনমনে তাঁর বিরাট কাব্য লিখেই চলেছেন। কিন্তু অতবড় মহাকাব্য পাঠ করবার মত শক্তিধর পাঠক কোথায়? দুএকটা সর্গের এক-আধ পঙ্‌ক্তি কেউ পড়ে, কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। গীতায় বলেছে, শ্রুত্বাপোনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ। "শ্রবণ করিয়াও ইহা অনেকে বুঝিতে পারে না।" দুএক সর্গ যাঁরা বোঝেন, তাঁরাই গেটে, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, শেলি হন।

আশা করি লক্ষ্মীমা তুমি এই কাব্য পড়বার চেষ্টা করবে। সাধনা চাই এ জন্যে খাটুনি আছে। শাস্ত্রে বলে, ন পচ্ছতি বিনা পারং ব্যাধিরৌষধ শব্দতঃ বিনাহপরোক্ষনুভবং ব্রহ্ম শব্দৈন মুচ্যতে।

"ঔষধ ঔষধ" বলিয়া চীৎকার করিলে রোগ সারে না যেমন, তেমনি অপরোক্ষানুভব (realisation) ব্যতিরেকে ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলিয়া চীৎকার করিলেই কাজ হইবে না। অল্পবয়স থেকেই এর জন্যে চেষ্টা কর। জীবনে অমৃতত্বকে লাভ করতে পারো।

আশীর্বাদ নাও।...

আর একটি চিঠি:

...দেশে ফিরে এসেছি, ঘেঁটুফুল আর নেই, পানকলম শেওলার সুগন্ধি কুচো কুচো সাদা ফুল ফুটেছে নদীজলে আর শিরীষ ফুল ফুটেছে আমাদের আমবাগানের পেছনে—নক্ষত্রমালা ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর পুঞ্জে পুঞ্জে নব নবরূপে যিনি বিদ্যমান, তিনিই কখনো ঘেঁটুফুলের শুভ্রদলে, কখনো কুঁচকাঁটার সোনালিফুলে আমাদের ঘরের পেছনে এসে ধরা দেন, নিতে পারলেই হোল।

তমেব ভান্ত মনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতিঃ।

তিনি আছেন, তাই সব কিছুই আছে। তাঁর আলোতেই জগৎ আলো।

লক্ষ্মী, সেই দৃষ্টিকে লাভ করবার চেষ্টা কর, যে দৃষ্টি অমৃতত্বকে মর্ত্যে বহন করে আনে। আর সব দুদিনের। আমার মনে হয় তার অঙ্কুর তোমার মধ্যে আছে। আশীর্বাদ করি সেই অঙ্কুর মহীরুহে পরিণত হয়ে তোমার জীবনকে ফুলেফলে সার্থক করে তুলুক।

এই চিঠি ওই বয়সে আমাকে অভিভূত করেছিল। তখন জীবন ছিল সুন্দর। সামনে ছিল অনেক স্বপ্ন, আশা ও ভবিষ্যৎ। অনেক পড়াশোনা করব, একটা কিছু করব ইত্যাদি। তা ছাড়া আমি প্রকৃতিপ্রেমিকও ছিলাম।

তাই বিভূতিভূষণের রচনা ও চিঠি আমার জীবনে ছিল অমূল্য সম্পদ।

...তারপর বহু বছর পেরিয়ে এসেছি। কিন্তু ওই স্বপ্ন, আশা ও ভবিষ্যৎ অনেক দূরে পেছনে ফেলে এসেছি। বাস্তব জীবনের রূঢ় আঘাতে সবকিছু ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সুবর্ণরেখার ছোট্ট সীতা কি জানত তার সামনে কী আসবে? কিন্তু এটাই সত্যি, এটাই বাস্তব।...

তাই আজ আছে শুধু জীবনে কিছু কঠিন কর্তব্য। ছোটবেলার শিলং, মামার বাড়ি ও দেশের বাড়ির কথা মনে পড়ে। আর মা'র কথা কখনওই ভুলতে পারি না। মা থাকলে জীবনটা হত অন্য রকম, আমার জীবনের সব সমস্যারই সমাধান হত।...

মনে পড়ে পার্টির কথা। কিন্তু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

আর যে মানুষটি অ্যালকোহল স্পর্শ করতেন না, তিনি সম্পূর্ণ অ্যালকোহলিক ও অসুস্থ এবং চির অসুস্থ হয়েছেন।

কিন্তু আমাকে জীবনে একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছোতেই হবে। আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি। আর একমাত্র বিশ্বাস করি সংগ্রামে। সংগ্রাম ছাড়া কোনও সমাধান নেই। সংগ্রামই জীবন। জীবনই সংগ্রাম।

আমি সাঁইথিয়ার নোংরা ও ধুলোর মধ্যে আছি। আমার কাছে এহো বাহ্য।

কলকাতায় ছুটির সময় ছেলেমেয়েদের নিয়ে গেলে মহেন্দ্র থাকবার ব্যবস্থা করে দেয়, আমার নিজস্ব কোনও জায়গা নেই। আমার কাছে এহো বাহ্য।

আমার একমাত্র স্বপ্ন, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, যাঁর মনন ও দার্শনিক গভীরতা দেখে আমি অভিভূত ও মুগ্ধ হয়েছিলাম, তিনি এই অসুস্থ অবস্থায়ও কী সৃষ্টি করছেন, কী কাজ করছেন।

আগেই লিখেছি, আমার জীবনের সার্থকতা এইখানেই।

(৪)

পুণা থেকে সাঁইথিয়া আসেন। এরপরে মহেন্দ্র নিজের কাছে রেখে সুস্থ করে। 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'র শুটিং শেষ হয়।

'৭৪ সালের গ্রীষ্মের ছুটির সময় গিয়ে আমি 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' ও 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবি দুটি দেখি।

'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর শুটিং একটানা অনেক দিন জলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে করতে হল। পরে ভয়ানক অসুখ

হয়। ১০৩ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে অসুস্থ অবস্থায় ছবিটি শেষ করলেন। ছবির শেষ দৃশ্য শুটিং করার দিন জ্বর নিয়ে লঞ্চে নদী পেরিয়ে তপ্ত বালুর চরের ওপর দিয়ে অনেক দূর হেঁটে গিয়ে বাসন্তী মারা যাবার শেষ দৃশ্য তোলা হল। তার পরেই অজ্ঞান। এরপর ঢাকার হাসপাতালে ভরতি করা হয়।

কলকাতায় এসে হাসপাতালে থাকতেই বাংলাদেশে ছবিটি দেখানো শুরু হল। হাবিবুর রহমান আমার সামনেই লিখিয়ে নিয়েছিলেন ছবিটির এডিটিং তাঁদের ঋত্বিকদার নির্দেশ অনুযায়ী শেষ করে ছবিটা রিলিজ করবেন।

অনেক চেষ্টা হয়েছে ছবিটি এদেশে আনবার জন্য। সফল হয়নি। এটা যে কী মর্মান্তিক এবং দুর্ভাগ্যজনক! আমাদের বাংলাদেশ ভাগ হয়ে গেছে। সুতরাং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানও আর সম্ভব নয়।

ঋত্বিক ঘটকের প্রতিটি ছবিতে তারই মর্মবেদনা উদঘাটিত। এবং তাঁর প্রিয় বাংলাদেশে মরণপণ করে শেষ করা ছবিটি এদেশের দর্শকরা দেখতে পেলেন না।

এ ট্রাজেডি ও পরিহাস কি কেউ সহ্য করতে পারে?

'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবিটির কথা ভাবলে আবার বিস্ময়ে মন স্তব্ধ হয়ে যায়। লালন ফকিরের গান দিয়ে ছবি শুরু হচ্ছে।...নদীর সীমাহীন জলরেখা দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে, সেই জলে মাঘমণ্ডল ব্রতের ভেলা ভাসিয়ে ছবির প্রথম দৃশ্যর আরম্ভ।

দোলের দিন অন্য গ্রামে ঘটনাক্রমে যে-মেয়েটির সঙ্গে কিশোরের মালাবদল হয়, তার আগে মেয়েদের নাচ ও গানের দৃশ্যটি অপূর্ব। নৌকো করে ফেরার সময় পালতোলা নৌকোর সারি ও বাঁশির সুর ভোলা যায় না। নৌকোয় ডাকাতি হয়, মেয়েটির মুখটাও ভালো করে দেখেনি, কিশোর পাগল হয়ে যায়। এই দৃশ্যও মর্মস্পর্শী।

দশ বছর পরে অনন্তর মা অনন্তকে নিয়ে ফেরে কিশোরের গ্রামে।...আর এক দোলের দিনে কিশোরের পূর্বস্মৃতি ফিরে আসে। অনন্তরমাকে 'বউ' বলে চেনার মুহূর্তেই মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। অনন্তের মা'রও শেষ নিশ্বাস পড়ে তিতাসের জলে। কবরী চৌধুরীর অভিনয় খুবই সহজ সুন্দর। বহু মেয়েকে দিয়েই এই ছবিতে অভিনয় করানো হয়েছে। আর সংলাপ সবই পূর্ব বাংলার।

ঋত্বিক ঘটক মনে প্রাণে বাঙালি : কথাটি বহু বার শুনেছি। এই ছবির ভাষা, সংগীত, দৃশ্য ওই মরমিয়া বাংলাদেশের। যা এদেশে খুঁজে পাওয়া যায় না, যা মর্মান্তিকভাবে হারিয়ে গেছে। পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি ও প্রকৃতিকে উজাড় করে দেখানো হয়েছে ওই ছবিতে। বাংলাদেশের মানুষটির শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি ওই দেশের প্রতি, সংস্কৃতির প্রতি। এ এক মহাকাব্য।

প্রতিটি ছবিতেই প্রতিটি শট্ নিজে কম্পোজ করেন, প্রতিটি অভিনেতা অভিনেত্রীকে সমস্ত অভিনয় বার বার করে দেখিয়ে দেন। সুতরাং কিছুটা অনুমান করতে পারি, কী পরিশ্রমই না এ ছবিতে করা হয়েছে।

ছবির দ্বিতীয় ভাগের আগে অনন্ত চলে যায় নয়নতারার সঙ্গে। এরপরে বাসন্তীই প্রধান চরিত্র। বাসন্তীর ভূমিকায় রোজি সামাদের অভিনয় অতুলনীয়।

দ্বিতীয় ভাগে তিতাসের জল শুকিয়ে যাচ্ছে, চর দেখা দিয়েছে। সুতরাং এই জেলে সম্প্রদায়ের জীবন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু উপন্যাসটি যেভাবে শেষ হয়েছে ছবিটি সেভাবে শেষ হয়নি। নতুন জীবনের ইঙ্গিতে ছবি শেষ হয়েছে—যেমন শেষ হয়েছিল 'সুবর্ণরেখা' ও 'অযান্ত্রিক'।

'সভ্যতার মৃত্যু নেই, সভ্যতা পরিবর্তিত হয় কিন্তু সভ্যতা চিরদিনের। সেখানে তিতাসে ধানের ক্ষেত জন্মেছে, সেখানে আর-একটা সভ্যতার আরম্ভ। সভ্যতার মৃত্যু নেই। মানুষ অমর, individual মানুষ মরণশীল, কিন্তু মানুষ অমর। সে একটা থেকে আর-একটা ধাপে গিয়ে পৌঁছয় সেই কথাটিই আমি ছবিতে বলার চেষ্টা করেছি। I cannot end in a pessimistic mood, সেটা তাহলে মিথ্যা বলা হবে।'*

ছবির শেষ দৃশ্যে বাসন্তী মারা যাবার আগে তিতাসের চরে বালি খুঁড়ে ঘটিতে জল তুলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু অত কষ্টে তোলা জলটুকু পড়ে যায়। কানে আসে বাঁশির শব্দ—একটা ছোট্ট ছেলে সবুজ ধানের খেতে বাঁশি বাজাতে বাজাতে দৌড়োচ্ছে ও হাসছে।

'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবি করা সম্বন্ধে নিজের উক্তি :

---

* 'চিত্রবীক্ষণে'র প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

"বাংলা দেশ বলতে আমার যা ধারণ ছিল, ঐ দুই বাংলা মিলিয়ে সেটা যে তিরিশ বছরের পুরোনো সেটা আমি জানতাম না। আমার কৈশোর এবং প্রথম যৌবন পূর্ব বাঙলায় কেটেছে। সেই জীবন, সেই স্মৃতি, সেই nostalgia আমাকে উন্মাদের মত টেনে নিয়ে যায় তিতাসে, তিতাস নিয়ে ছবি করতে।—তিতাস উপন্যাসের সেই periodটা হচ্ছে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগেকার, যা আমার চেনা, ভীষণভাবে চেনা। তিতাস উপন্যাসের অন্য সব মহত্ব ছেড়ে দিয়েও এই ব্যাপারটা আমাকে প্রচণ্ডভাবে টেনেছে। ফলে তিতাস একটা শ্রদ্ধাঞ্জলি গোছের সেই ফেলে আসা জীবনস্মৃতির উদ্দেশ্যে। এ ছবিতে কোন রাজনীতির কচকচি নেই, উপন্যাসটা আমার নিজের ধারণায় এপিকধর্মী। এ ছবিতে আমি প্রথম এই ঢঙটা ধরবার চেষ্টা করেছি। আমার শৈশবের সঙ্গে তিতাসের বহু ঘটনা জড়িয়ে আছে, অনেক কিছু আমি নিজের চোখে দেখেছি, ঐ যে বললাম এই তিরিশ বছর মাঝখানে blank. আমি যেন সেই তিরিশ বছর আগেকার পূর্ব বাংলায় ফিরে যাচ্ছি।

একুশে ফেব্রুয়ারি ওরা আমাকে, সত্যজিৎবাবুকে এবং আরো কয়েকজনকে state guest করে নিয়ে গিয়েছিল ঢাকায়। প্লেনে করে যাচ্ছিলাম, পাশে সত্যজিৎবাবু বসে, যখন পদ্মা cross করছি, তখন আমি হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললাম। সে বাংলাদেশ আপনারা দেখেননি, সেই প্রাচুর্যময় জীবন, সেই সুন্দর জীবন...আমি যেন সেই জীবনের পথে চলে গেছি, সেই জীবনের মাঝখানে...এখনো যেন সব সেরকম আছে, ঘড়ির কাঁটা যেন এর মাঝে আর চলেনি। এই বোকামি নিয়ে, এই শিশুসুলভ মন নিয়ে তিতাস আরম্ভ।

ছবি করতে করতে বুঝলাম সেই অতীতের ছিটেফোঁটা আজ আর নেই, থাকতে পারে না। ইতিহাস ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর, ও হয় না, কিস্‌সু নেই, সব হারিয়ে গেছে। এ ছবির Script লেখা থেকে শুটিংয়ের অর্ধেক পর্যন্ত আমি মানুষের সংস্পর্শে প্রায় আসিনি। এখান থেকে ঢাকায় touch করে চলে যেতাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নইলে কুমিল্লা, নইলে আরিচাঘাট, পাবনা, নারায়ণগঞ্জ, বৈদ্যরবাজার এইসব, মানে গ্রামে গঞ্জে, ছবিটা তো গ্রাম-গঞ্জ-

নদী নিয়েই। কাজেই সমস্ত সময়েই গ্রামে থেকেছি...কাজেই ছবি করার first half পর্যন্ত এখনকার বাংলাদেশের যা চেহারা তার থেকে completely বিচ্ছিন্ন ছিলাম...তারপর ঢাকায় গিয়ে কয়দিন থাকতে হল, ছবির এটা ওটা সেটার জন্য। তখন ক্রমশ দেখলাম সমস্ত জিনিষটা ফুরিয়ে গেছে মানে একেবারেই গেছে, আর কোনদিন ফিরবে না, এটা খুবই দুঃখজনক আমার কাছে, কিন্তু দুঃখ পেলে কি হবে, ছেলে মারা গেলে লোকে শোক করে কিন্তু it is inevitable.

মানুষের চিন্তাধারা পালটে গেছে, মানুষের মন গেছে পালটে। টাকাকড়ির সমস্যা, খাওয়াদাওয়ার সমস্যা, দারিদ্র্য ওখানেও আছে।...কিন্তু সমস্যাটা একই, মানুষের সাংস্কৃতিক মন পচে গেছে, অবশ্য আশার কথা কিছু young ছেলে সবে Universityতে ঢুকেছে, বেরিয়েছে বা বেরোচ্ছে, এমন সব ছেলে তাদের মধ্যে প্রচণ্ড বোধ এবং অত্যন্ত সচেতনতা এসেছে। এরাই ভরসা, ওখানকার ভালো যা কিছু সবই এদের contribution।'

ঢাকা থেকে আসার পরে মুখেও অনেক কথা শুনেছিলাম। তিতাস আরম্ভ করার আগের মন তখন একেবারেই ছিল না।

এবারে সুস্থ হয়ে ছবিটি এডিটিং করে আসার পর, ইচ্ছে ছিল ছবিটি এদেশে এনে আবার রি-রেকর্ডিং করা হবে।

আমরা শুধু অপেক্ষা করছিলাম পরে এডিটিং করা ছবিটা কবে আসবে?

আসেনি। চেষ্টার ত্রুটি হয়নি।

৫

'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' রাজনৈতিক ছবি।

ছবির নাম হচ্ছে, 'যুক্তি তক্কো ও গপ্পো', 'Arguments and a story'। তোমাদের গল্প না হলে ভালো লাগে না, তাই একটা গপ্পো দিচ্ছি, আসলে এটা যুক্তি তর্ক, it is completely a political film...

ঐ সময় আমার জীবনে যা ঘটে গেছে, ঐ একাত্তরে, সেখান থেকেই

ছবির starting point. আর, ঐ মাতাল অবস্থায় একাত্তরের গোড়ার কলকাতার বুকে বসে কলকাতাটাকে খুব ওতপ্রোতভাবে দেখা গিয়েছিল।...তাই আমি সমাজের প্রতিটি স্তরকে কেটে দেখা এবং দেখানোর চেষ্টা করেছি, সমস্ত মানুষ কিভাবে react করেছিল সে-সময়, সালতামামি গোছের আর কি! Starting of Point, আরম্ভটা শুধু আমার জীবনের কিছু ঘটনা নিয়ে।...মোদ্দা কথা হচ্ছে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পটভূমি তখন যা ছিল, তা যেভাবে আঘাত করেছিল শহরের মানুষকে, শহরের মানুষ শুধু না, এ ছবিতে আমি গ্রামবাংলাতেও গেছি, তা বেশীর ভাগই আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা। এদিক থেকে এ ছবিকে কিছুটা ব্যক্তিগত, আত্মচরিতমূলক বলা যায়, তবে আত্মচরিতমূলক বলতে যা বোঝায়, এ ছবি সে ধরনের নয়। যা দেখেছি, যা বুঝেছি, যা পেরেছি ছবিতে তা বলার চেষ্টা করেছি। যুক্তি-তক্কো নিয়ে বেশী প্রশ্ন করবেন না। ছবি শেষ হোক, ছবি চলুক। তারপর তর্কাতর্কি করা যাবে।"*

দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয় ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে:

"...এটা আমার সম্পূর্ণ অভিপ্রেত ব্যাপার। কারণ আমি মনে করি যে আমাদের দেশের যে বিরাট Store house আছে, যে ভাণ্ডার আছে, myth, পুরাণ ইত্যাদি—তার মধ্যে যে wisdom আছে, যে জ্ঞান আছে, সেগুলো আজকালকার আমরা প্রায় ভুলে যাচ্ছি। আমরা সেগুলোকে আর পাত্তা দিই না অথচ তার মধ্যে প্রচুর সত্য আছে।...

আমাকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করে ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্য, তার মধ্যে ঋগ্বেদ থেকে আরম্ভ করে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, শ্রুতির সমস্ত অংশ, উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণ এবং মহাকাব্য। এগুলো নিয়ে পড়াশুনো করলে দেখা যায় যে আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিই বল আর যাই বল ঐ লোকজন যাঁরা ছিলেন তাঁরা human psychology কত গভীরভাবে অণুধাবন করেছিলেন।

...কাজেই সেটাকে টেনে বের করার একটা প্রয়োজন আছে—টেনে

---

* 'চিত্রবীক্ষণে'র প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার থেকে অংশবিশেষ '৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে নেওয়া।

বার করে সেটাকে আজকের জগতের সঙ্গে দাঁড় করাতে হবে...আর আমি যদি সোজাসুজি একটা বক্তব্য place করতে যাই তাহলে সেটা alien হয়ে যায়।...আমার দেশের সঙ্গে নাড়ীর যোগ রাখাটা ভীষণ প্রয়োজন—আমার দেশের মানুষকে তাতে অনেক তাড়াতাড়ি convince করা যায়, অনেক তাড়াতাড়ি জয় করা যায়—এগুলো রক্তের মধ্যে রয়েছে আমাদের।...

শুধু acceptable করানোই নয়। At the same time it contains a very big amount of truth, as far as human psychology is concerned...

Ideological baseটা basically fundamental Marxism. Marxism not in the sense of this party or that party. Marxism philosophically, psychologically—Marx, Engels, Lenin—এঁদের লেখার অনেক ছোঁয়া আছে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে—এ ছবিতেও আছে—যুক্তি-তক্কোতে অ্যান্টি ডুয়েরিংয়ের প্রচুর touch আছে, আলোচনা করলে আমি করতে প্রস্তুত। এটা completely philosophical লেখা। এই আমার basis...

আমি মনে করি, film-form or any other art-from primarily একটা make-belief। যারা ছবি দেখতে হলে ঢোকে তারা কেউই বাস্তব দেখতে যায় না। তারা সাধারণভাবে যায় entertained হতে। তা entertain করার চেষ্টা ফেষ্টা খানিকটা করা যেতে পারে। কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে আমি তাদের educate করতে চাই। এবং এটা করার জন্য আমাকে যদি lots of co-incidence use করতে হয় আমি তা করবো। লোকে জানে যে সে একটা 'গল্প' দেখছে, লোকে জানে এটা বাস্তব নয়।...Melodrama হচ্ছে একটা birthright। এটা একটা form...বক্তব্যকে প্রকাশ করার জন্য আমি যে কোনো form, সে lyric থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু ব্যবহার করতে প্রস্তুত।

আমার ছবিতে গানের ছড়াছড়ি থাকে। আমি করি এবং গান দিয়ে যদি আমার বক্তব্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তো ব্যবহার করবো। সোজাকথা আমার হাতে যা অস্ত্র আছে আমি তাই ব্যবহার করবো।

ইয়ুংয়ের তত্ত্ব যদি তোমরা পড়াশোনা করে থাকো, I hope you have read, তাহলে দেখবে ইয়ুংয়ের তত্ত্বের সঙ্গে মার্কসবাদের কোনো গণ্ডগোল নেই। মার্কস একটা জগৎ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন, ইয়ুং আর একটা জগৎ নিয়ে। দুটোর মধ্যে কোনো inner contradiction নেই। Collective unconscious মানুষের unconscious behaviour-কে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। আর entire class-structure conscious behaviour-কে determine করে। কিন্তু unconscious যেমন dream world. তুমি আমি স্বপ্ন দেখি, মার্কসবাদ দিয়ে তাকে analyse করে কি কোনো লাভ হবে? সেখানে ইয়ুং, *this is what I feel*। ইয়ুংয়ের সঙ্গে মার্কসের কোনো বিরোধ নেই, দুজনে দুই জগৎ নিয়ে কারবার করেছেন। দুটো প্রচণ্ডভাবে পরস্পরের পরিপূরক।

আমার ছবিতে ইয়ুংয়ের যে ব্যাপারটা প্রচণ্ডভাবে আসে সেটা হল ঐ mother complex। আমাকে আমার এক বন্ধু বলেছিল তোকে মায়ে খেয়েছে। আমার সমস্ত ছবিতে ঐ মা এসে পড়ে—তা মায়ে খেয়েছে কেন? এই যুক্তি গপ্পোর ছবির entire ছৌ নাচটার raison d'etre হচ্ছে মা—mother complex, এখানে ঐ মেয়েটাকে শাঁওলিকে তার সঙ্গে equate কর, জ্ঞানেশ বলছে নাচো, তোমরা নাচো, তোমরা না নাচলে কিছু হবে না। এটা সম্পূর্ণ ইয়ুংয়িয়ান, তিতাসে ছেলেটি স্বপ্ন দেখে মা-কে ভগবতীরূপে, এই mother complex একটা basic point।

...basic primordial force হচ্ছে mother-complex—মা—'

এবারে যুক্তি-তক্কো নিয়ে প্রশ্ন :

'কোন্‌টা সমাধান? সমাজ অত্যন্ত জটিল বস্তু। এর মধ্যে বহু ধারা-উপধারা প্রবাহিত। কোন্ ধারাকে ধরে কিভাবে এগোব এটাই প্রাথমিক প্রশ্ন। এখন এদেশের যা অবস্থা যে অব্যবস্থা সমস্তই হচ্ছে ঐ great betrayal—সেই সাতচল্লিশের তথাকথিত 'স্বাধীনতা'র result. এটা আমি ছবিতে বলেছি। এখন আমরা কিসের মধ্যে দিয়ে pass করছি—neo-colonialism, absolutely neo-colonialism, এটা আমি ছবিতে বলিনি, এ কথাগুলো বলতে গেলে আমার ছবি রাজনীতি হয়ে দাঁড়াত, ছবি হত না।...

বড় বড় বাতেলা করে সমাধান দেখিয়ে দেওয়া আমার কাজ নয়। আমার নিজের ধারণা এদেশে কেউ সেভাবে সমস্যাগুলোকে ধরার চেষ্টা করেনি। আমি যদি সেটা করতে পারি, লোকের সামনে ছুঁড়ে ফেলতে পারি যে এই হল তোমাদের সমস্যা, এখন ভাবো—What is to be done? তাহলেই যথেষ্ট। আমার মনে হয় এটাই আমার কাজ।

সমস্যাটা কোথায় everybody knows। সমাজের সেই উচ্চতম স্তর থেকে নিম্নতম পর্যন্ত আমি মিশি, আমি মিশেছি প্রত্যেকে জানে। একদল আছে যারা এই অবস্থা থেকে ক্ষীর লুটছে, ননি লুটছে, সব লুটছে। কাজেই এই অবস্থাটা তারা perpetuate করতে চায়। আর একদল দিশেহারা হয়ে ঘুরছে কতগুলো নেতার পেছনে যেগুলো প্রত্যেকটা চোর, প্রত্যেকে তাদের নাম বজায় রাখা, পয়সা করা ইত্যাদিতে ব্যস্ত। এরা এই সব লোকের দ্বারা বিভ্রান্ত।...এই যে ছেলেপিলেগুলো বখে যাচ্ছে. রাস্তায় বেরোলে দেখি আজকালকার ছেলেপিলেরা যে ধরনের behaviour করে তা বলা যায় না, এ সমস্তই হচ্ছে frustration-এর ফলে।

এবং এখন আমার নিজের ধারণা দুটো রাস্তা পরিষ্কার: straight fascism আর নইলে Leninist পথে কোন কিছু।...ছবিতে এ বলার অবকাশ নেই, কেননা আমি জানি এ দেশে leadership বলে কোন পদার্থ নেই।

...আমি বাপু বলতে চেয়েছি ভূতের নৃত্য চলছে গোটা বাংলাদেশে।...হ্যাঁ ঠিকই ধরেছো, [ঐ স্থবির ভদ্রলোক] অপেক্ষা করছে, তোমরা নাচন কোঁদন কীর্তন করে যাচ্ছো, যে যার কোলে ঝোল টানার চেষ্টা করছে all political leaders. এবং এই ভূতের নৃত্যের জন্য তুমি এবং তোমরা দায়ী এটা বারবার বলা হয়েছে। Dancing figureগুলোর আঙুল, তোমাকে সব সময় point out করছে—You are responsible.'

এই হল যুক্তি তক্কো সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি।

'৭৪ ইংরেজির গ্রীষ্মের ছুটিতে ছবিটি দেখেছিলাম। পুজোর ছুটিতে ডিস্ট্রিবিউশনের চেষ্টা হয়। এফ. এফ. সি. Mr. Dave-এর জন্য টেলিগ্রাম করেছিল। কিন্তু কেন হল না জানি না।

এই ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যাপারে সই করার জন্য ডিসেম্বর মাসে ট্রাংক-কল করে আমাকে যেতে বলা হয়। কলকাতায় গিয়ে সোজা ল্যাবরেটরিতে চলে যাই।...ছবিটির সংলাপে সব জায়গায় ঠোঁট মেলেনি। তাই আবার ডাবিং হচ্ছিল। গিয়ে দেখলাম শরীর খুব সুস্থ নয়। এই অবস্থায় মদও চলছে, ডাবিং চলছে। এবং সমস্ত রাজনৈতিক বক্তব্যগুলোই তখন বলা হচ্ছিল। কিন্তু ওই অবস্থায় কি কথাগুলো স্পষ্ট হতে পারে? তাই সংলাপ সব জায়গায় স্পষ্ট হয়নি। কিন্তু কথাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যেমন—শালবনের দিকে আসতে আসতে নীলকণ্ঠের সংলাপ:

'সমাধান একটা বের করতেই হবে। এ চলতে পারে না। আমাদের সমস্ত generationটার কোন ভবিষ্যৎ নেই। Way outটা কি? পথটা কি? থাকতেই হবে—একটা কিছু থাকতেই হবে। অনেক ভাবলাম—আমাদের বাংলাটার historic conditionটাকে কেউ scientifically analysis করে না। বিজ্ঞানের সূত্রে ইতিহাসকে গাঁথেনি। এবং economic ক্লাসগুলো গত দুশো বছরে—উত্থান-পতন বিশেষ করে—যাক্‌গে কেউ—এই যে ৪৭ সালের বিশাল বিশ্বাসঘাতকতা, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, National liberation movement এর পিঠে ছুরি মেরে বুর্জোয়াদের ১৫ই অগাষ্টের বিরাট Great Betrayal—স্বাধীনতা—Indipendence—ফুঃ...

কিন্তু আমি যে থাকতে চাই। আমার বাংলায় তোমরাই তো সব—আর তো কিছু নেই। তোমরা ভবিষ্যৎকে ছিনিয়ে আনবে। সে যে করেই হোক। তাই তোমরা কি ভাবছ আমি বুঝতে চাই।...

আমাদের generation-টা বাস্তবের সঙ্গে নাড়ীর যোগ হারিয়েছে—হয় আমরা চোর, নয় বিভ্রান্ত—আর নয়তো কাপুরুষ হয়ে পালিয়ে যাবার মিছিল। খাঁটি কোন বেটা না। এক শালাও না। তোমরা হচ্ছ cream of Bengal. আমাদের সম্পূর্ণ পুঁজি তোমরা—আর যাই হও স্বার্থের লোভে প্রাণ দিচ্ছ না—হীরের টুকরো সব।

তোমাদের sincerity, তোমাদের বীরত্ব, তোমাদের আত্মত্যাগের প্রতিজ্ঞা—এসবে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমরা সম্পূর্ণ

misguided. তোমরা অগ্নিযুগের ছেলেদের মতই সফল এবং নিষ্ফল। তোমরা একদিকে শহীদ আর একদিকে গোঁয়ার এবং অন্ধ।

Marxism ও Dialectics-এর বশীভূত। It is guided by Dialectical and Historical Materialism. গোটা দাগে তার ক্রমবিবর্তনও দেখা যাক। Marx Engels-এর বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ, Com, Lenin টেনে নিয়ে গেলেন এবং apply করলেন পুঁজিবাদের আর একটা বিকাশের স্তরে। তিনি বললেন যে, Imperialism is the moribund state of Capitalism.

তারপর এলেন Com. Stalin—আমার মতে Bureaucratic Socialism-এর জন্ম হল। এরপর এলেন Com. Mao—যিনি কৃষক শ্রেণীকে সংগঠিত করে বিপ্লবের পথে এগিয়ে এলেন। ব্যাপারটা কিন্তু সেখানেই থামল না— এলেন গুয়েভারা, এলেন কাস্ট্রো—তাঁরা নির্ভর করলেন বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্র সম্প্রদায়ের ওপর। তারপর এদের সবার নাম করে কি যে সব হতে আরম্ভ করলো আমার তো সব গুলিয়ে গেছে, কেমন যেন নিহিলিজম্ টেররিজম্ অ্যাডভেনচারিজম্ লেনিনের ভাষায় Infantile Disorder বালখিল্যসুলভ বদহজম এইসব কথাই মনে হতে আরম্ভ করলো।...

দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলো যেমন কিউবা বা বলিভিয়া এদের আজকের সভ্যতার গোড়াপত্তন মাত্র তিন-চারশো বছরের পুরনো। ইতিহাস এবং ভূগোলের দিক থেকে এরা নিতান্তই অর্বাচীন অর্থাৎ ছোটমাপের।...

কিন্তু ভাব দেখিনি এই ভারতবর্ষ, এই বাংলা, এই ভারতবর্ষের ইতিহাস চার হাজার বছরের। এবং যত গাল দি এদেশে সবচাইতে উজ্জ্বল দার্শনিক চিন্তা জন্মগ্রহণ করেছে, কাজেই সবচেয়ে বড় ফিচেল বদমাইশদের হাতে এদেশ প্রচুর হাতিয়ার তুলে দিয়েছে।

এগুলো বদমাইশির অস্ত্র। কিন্তু সেগুলোকে বুঝে জাপটে ধরে উপড়ে ফেলতে হবে। ওরা নেই বললেই চলে যাবে না। ওদের শেকড় ওপড়াতে হলে ওদের শক্তি এবং ওদের দুর্বলতা ভাল করে জানতে হবে।...

আজকে কোন্ সিদ্ধান্ত Indian conditionকে অথবা বাংলার conditionকে সঠিক পথে নিয়ে যাবে সেটা আমার জানা নেই। আমি

confused, fully confused, দিশেহারা হয়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছি। হয়তো আমরা সবাই confused.'

এই হল পুরো রাজনৈতিক বক্তব্য। কিন্তু এখানেই শেষ হয়ে যায়নি সমস্ত কথা...'সাঁকো' নাটক থেকে আরম্ভ করে যে কথাগুলো বার বার শুনেছি সেই জীবনের কথা দিয়েই শেষ হয়েছে : 'Law of life জীবন...জীবিতের...জীবিতের ধর্ম। বহতা অমোঘ, দুর্নিবার...।'

এই কথাগুলো শুনে মনে দৃঢ় আশা ও বিশ্বাস জাগে, অমোঘ এবং দুর্নিবার জীবনের গতি একদিন ভবিষ্যৎ ও নতুন দিনকে ছিনিয়ে আনবে।

ছবি শেষ হবার আগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা দিয়ে নিজের বক্তব্য শেষ হয়। নীলকণ্ঠের শেষ বক্তব্য দুর্গাকে—

'মানিকবাবুর সেই মদনতাঁতীর কথা মনে আছে তোমার? সেই যে বলেছিল, ভুবনমহাজনের টাকায় সুতো কিনে তাঁত চালাবো? তোদের সঙ্গে বেইমানী করবো? তাঁত না চালিয়ে পায়ের গাঁটে বাত ধরে গেছে তাই খালি তাঁত চালালুম একটু।'

এরপর মৃত্যুর মুখে চলে পড়বার আগে : 'একটা কিছু করতে হবে তো? একটা কিছু করতে হবে তো?

ছবিটির শুটিং শেষ হবার আগে ও পরে অনেক দিন, অনেক বার মানিকবাবুর এই কথাগুলো বলতে শুনেছি ও দেখেছি কথাগুলো বলতে বলতে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। এই কথাগুলো বোধহয় মানিকবাবুর 'শিল্পী' বইতে আছে। কথাগুলোর কি এই মানে?—'আমি কম্প্রোমাইজ করব না—তাই ড্রিঙ্ক করে করে জীবন শেষ করছি?'

জানি না।

(৬)

ছবিটা মুক্তিলাভ করে না। '৭৫ সালের এপ্রিল মাসে আমরা বোম্বে যাই। আমি সঙ্গে যাওয়ায় খুব খুশি। মহেন্দ্র ছিল বলে মদ্যপান নিয়ন্ত্রিত ছিল। এবং বোম্বে গিয়ে পাজামা, পাঞ্জাবি, চটি ইত্যাদি কেনা হয়। প্রতিদিন

স্নান করে ও পরিষ্কার জামাকাপড় পরে এফ. এফ. সি. ও ফিল্ম ডিভিশনের অফিসে যাওয়ায় প্রত্যেকেই দেখে আশ্চর্যান্বিত ও খুশি।

আমাকে পুণা নিয়ে যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সময়াভাবে যাওয়া হয়নি। পুণা আমি দেখিনি। একদিন দূর থেকে ডেকান কুইন এক্সপ্রেস দেখে খুবই যেতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় চলে আসতে হল।

বোম্বেতে 'সেই বিষ্ণুপ্রিয়া'র সিনোপসিস এফ. এফ. সি.-তে জমা দেওয়া হয়েছিল।

'সেই বিষ্ণুপ্রিয়া' সম্বন্ধে নিজের বক্তব্য :

'বছর খানেক আগের একটা সত্য ঘটনা—নবদ্বীপের একটি মেয়ে, বিষ্ণুপ্রিয়া দারুণ contrast ঐ নবদ্বীপেই, সেই নিমাই-বিষ্ণুপ্রিয়া, তার অপরাধ সে রূপসী এবং গরীব ঘরের মেয়ে। কয়েকজন মস্তান তার পেছনে লাগে এবং সে আত্মহত্যা করে। এটুকুই কাগজে বেরিয়েছিল, কিন্তু যেটা বেরোয় নি সেটা আমি একজন সাংবাদিকের কাছে জেনেছি, সে ওখানেই থাকে, মেয়েটি মোটেই আত্মহত্যা করেনি, she was raped and burnt to death. এই আমার গল্প, এই আমার ছবি।'

দিল্লিতে চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি থেকে করবার জন্য ঠাকুমার ঝুলি-র 'Princess Kalavati' নামে বুদ্ধুভুতুম-এর রূপকথা নিয়ে একটি সিনোপসিস লিখে পাঠানো হয়েছিল। দিল্লিতে পাঠাবার সময় Mr. Kidwai-কে এই চিঠিটি পাঠানো হয় :

Calcutta
28.3.75

To
Sree Kidwai
Secretary,
Information & Broadcasting Ministry,
Govt of India.
Shastri Bhavan, New Delhi–1.
Dear Kidwai,

I am sending you, as promised, the story material for the Children's Film. Along with, I am sending you the budget. Please be kind enough and process the whole rigmarole out. I depend on you and expect to hear an answer at your earliest convenience.

I hope you are well and probably things will look up in the near future, I am working so, do not lose faith in me.

Love
Yours
Ritwik Ghatak.

এই রূপকথার গল্পটি ছবি করলে কী আশ্চর্য সৃষ্টি হত ভাবা যায় না! বোম্বেতে গিয়েও ফোন করানো হয়েছিল। এই ছবির সিনোপসিস ও বাজেট যদি মঞ্জুর হত—'সেই বিষ্ণুপ্রিয়া'র সিনোপসিস ও বাজেট যদি এফ. এফ. সি. মঞ্জুর করত—'যুক্তি তক্কো গপ্পো' যদি মুক্তি লাভ করত—
'তিতাস একটি নদীর নাম' যদি এই দেশে আসত—
তবে জীবন অন্য রকম হত—

কিন্তু কিচ্ছু হল না। এই মানসিক অবস্থায় 'জ্বলন্ত' নাটকটি লিখে রিহার্সাল আরম্ভ হয়। গান টেকিংয়ের রাত্রে অলক দে প্রভৃতি টাকাপয়সার ব্যাপারে কাজ শেষ হবার আগেই চলে যান। পরে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের নিয়ে গানগুলো করানো হয়। টেকিংয়ের দিন আমি পাশে বসেছিলাম। ওই নাটকটি স্টারে করার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না হওয়ায় একাডেমিতে একটি শো হয়। তখন শরীর আবার অসুস্থ—জন্ডিস আরম্ভ হয়েছে।

সেই অবস্থায় শান্তিনিকেতনে এসে রামকিংকর বেজ-এর ওপর কালারে ডকুমেন্টারির শুটিংটা করা হয়। প্রযোজক মোহন বিশ্বাস ও শিখা বিশ্বাস তখন খুবই দেখাশোনা করেছেন। এই কাজটি করার সময় আমি সঙ্গে থাকতে পারিনি। শুটিং শেষ করার পর, কলকাতায় ফিরে আসার

পরই, শরীরের ভয়াবহ অবস্থা শুনে ও দেখে বরুণ বক্সী হাসপাতালে ভরতি করেন। খুব খারাপ ধরনের জন্ডিস হয়েছিল। আমার মেয়ে দু'বেলা যেত। প্রতিদিনের ওষুধ, ইঞ্জেকশন, অ্যাটেনডেন্ট ইত্যাদির খরচ নিজেকেই চালাতে হত।

আমি পূজার ছুটির সময় দিয়ে দেখলাম অনেকটা ভালো। জন্ডিসও তখন ভালো হয়েছে। কিন্তু বিকেলের দিকে প্রচণ্ড কাশি ও জ্বর আসত। টাকাপয়সার ব্যবস্থার জন্যও খুব কষ্ট করতে হত। আমার নিজেকে খুব অসহায় মনে হত। আমার সামান্য চাকরি। কোনও কাজকর্মেরই কোনও সুরাহা হয়নি। তখন আমি ও মহেন্দ্র উকিল শংকর লাহিড়ীকে ঠিক করলাম, যাতে কাজকর্মগুলোর সুরাহা করতে পারি। এফ. এফ. সি-র চেয়ারম্যান মিঃ করঞ্জিয়া-কে আবার ছবিটি রিলিজ করবার জন্য চিঠি দিলাম।

'মেঘে ঢাকা তারা' ও 'কোমলগান্ধার'-এর স্বত্ব ফিরে পাবার সময় আমাকে লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু আগেই লিখেছি, শ্রীবীণা ফিল্মস্ মদ্যপান করিয়ে অত্যন্ত খারাপ শর্তে অনেক কিছু লিখিয়ে নিয়েছিল।

শংকরদা বলেছিলেন, 'ঋত্বিক ওদের সঙ্গে negotiation আরম্ভ করলে, সুরমা ও তার ছেলেমেয়েরা যাতে ছবিদুটো থেকে ঠিকমতো টাকাপয়সা পায়, আমি সেইমতো ব্যবস্থা করে দেব।'

কিন্তু ওই জ্বর ও কাশির জন্য নেগোসিয়েশন আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। মেয়ে দু'বেলা যেত, আমি রোজ বিকেলে যেতাম। সকালে রোজ কাজকর্মের ব্যাপারে পয়েন্টস্ লিখে রাখা হত। কারণ বিকেলে রোজ জ্বর আসত। বিকেলে বসবার জায়গাটিতে আমরা সবাই অনেকক্ষণ বসতাম। একটি চাদর গায়ে দিয়ে বসবার ভঙ্গিটি এখনও মনে পড়ে।

'লজ্জা'র স্ক্রিপ্ট ওই সময়েই লেখা হয়। স্ক্রিপ্টটির শেষ অংশ নিজে হাতে লিখে শেষ করেছেন। ওই অসুস্থ অবস্থায়ও এখন ভাবি কী কষ্টটাই করেছিলেন। এখানে উদ্ধৃত করছি আমার কাছে লেখা একটি চিঠির অংশ:

৩১।১।৭৫ ইং

লক্ষ্মী,

কয়েকটি কথা মন দিয়ে ভেবে দেখে তবে এগিয়ো। প্রথমতঃ এতসব

করার চেষ্টা হচ্ছে কেন? কিছু টাকা সংগ্রহের প্রাথমিক কারণ, আমরা দুজনেই চাই, বাচ্চাদের একটা provision হয়।

শান্তভাবে আমি আমাদের ব্যবস্থাগত সমস্যাগুলো নিয়ে ভেবেছি, আশাকরি তুমিও সেইভাবেই নেবে। একটা পাপচক্রের মধ্যে আমরা ফেঁসে গেছি। চারপাশ থেকে নানা স্বার্থ কাজ করছে, তার কোনটাই আমাদের পক্ষ ভেবে কাজ করছে না। এসবের দায়িত্ব কার, এ নিয়ে তর্কের পিঠে তর্ক উঠবে। তাই লিখিত আকারেই জিনিষটা তুলে ধরছি।

ঘুনাক্ষরেও আমার এই পরামর্শ যদি তোমার আশেপাশে কেউ জানতে পারে, তাতে কারো লাভ হবে না, কিন্তু আমার ক্ষতি করার জন্যে মুখিয়ে ওঠার লোকের অভাব হবে না। আমি যা লিখছি, তা নিতান্তই পরামর্শ হিসেবে। শেষ সিদ্ধান্ত তোমার।...যদি কোন আইনজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে চলতে পার, সবচাইতে ভাল হয়। এবং একটা কথা। কোন কারণেই, কারো কাছে কারো কথা শুনে কোনরকম সই কোথাও তুমি দেবে না।

আর কিছু কথা এই সঙ্গে পরিষ্কার থাকা ভাল। এখানে যা কিছু লিখছি, সবই অতীতের তিনটি ছবি সম্পর্ক। এ তিনটি থেকে, আমার পরামর্শ মত চলে বা অন্য কোন আইনজানা ভদ্রলোকের মত নিয়ে, যদি কোন টাকা তুমি হাতে পাও, আমি কোনদিন তার ভাগ চাইতে আসব না। আমার তরফ থেকে এ তিনটি ছবি মৃত। এ তোমার সম্পত্তি সম্পূর্ণ।

সৃষ্টিশীল এবারে আমি যা করব, তা হবে সম্পূর্ণ আমার, সেখানে তোমাকে কোনভাবে টেনে আনব না—ব্যবসার ব্যাপারে তো নয়ই। ভবিষ্যতে কাজ করার চেষ্টা করব, হলে নিজের দায়িত্বে করব। আশা করি, তুমিও সেটা বুঝবে, এবং বুঝে চলবে।...

ব্যবসাগত ও দরকারি কথায় দীর্ঘপত্র। যেভাবে যা করতে বলেছিলেন সেই ভাবেই সব করেছিলাম। শিল্পীমন সব সময়ই শিল্পসৃষ্টি করতে চেয়েছিল। কিন্তু ব্যবসাগত ব্যাপার সর্বদাই সে পথে বাধা সৃষ্টি করেছে।

এদিকে ওই অসুস্থতার মধ্যেও প্রতিদিন সকালে বসে 'লজ্জা'র স্ক্রিপ্ট লেখা চলছিল। কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি:

MONTAGE of Eyes of all characters. Culminating in Renu's eyes and accusing finger.––We build up a STACCATTO montage which becomes progressively fast. Like a coward stoned dog Animesh starts running away, always looking back again and again. He goes to long.

cut to

The dug area in the compound, full of mud. Morning

Animesh comes in the same way, looking back and back.

–He slips.

He falls with a loud noise in the mud.

–His head comes up. His hands fly to catch the slippery, muddy earth. His hands cannot hold a grip, only the signs of claws on the muddy wall.

His face comes up.

He spits muds. He tries to speak, but only some animals' growls come out with uncanny sound.

We INTERCUT, this activity from many angles.

Suddenly camera goes to extreme vista top shot. In the middle of the frame. He goes on doing the same activity.

Camera suddenly holds the sky.

Birds circling. Their charns mingles with the noise of Renu's banging and shouts, at the same time Animesh's animal growls. Again that vista shot. Shadow of the birds circling.

Camera goes to LMS

Animesh's head bobs up and down the mud while his hands go on clawing.

–A red lotus with dew tingling on petals. Slowly

mangnifies in the centre of the frame and stops at B. C. S. position.

...No Animesh. He is covered by the lotus. A border area on all our sides of the frame remain B.W.

...In the lower border comes the wriggling

The End Cut.

(৭)

৪ঠা নভেম্বর সকালে হাসপাতালে গিয়েছিলাম দেখা করতে। সেদিন পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল। তখন জানতাম না এ দিনটি আর ফিরে আসবে না। বিকেলে দিদি এসেছিলেন খাবার নিয়ে। পরে ডলিদিরাও এসেছিলেন। কিছুদিন আগেই ছোড়দা (শ্রীলোকেশচন্দ্র ঘটক) মারা গেছেন। ছোট ভাইটিকে তখনও জানানো হয়নি। সকলের মন ভারাক্রান্ত।

এর আগে মেজো ও সেজো ভাসুর মারা গিয়েছিলেন। তারপরে আমার একজন ব্রিলিয়ান্ট ভাগনি শ্রীমতী চিত্রপর্ণা নিয়োগী, বড়দার মেজ ছেলে—আমাদের পুত্রসম শ্রীমান অবু ঘটক, আর একজন ব্রিলিয়ান্ট ভাগনির স্বামী, একজন জা ও মেজো জামাইবাবু মারা গেছেন। সুতরাং সবারই কামনা ছোট ভাইটি যেন অচিরেই সুস্থ হন।...আমার ছুটি শেষ হয়, চলে আসি।...

মেয়ের চিঠি পাই, জ্বরটা টাইফয়েডের দিকে মোড় নিয়েছিল। এখন ভালোর দিকে। ডিসেম্বর মাসে হাসপাতাল থেকে বেরোবার পর বড়দিনের ছুটিতে আমি দেখা করতে যাই। গঙ্গার ধারে তপন সাহার বাড়িতে তখন বিশ্রামে ছিলেন।

'৭৫ সাল শেষ হয়। '৭৬ সালের নতুন দিনটিতে মেয়ে আসতে দেয়নি। প্রতি বারই পয়লা জানুয়ারি চলে এসে ২ তারিখে কাজে যোগদান করি। ওই পয়লা জানুয়ারি অনেক রাত অবধি নির্মলবাবু ও নারায়ণ সহ আমরা সবাই একসঙ্গে ছিলাম। তার পরেই 'আরও ড্রিঙ্ক করব, কিছু

হয়নি'—তখনও হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে দুর্বল শরীর। কালো কোট পরা চেহারাটি মনে পড়ে। একটি বারও হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে মদ্যপান ত্যাগ বা নিয়ন্ত্রণ করা হয়নি। এটা যে কী মর্মান্তিক...কিন্তু কী করতে পারি? নিতান্ত অসহায়...

আমার স্মৃতিচারণে লিখেছি ১১ জানুয়ারি সকালে সাঁইথিয়া এসে ছেলের গান শোনা হয়। ১২ জানুয়ারি সকালে বার বার বলা হয় : 'ফেব্রুয়ারি মাসেই নতুন কাজ আরম্ভ করব। পুরনো ছবির সমস্ত ব্যবস্থা তোমাকে করে দেব' ইত্যাদি।

অন্য বারের তুলনায় এইবার একটু উদাসীন লাগছিল। আমি একবার বলি—বাবা তো প্রতি চিঠিতেই লেখেন, ঋত্বিক কেমন আছে? বাবাকে কী লিখব?'

ওই কালো কোটটিকে পরে একটু মাথা নিচু করে বলেন, বাবাকে বলো—এবার তো হাসপাতাল থেকে ফিরেছি, এরপরে যখন হাসপাতালে যাব, আর ফিরব না। একটি বড় পটলের খেত থেকে একটি বড় পটল pluck করব।'

বহু দিন বহু বার শুনেছি, 'আমি মারা যাব। মাইকেল মধুসূদন, প্রমথেশ বড়ুয়া মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে মারা গেছেন, সেই ভাবেই মারা যাব।'

চুপ করে শুনি। একটি কথাও বলিনি। কিন্তু খুব খারাপ লাগে। আবার এই মৃত্যুর কথা কেন? এই মৃত্যুর কামনা কেন?

আস্তে আস্তে কালো কোটপরা চেহারাটি গলির মোড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়—আমি দাঁড়িয়ে থাকি।

আর তো আমি দেখিনি—

দেখেছি ৭ ফেব্রুয়ারি প্রথম টেকনিসিয়ান স্টুডিয়োতে আনার পর।

৬ ফেব্রুয়ারি সরস্বতী পুজোর পরদিন সকালে শান্তিনিকেতন গিয়েছিলাম ছেলেকে দেখতে। যাবার পর অধ্যক্ষ বললেন, খেলার মাঠে

ছেলের মুখে আঘাত লেগে ছেলে হাসপাতালে ছিল। ওর বাবার কাছে চিঠি গিয়েছিল। মহেন্দ্র এসে ছেলেকে কলকাতায় নিয়ে গেছে।

ফিরে এসেই শুনলাম স্কুলে ট্রাংক-কল এসেছে : Ritwik Ghatak in serious condition। ওই সময়ই আমার বাবারও চিঠি পেলাম, বাবা খুব অসুস্থ। চিকিৎসা চলছে। আমি দিশেহারা হয়ে পড়ি। কার কথা চিন্তা করব?

ছেলে, ছেলের বাবা? না আমার বাবা?

তবু ওই সময় ছেলের বাবার কথাই কম চিন্তা করেছি। কারণ যতই সিরিয়াস কন্ডিশন হোক, হাসপাতালে দিলেই তো শরীর সুস্থ হয়।

সন্ধ্যার সময় মেয়ের সঙ্গে পরামর্শ করি। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি আমার একটা ট্রেনিংয়ে যাবার কথা আছে। মেয়ের সামনে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা। তাই ঠিক করি মেয়েটির থাকার ব্যবস্থা করে কলকাতায় যাব। আমি ক্লাসও করতে পারব, হাসপাতালেও দেখাশোনা করতে পারব।

সরস্বতী পুজোর পরদিন এখানে খুব সুন্দর রঙিন আলপনা আঁকা হয়। সবাই দেখতে বেরিয়ে গেছে। একা ঘরে রাত এগারোটা পর্যন্ত একটা বোনা নিয়ে বসে ছিলাম। আবার রাত দুটো থেকে সকাল পর্যন্ত সমানে চিন্তা করেছি—ঠিক করেছি—সকালে সবাইকে একটা করে চিঠি লিখব—এখন সবাই মিলে চিন্তা করতে হবে। এই অল্প কয়দিনেই যখন সিরিয়স কন্ডিশন হল—আমার আর শক্তি নেই একা কিছু করবার, বার বার এই খবর আর শুনতে পারছি না।

কিন্তু সকালে কোনও চিঠি আমি লিখতে পারিনি। একটা বিষাদে মনটা ছেয়ে ছিল। কী এর সমাধান? কোথায় এর শেষ? মনের এই অবস্থার মধ্যে মৃণাল সেনের পাঠানো খবরের অক্ষরগুলো আমার চোখের সামনে অবলুপ্ত হয়ে গেল। শুধু মনে হয় আমি কী অপরাধ করেছি?...

আমার হেডমিস্ট্রেস শ্রীমতী মায়া ঘোষ ও সহকর্মীরা একটি ছেলেকে সঙ্গে দিয়ে আমাকে রওয়ানা করে দেন। বর্ধমানে ছেলেটি একটি খবরের কাগজ নিয়ে আসে। চলমান দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম সোনালি আলোয় উদ্ভাসিত দিনটিতে সবই চলছে...মৃণাল সেন লিখেছিলেন সুরমা ঘটকের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। কথাটা মাথায় ঢুকেছিল। অর্জুনের

লক্ষ্যভেদের মতো মনটা স্থির হয়ে ছিল—কাজটা আমাকে করতে হবে। ছেলেকে যেন কিছু না করতে হয়।

হাওড়া স্টেশনে বেলা ও নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। হাসপাতালে অগণিত লোকের ভিড়ে আমাকে রাখা হয়নি। সেদিন গীতা ও মৃণাল সেন, বেলা ও নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার ও দীনেন গুপ্ত প্রভৃতিরা না থাকলে আমার কী অবস্থা হত ভাবতে পারি না।

শেষপর্যন্ত আমার হাত ধরে ছিল আমার মামিমণি ও বোনপো শ্রীমান বাবুল। আমার দুলুমাসি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল।

টেকনিসিয়ান স্টুডিয়োতে আনার পর আমাকে নিয়ে আসা হয়। নিস্তব্ধ স্টুডিয়োতে সবাই প্রতীক্ষা করছিলেন তাঁদের ঋত্বিকবাবুকে শেষ বিদায় জানাবার জন্য ফুল ও মালা নিয়ে। এই স্টুডিয়োর কলাকুশলীদের জন্য ইউনিয়ন তৈরি করা হয়েছিল। সবাই প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন তাঁদের ঋত্বিকবাবুকে। আর ভালোবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন তাঁর সামগ্রিক শিল্পকর্মকে, দরদী দৃষ্টিভঙ্গিকে।

আমি তো তখনও জানি না—১২ জানুয়ারি সাঁইথিয়া থেকে আসার পর এই কয়দিনের মধ্যে কী হয়েছিল। কিন্তু খোলা আকাশের নীচে শায়িত মানুষটির দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হই। মুখে অপূর্ব হাসি, কোনও রোগ-বিকৃতি নেই। দেখে কিছুতেই মনে হয় না প্রাণ নেই।

এ চেহারা যতদিন বেঁচে থাকব মনে থাকবে। পরে শুনেছি অনেক গণ্ডগোলের পর জনতার দাবির ফলে তথ্যমন্ত্রী সুব্রত মুখার্জি খোলা গাড়িতে আনার ব্যবস্থা করেছিলেন। মনে পড়ে—অজিত লাহিড়ী পরে বলেছিলেন—ঋত্বিক রাজার মতোই গেছে।

অগণিত আত্মীয়, বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরা শেষ পর্যন্ত ছিলেন। রাত্রে মৃণাল সেনের বাড়িতে এসে একটা কথাই বার বার বলেছি : 'মৃণালবাবু! আমি সবায়ের কাছে কৃতজ্ঞ। বহু বছর ধরেই সবাই বার বার এগিয়ে এসেছেন যাতে তাঁদের ঋত্বিকবাবু সুস্থ হয়ে কাজ করেন—আমি সবাইকেই বলতে চাই।'

মৃণালবাবু বলেন, 'আমার বাড়ির ছাদেই ব্যবস্থা করব, কোনও চিন্তা করবেন না।'

সেই অনুযায়ী মৃণালবাবু, অনুপকুমার, নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যবস্থা করেছিলেন। সবাই এসেছিলেন। হেমাঙ্গদা, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র প্রভৃতি গান করেছিলেন। ছেলেও গান করেছিল। প্রথমেই—'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে' গান দিয়ে শুরু করায় সকলেরই মন ব্যথিত হয়ে ওঠে।

সকালবেলা শ্রদ্ধেয় দাদা সুনীল চ্যাটার্জি ও অমিয় চ্যাটার্জি কাজ করার ব্যবস্থা করায় আমি খুবই কৃতজ্ঞ। আমার ভাইটিও এসেছিল।...মনে পড়ে অনেক দিন আগে মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ...কথাগুলোর মানে আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

(৮)

এরপরে একটি বছর শেষ হয়েছে। একটি বছরের প্রতিটি মুহূর্ত একটি চিন্তাই মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। কোনও সময় ভুলতে পারি না।

হাসপাতালে আমি দেখিনি। মেয়ে ও বাবলুদার মুখে পরে সব শুনেছি। শ্রীবীণা ফিল্মসের চ্যাটার্জি ও রায়চৌধুরী নিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের উকিল শংকর লাহিড়ীর কাছে। শংকরদা পরিষ্কার বলেন, 'আমি তো সুরমার উকিল।'

ওরা আরও অনেক সই টই করিয়েছিল।

৩ ফেব্রুয়ারি মেয়ের হোস্টেলে গিয়ে বলেছিলেন, 'টুনুমা! তোমার বাবা তো আর বাঁচবে না, কান্নাকাটি করিস না মা।' মেয়ে বলে ডাক্তার দেখাতে, ওষুধ কিনতে। ওখান থেকে এসে একটু মদ্যপান করার পর শরীরটা খারাপ বোধ হয়। বাবলুদা বলেন একবার ডাক্তার দেখাতে। সন্ধ্যার সময় শেক্সপীয়ার থেকে অনেক আবৃত্তি করা হয়েছে, অনেক গান করা হয়েছে। পরে সমীরের মুখে শুনেছি, কয়দিন ধরেই খুব গান করা হচ্ছিল, ছেলেমেয়েদের কথা বলা হচ্ছিল। ওরা সুকান্ত ও চালর্স ডিকেন্সের বই চেয়েছিল। তাও কিনে রাখা হয়েছিল। ৪ ফেব্রুয়ারি সকালে রক্তবমি

হয়। বাবলুদা বলেছিলেন। সন্ধ্যায় সমীর এসে দেখে মেয়ের হোস্টেলে আসে। সুপারিনটেনডেন্ট নিয়ে যেতে বলেন। তক্ষুনি নিয়ে এসে হাসপাতালে এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ভরতি করা হয়। সমীর ও মেয়ে রাত্রেই মেডিকেল কলেজে যায় রক্ত আনতে। প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির মধ্যে কোনও যানবাহন না পেয়ে দু'জনে হেঁটে আসে এসপ্লানেড অবধি। সকালেই ভলিদিদের খবর দেয়। পরদিন মৃণাল সেনকে ফোন করে। ডাক্তাররা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। বার বার তাঁরা মেয়েকে বলেছেন, 'খুব খারাপ অবস্থা। তুমি বার বার আসছ, আর কি কেউ নেই?' প্রথমে প্রি-হেপাটিক কোমা ও পরে কোমা-র দিকে চলে যায়—কিছু করার ছিল না।...এত অল্প সময়ের মধ্যে এমনিভাবে জীবন শেষ হবে কখনও ভাবিনি।

দীর্ঘ দশ বছর সুস্থ করবার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই জীবনের ওই আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসা হয়নি। বহু ভেবেছি কী এর সমাধান? কোথায় এর শেষ?

একটা বিশ্বাস ছিল ছেলে বড় হয়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।...বহু আগেই 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'তে নিজের চরিত্র অভিনয় করে নিজের মৃত্যু দেখানো হয়েছে। অনেক সময়ই ভেবেছি কেন এই মৃত্যু দেখানো হল? প্রতিদিনের উর্ধ্বে যে শিল্পী ও দার্শনিক মন ছিল তার ধরাছোঁয়া ও নাগাল আমরা পাইনি।

সেই মন কী ভেবেছিল, কী বুঝেছিল কোন চিন্তাধারায় বয়ে চলেছিল জানি না। তবে খুব ইচ্ছে ছিল নতুন করে কাজ আরম্ভ করবার। শুধু তাই নয়, নতুন করে জীবন আরম্ভ করবারও দুরন্ত ইচ্ছা ছিল মনে।

সমীর আমাকে এসে সব জিনিসপত্র দিয়ে যায়। একটি নতুন সুটকেসে সমস্ত জামাকাপড় গোছানো ছিল। সব ওপরে ছিল একটি কালো জহরকোট। ওই জহর কোটটি গায়ে দিয়ে যুক্তি তক্কোতে শুটিং করা হয়েছিল। আমি বার বার বলতাম ওই কোটটি আর না পরতে। মনে পড়ে—কী প্রচণ্ড অট্টহাসি—'লক্ষ্মী তো আমার মারা যাওয়া সহ্য করতে পারে না, তাই জহরকোটটি দেখতে পারে না।'

জহরকোটটি প্রথমেই দেখে স্তম্ভিত হই। নতুন সাবান, তোয়ালে,

শেভিং সেট। একটি ব্যাগে একটি স্টোভ, অ্যাটাচিতে সমস্ত কাগজপত্র গোছানো। নতুন বিছানা তৈরি করা হয়েছিল, ফার্নিচারের অর্ডার দিয়ে টাকা অ্যাডভান্স দেওয়া হয়েছিল। আরও ছিল সুটকেশে কয়েক হাজার টাকার গিফ্‌ট্ কুপন। 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'র বেস্ট স্টোরির জন্য প্রাইজের গিফ্‌ট্ কুপন।

বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাই। মন চলে যায় অনেক দূরে—একজন বাংলাদেশের ছেলে একদিন গেরুয়া পাঞ্জাবি গায়ে, কাঁধে একটি ঝোলা নিয়ে রওনা হয়েছিলেন জীবনের পথে...। গৈরিক পদ্মার ধারে রূপকথার দেশের স্বপ্ন দেখে যে জীবনের শুরু—যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ পেরিয়ে দুই বাংলার ক্ষতবিক্ষত রাজপথে সে জীবনের সমাপ্তি।

বহুদিন শুনেছি—'লক্ষ্মী! টাকাটা তো থাকবে না, কাজটা থাকবে, তুমি দেখে নিয়ো, আমি মারা যাবার পর সবাই আমাকে বুঝবে।' মানুষটি কি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন?

উপসংহার

নাগরিক থেকে যুক্তি তক্কো পর্যন্ত জীবনকে বার বার হতাশায় আচ্ছন্ন করেছে। কোনও ছবি ফ্লপ, কোনও ছবি সুপার-ফ্লপ, কোনও ছবি অসমাপ্ত, কোনও ছবি রিলিজ হয়নি—এইতো দীর্ঘ ইতিহাস। কিন্তু মৃত্যুর পরে একে একে সব ছবিই মুক্তিলাভ করবে, দর্শকরা দেখতে পাবেন। তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে।

আশ্চর্যভাবে মৃত্যুর এক বছরের মধ্যেই সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর আগের 'নাগরিক' ছবিটির একটি প্রিন্ট পাওয়া গেছে। শ্রীব্রহ্মা সিং ও শ্রীরমেশ যোশী বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরি থেকে এই ফিল্মটি উদ্ধার করেছেন। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। মনে পড়ে '৫৪ সালে আলাপ-পরিচয়ের পর বহুদিন শুনেছি : 'নাগরিক মুক্তি পায়নি, আমি সুইসাইড করব।' তখন ছবিটি মুক্তিলাভ করলে যে সম্মান, স্বীকৃতি পেতেন, তাতে পথিকৃৎ হিসাবে জীবনটা অন্য রকম হত। রিহার্সাল থেকে ফিরবার পথে অনেকদিন হাঁটতে হাঁটতে ম্যাডক্স স্কোয়ারে বসে ওই কথাগুলো বলা হতো মনে পড়ছে। ছবিটি রিলিজ করবার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছিল।

'নাগরিক' সম্বন্ধে নিজের উক্তি:

'নাগরিক-এর কথা তুলে লাভ নেই। 'নাগরিক' মোটামুটি একটা co-operative venture ছিল। কেউ পয়সাকড়ি নেয়নি, laboratory নেয়নি, studio নেয়নি, এমনকি raw film stock যেটা পাওয়া যায় না সেটাও আমি বিনে পয়সায় পেয়েছিলাম। এসব ছাড়া যে সামান্য পয়সা লাগে তা আমরা নিজের ট্যাঁক থেকে জড়ো করে করেছিলাম ছবিটা। কিন্তু আমরা এমন বোকা ছিলাম যে ছবির শেষ পর্যায়ে গিয়ে ব্যবসাগত ব্যাপারে একটা বাজে লোকের পাল্লায় পড়লাম আর সমস্ত জিনিষটাই নষ্ট হয়ে গেল। আমাদের মন ভেঙে গেল, বুক ভেঙে গেল। ও ছবি কোনদিন release

হবার সম্ভাবনা নেই দেখে আমরা ধরেই নিলাম যে লোকে আর ও ছবি দেখতে পাবে না।...

ছবি complete, censored, এ একটা ট্র্যাজেডি, এ এক ইতিহাস। এর স্তরে স্তরে বহু অধ্যায় আছে। ওসব কথা থাক, মোটামুটি কথা হচ্ছে বেশ ভালো মতো জুতো খাওয়া দিয়ে আরম্ভ হল আমার careerটা, পেটে ভালো পড়েছিল, পিঠেও পড়েছিল, বাবা মারা যাওয়ার পর যা কিছু সামান্য খুঁদকুঁড়ো পড়েছিল সব চলে গেল এ ছবি করে।

তাছাড়া এ ছবিতে আমাদের একটা প্রাণপণ চেষ্টা ছিল রাজনৈতিকভাবে কিছু করার, কিছু বলার। আমার একজন বন্ধু, যিনি এদেশের একজন খুব বড় পরিচালক এ ছবি দেখে আমায় বলেছিলেন, আপনার এ ছবি ভয়ঙ্কর রাজনীতি ঘেঁষা। আমারও তাই ধারণা। তখন আমাদের বি. টি. আর.-এর যুগ, বি-টি. রণদিভে, অর্থাৎ leftisim-এর মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি ঢুকে গিয়েছিল, অনেকটা এখনকার Naxalite রাজনীতির মতো।

তেলেঙ্গানা অভ্যুত্থানের সমসাময়িক। একান্ন সালে লেখা, একান্ন সাল পুরো লাগে, একটু একটু করে পয়সা আসে একটু করে কাজ হয়। বাহান্ন সালে ছবি শেষ হয়, censoredও হয়। আমার ঐ বন্ধু ঠিকই বলেছিলেন, ছবিটি রাজনৈতিক ছিল।...ও ছবিটি দেখলে লোকে ভাবত ঋত্বিক ঘটক রাজনীতির জন্য ছবি করে। ও ছবিতে রাজনীতি ছিল সোচ্চার ভাবে, বেশীরকম ভাবে। ছেলেমানুষি উচ্ছ্বাসও ছিল। তবু হয়তো কিছু ছিল, জানি না। যাকগে। সে ছবি recover করার কোন উপায় নেই এখন। তখন ছবির print গুলো ছিল nitrate based, ভালো ভাবে না রাখলে কিছুদিন vault-এ থাকলেই sticky হয়ে যায়। এখন filmগুলো একেবারে তাল পাকিয়ে গেছে।'

ছবিটি উদ্ধার হওয়ার পর দুটো রিল sticky ছিল। কোনও নেগেটিভ ছিল না। পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের আর্কাইভসের কিউরেটর Mr. P. K. Nair-কে একটি চিঠি লিখি। Nr. Nair-এর উত্তর আসে। তিনি তাঁদের ঋত্বিকদার every inch of work preserve করতে চান। তাই পুরনো প্রিন্টটা মিউজিয়াম অব আর্কাইভসে রেখে দিয়েছেন। আর এই প্রিন্টটির একটি ডুপলিকেট নেগেটিভ করিয়ে নতুন প্রিন্ট পাঠিয়ে দেন।

'নাগরিক'-এর প্রডিউসার শ্রীভূপতি নন্দী ছবিটি আমার নামে লিখে দিয়েছেন। ভূপতিদা আমাদের খুবই স্নেহ করতেন। ছবিটি মুক্তিলাভ করার পর যদি কোনও টাকা লাভ হয়, তাঁকে টাকা নিশ্চয়ই দেব, কিন্তু তাঁর অসীম স্নেহের অবদানের কথা জীবনেও ভুলব না।

যে ফিল্মগিল্ডের ব্যানারে ছবিটি তৈরি হয়েছিল, সেই ফিল্মগিল্ডের অংশীদার ঋত্বিক ঘটকও ছিলেন।

মৃত্যুর দু'মাস পরেই শ্রীবীণা ফিল্মস 'মেঘে ঢাকা তারা' ও 'কোমল গান্ধার'-এর জন্য আমার ওপরে ইনজাংশন দেয়। অ্যাডভোকেট প্রশান্ত সিংহ ও দ্বিজেন বাগচী এবং মহেন্দ্রর অক্লান্ত চেষ্টায় গত ডিসেম্বর মাসে সিভিল কোর্টে কেস ডিসমিস হয়েছে। কিন্তু ছবি দুটির ডিস্ট্রিবিউটর আবার ই. আই. এম. পি. এ.-তে আমার বিরুদ্ধে অবজেকশন দেন। আমি উত্তর দিয়েছিলাম। ছবি দুটি দশ বছর পরে রি-সেন্সর করানো হয়নি। সেই জন্য তারা গত পাঁচ বছর ব্যবসা করতে পারেনি। এই ছিল আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ। ই. আই. এম. পি. এ-তে কয়েকটি মিটিংয়ের পর শেষ পর্যন্ত বিচারক মণ্ডলী আমার পক্ষেই রায় দিয়েছেন।

'যুক্তি তক্কো-গপ্পো' রিলিজের জন্য অনেক চিঠিপত্র এফ. এফ. সি.-কে লিখেছিলাম। হঠাৎ চিঠি পাই ওই শ্রীবীণা ফিল্মস-ই ছবিটির ডিস্ট্রিবিউশন নেবার চেষ্টা করায় এফ. এফ. সি. রাজি হয়েছে। এবং অনেক কষ্টে শ্রীবীণা ফিল্মসকে বাতিল করিয়ে স্টার-এর মালিক শ্রীরঞ্জিতমল কাংকরিয়ার সঙ্গে ডিস্ট্রিবিউশন সই হয়েছে।

'বগলার বঙ্গদর্শন'-এর প্রযোজক হঠাৎ ছবিটি শেষ করবার জন্য যে শর্তাদি নিয়ে আসেন, তাতে দেখলাম তাঁরা হিন্দি বাংলা, সব স্বত্বই নিতে চান এবং অত্যন্ত আক্রমণাত্মক ভঙ্গি। সই করিনি। দীর্ঘ বারো বছর পর গল্পের স্বত্ব আমার নামে রেজিষ্ট্রি করিয়ে নিয়েছি। ই. আই. এম. পি. এ-তে বুলেটিন বেরিয়ে গেছে।

এই ভাবেই গত একটি বছর আক্রমণের পর আক্রমণ গেছে। রামকিংকর বেজের ওপর কালারে তোলা ডকুমেন্টারিটির ডুপলিকেট নেগেটিভ হয়েছে। ছবিটির এডিটিং ও শেষ কাজ এইবার রমেশ যোশী করবেন।

এরপরে 'তিতাস একটি নদীর নাম'ও এই দেশে আনার চেষ্টা করা হবে। 'সুবর্ণরেখা-র' ব্যাপারেও প্রযোজক এবং ডিস্ট্রিবিউটরের মধ্যে কী গোলমাল আছে জানি না, খোঁজখবর নিয়ে সমস্ত গোলমাল যাতে মিটে যায় ও ছবিটি সবাই দেখতে পান, তার জন্যেও চেষ্টা করা হবে।

বহু পরিকল্পনাই কার্যকরী হয়নি, মনটা ভারী হয়ে আসে। '৭৫ সালে যখন বোম্বে গিয়েছিলেন তখন একদিন বসে ঠিক হয়েছিল—মণি কাউল, কুমার সাহানী ও ঋত্বিক ঘটক তিনটি আলাদা গল্পের ভিত্তিতে একটি ছবি তৈরি করবেন। গল্প প্রত্যেকের নিজস্ব। সিরাজ প্রযোজনা করবে এই কথাও হয়েছিল।

গল্পটির আইডিয়াও একদিন বলেছিলেন। সমুদ্রের ধারে একটা জেলেদের বস্তি। সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। সেখানে একটি ছোট বোবা মেয়েকে নিয়ে গল্প। বান্দ্রার সমুদ্রতীরে একটা জায়গায় ছবিটি তোলা হবে ঠিকঠাক হয়েছিল। জায়গাটি দেখেও ছিলাম।...

তারপর এত তাড়াতাড়ি জীবন শেষ হবে কি ভেবেছিলাম? গত একটি বছরে শুধু এই একটি কথাই ভেবেছি। সমস্ত স্মৃতি যেন আছড়ে পড়ছে।... গত তিনটি মাস ধরে শুধু ভেবেছি লেখাটি তো আমাকে শেষ করতেই হবে।

প্রথম যেদিন দেখেছিলাম বার বার মনে হয়েছিল একটি ঋজু চেহারা, ঋজু চরিত্র, নিজের বক্তব্যে সোচ্চার। আশ্চর্যভাবে আশা-নিরাশায়, সুখে-দুঃখে, সুস্থ ও অসুস্থ অবস্থায় ওই ঋজু মানুষটির বক্তব্য সোচ্চারই থেকেছে। এইখানেই মানুষটির বৈশিষ্ট্য, এইখানেই তিনি ঋত্বিক। পুরোহিত।

একদিন যাঁকে দেখে মনে হয়েছিল, বাংলাদেশের এক ছেলে মার্কসবাদে বিশ্বাস করে এগিয়ে নিয়ে যাবেন সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে, ভারতীয় ঐতিহ্যকে, আজ তাঁর সৃষ্টি আলিঙ্গন করছে দেশ-বিদেশ ও মহাদেশকে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজের বক্তব্যে সোচ্চার।

এই আপোশহীন শিল্পী ও শহীদ!

এবং নিজের শিল্পসৃষ্টিতে অনন্য এই ঋত্বিককে আমার প্রণাম!

সুখে-দুঃখে একুশ বছর

১

আপনারা আমাকে লিখতে অনুরোধ করেছেন। একজন পরিচালকের স্ত্রী হিসেবে কয়েকটি শব্দ অনেকবার শুনেছি। যেমন 'মস্তাজ' শব্দটি। 'অযান্ত্রিক'-এর বিমল গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে চোখ বন্ধ করে বসেছিল— জগদ্দলের স্মৃতি ভেসে উঠেছিল মনের আয়নায়। আমার জীবনের স্টিয়ারিং ধরেও আজ বিমলেরই মতো বসে আছি। একুশটি বছরের স্মৃতি পর পর মনে হচ্ছে গভীর বেদনায়।

আমার বাবা শিলংয়ে কাজ করতেন। ছোটবেলায় মা মারা যাবার পর বাবার কাছে থেকেই কলেজে পড়াশোনা করেছি। পার্টির কাজও ওখানেই। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর শিলংয়ের বাড়ির অনেক সমস্যা, নিজের জীবনেও অনেক সমস্যা, পার্টিও তখন সঠিক পথে চলছিল না।

চলে আসি কলকাতায় এম. এ. ক্লাসে সিট পেয়ে। '৫২ সালের নির্বাচনে কাজ করি। প্রচণ্ড সাইনাসাইটিস, চোখেও পাওয়ার বৃদ্ধি, ক্লাস করা বন্ধ করি। মামা ও মামিমণির (ক্ষিতীন রায়চৌধুরী ও সাধনা রায়চৌধুরী) বাসায় এসে মামিমণির সঙ্গে আই. পি. টি.-এর সাউথ স্কোয়াডে অভিনয় শুরু করি।

ঋত্বিক ঘটক নামটি শুনেছিলাম। ভীষণ ইনটেলেকচুয়াল কিন্তু ভীষণ ট্রাবস্কাইট। 'নাগরিক' নামে একটি ছবি করেছেন। একদিন ভূপতি নন্দী আমাকে ছবিটি দেখতে নিয়ে যান। মানুষটিকে তখনও দেখিনি। কাগজে কাগজে ছবিটির খুব বিজ্ঞাপন বেরোত।...একটি বেকার যুবক চাকরি ও ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। রোজ ঘরের একটি ক্যালেন্ডারের ছবির দিকে

তাকিয়ে দেখে, রাত্রে দূরের রাস্তায় এক বেহালাবাদকের সুরের মূর্ছনা শুনে শুনে ঘুমিয়ে পড়ে। যুবকটির চাকরি হয় না, অবস্থা খারাপ থেকে খারাপের দিকে যায়। বোনটিরও বিয়ে হয় না। ভদ্রলোক বেকার। ছবির শেষে ভেসে আসে ইন্টারন্যাশনাল সংগীতের সুর। অর্থাৎ সংগ্রাম ছাড়া কোনও সমাধান নেই।

প্রথম দেখি ও বক্তৃতা শুনি প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পর যেদিন রাশিয়ান ডেলিগেশনদের সংবর্ধনা জানানো হয় টেকনিসিয়ান স্টুডিয়োতে। রোগা ও লম্বা চেহারা।

মনে পড়ে 'বিসর্জন' নাটকটিও দেখেছিলাম। কলকাতায় তখন আই. পি. টি. এ.-র সেন্ট্রাল স্কোয়াডের খুব নাম। 'বিসর্জন' নাটকে উৎপল দত্ত, কালী ব্যানার্জি ও ঋত্বিক ঘটকের একত্র অভিনয় খুবই উল্লেখযোগ্য। জয়সিংহের ভূমিকায় কালী ব্যানার্জির ও রঘুপতির চরিত্রে ঋত্বিক ঘটকের অভিনয় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

'৫৩ সালে গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় বোম্বে সম্মেলনে 'দলিল' নাটকটি প্রথম পুরস্কার পায়। ঋত্বিক ঘটকের নাটক। পরিচালনা এবং প্রধান অভিনেতাও নিজে। একটা ভিড়ের দৃশ্যে সমীরণ দত্তের অনুরোধে একটুখানি অভিনয় করে দিয়ে আসি। রোগা লম্বা চেহারার মানুষটি আমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে আসেন।

সর্বভারতীয় সম্মেলনে যে-প্রস্তাব নেওয়া হয়, তার কথাটা আমার ভালো লেগেছিল। এই নদীমাতৃক বাংলাদেশের সংস্কৃতি কীভাবে গড়ে উঠেছে, কীভাবে একে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ইত্যাদি। সম্মেলন থেকে ফেরার পর প্রত্যেক স্কোয়াডে ওই প্রস্তাবের বিষয় আলোচনা করতে আসেন ওই মানুষটি। প্রস্তাবের বক্তব্য ও ভাষা আগেই আকৃষ্ট করেছিল। এবার প্রত্যক্ষ শুনে মানুষটির প্রতি একটু আকৃষ্ট হই।

'৫৪ সালের প্রথমে বাবার কাছে কিছুদিন থেকে এসে দেখি মামিমণিদের বাসায় রোজই এসে নাটক নিয়ে আলোচনা করছেন। অবাক হই, কারণ মামিমণিরাই বলেছিলেন—ঋত্বিক ঘটক, উৎপল দত্ত, সলিল চৌধুরী এঁরা ইনটেলেকচুয়াল হলেও ট্রুট্স্কাইট। একেবারে মিশবে না।

উমানাথদা (উমানাথ ভট্টাচার্য) গোর্কীর 'লোয়ার ডেপথস্'-এর অনুবাদ করেছিলেন 'নীচের মহল' নাম দিয়ে। আই. পি. টি. এ.-র তিনটি শাখার বাছাই করা ছেলেমেয়েদের নিয়ে এটি করলে আই. পি. টি. এ-র খুব নাম হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 'নীচের মহল' নাটকটির রিহার্সাল আরম্ভ করেন।

কাজপাগল মানুষটির পরিচয় তখনই পাই। আমাকেও একটি পার্ট দেন। সমাজের নিচুতলার মানুষদের নিয়ে লেখা নাটকটি সম্বন্ধে আমাকে একটি ভূমিকা লিখে দিতে বলেন। লিখে দিই। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সত্য ও বড় হল মানুষ। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' প্রথমে প্রথমে মামিমণিকে বলতেন, 'সাধনাদি! আপনাদের বাসায় এই Das Kapital মেয়েটি কে?' আমার লেখাটা দেবার পর একটু আলাপ-পরিচয় আরম্ভ হয়।

ইতিমধ্যে মাসিমণি ও নিবুমাসিকে (নিবেদিতা দাস) 'বিসর্জন' নাটকের জন্য শিখিয়ে কলকাতার বাইরে সবাই একদিন অভিনয় করতে যান। রিহার্সালে দেখতাম ক্লান্তি নেই কোনও। অপর্ণার কথা 'বসে আছি ভরা মনে, দিতে চাই—নিতে কেহ নাই।'—জয়সিংহের উত্তর 'তাই বটে, তাই বটে! সৃজনের আগে দেবতা যেমন একা'...ইত্যাদি। কত বার দেখানো ও শেখানো—বুঝতাম কত গভীর মানুষটি! মানুষটির প্রতি আর-একটু আকৃষ্ট হই।

আমার পড়াশোনার ও জানবার আগ্রহ বুঝে আমাকে স্টানিস্লাভস্কি ও গর্ডন চাইল্ডের বই কিনে (আর্কিওলজির ওপরে) পড়াতে শুরু করেন। মামিমণিরাও শুনতেন।

একদিন মনটা খারাপ ছিল। পড়ানোর পর আমার মা'র সম্বন্ধে একটু বলি। মা ছোটবেলায় মারা গেছেন, অনেক কষ্টে পড়াশোনা করেছি। জেলে ছিলাম প্রায় দুই বছর। মা থাকলে জীবনটা অন্য রকম হত। আমরা দুই ভাইবোন হলেও মা'র অনেক ছেলে ছিল। খুব অল্প বয়সে মা মারা যান, কিন্তু মা'র ব্যক্তিত্ব ও স্নেহভালোবাসায় মুগ্ধ হয়ে অনেকে মাকে 'মা' ডাকত। আর মা ছিলেন খুব তেজস্বিনী। মায়ের লেখা ডায়রিটি পড়তে পড়তে দেখি চেহারাটা অন্য রকম হয়ে গেছে, চোখটা ছলছল। সেদিনের

দুটি কথা, আমার সম্বন্ধে— 'সেতারের একটি রাগিণী শুনছি', মা'র সম্বন্ধে— 'এই মা থাকলে আমাকে মানুষ করতে পারতেন।' আর 'লক্ষ্মী! আমি তোমার জন্য সব করব।' সেদিন মনে হয়েছিল; 'এ আমার মা'র ছেলে।'...সন্ধে হয়ে যায়। রিহার্সালে যেতে একটু দেরি হয়। একটি ছেলে ও মেয়ের একটু ঘনিষ্ঠ হওয়া সহজভাবে সাধারণত কেউ ভালো চোখে দেখে না। মৃদু গুঞ্জন শুনি।

'নাগরিক' ছবিটি মুক্তিলাভ করেনি। মনে প্রচণ্ড হতাশা, বাড়িতে প্রচণ্ড অর্থাভাব। কিন্তু সব সময় পড়াশুনা করতে দেখতাম। পার্টিতে কালচারাল লাইন সম্বন্ধে কেউ চিন্তা করত না। পার্টি-সম্পাদক অজয় ঘোষ একদিন আমাদের বাড়িতে (অজয় দাসের বাড়ি) আসেন। অজয়মামার বাড়িতেই নীচে মামা-মামিমার কাছে আমি থাকতাম।

কালচারাল লাইন সম্পর্কে সেদিন অজয় ঘোষের সঙ্গে আলোচনা করেন। অজয় ঘোষ সমর্থন করেন। এ ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের অবস্থা বুঝে মার্কসবাদকে প্রয়োগ করে কোনও তত্ত্ব বের করেনি। আমাদের দেশের সমস্যা চীন ও রাশিয়ার মতো নয়। অভিজ্ঞতা আমরা গ্রহণ করতে পারি। রাশিয়ার লেনিন বিপ্লবের প্রতিটি পদক্ষেপে নতুন নতুন বই লিখে গেছেন: *'What is to be done?' 'One step forward, two steps back'* ইত্যাদি। চীনে, মাও সে-তুং লিখেছিলেন 'New Democracy' বা 'নয়া গণতন্ত্র'। আমাদের দেশে কী লেখা হয়েছে? কিছু না।

ভারতের বেদ-বেদান্ত, দর্শন ও ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। দেশের সমস্যা-অনুযায়ী তত্ত্ব লিখে বিপ্লব সমাধান করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সাংস্কৃতিক উন্নতির পথে। এই ভাবেই ওই সময় আমরা চিন্তা করতাম। কিন্তু আমরা সাধারণ কর্মী। নেতারা নির্দেশ দিলে কাজ করব। তত্ত্ব আবিষ্কার করা বা নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা তো আমাদের নেই। তাই পার্টিসভা হলেও তখন কাজে খুব উৎসাহ ছিল না।

একদিন বই সম্বন্ধে আলাপ করতে করতে দেখি খুবই চিন্তান্বিত। পরদিন হাতে একগাদা বই। প্লেখানভ ও লেনিনের ওয়ার্কস। লেনিন শেষ

বয়সে শুধু কালচারাল বা সাংস্কৃতিক উন্নতির সম্বন্ধেই বলে গেছেন। বইয়ের লেখাগুলো আজও মনে পড়ছে। তিন দিনের মধ্যে পড়াশুনা করে কালচারাল লাইনের ওপরে একটি থিসিস লেখেন। পার্টির উচ্চতম থেকে স্থানীয় কমিটি পর্যন্ত সব জায়গায় থিসিসের কপি পেশ করা হয়। শেষ কপিটি দেওয়া হয়েছিল হেমাঙ্গদাকে। দিল্লি থেকে নিখিল চক্রবর্তী সেন্ট্রাল কমিটিকে পাঠানো থিসিসের প্রাপ্তিসংবাদ জানান। কিন্তু কোনও কমিটিই এই সম্বন্ধে কিছু করেননি। জানি না থিসিসটি কোথাও আছে কিনা।

ওই সময় পার্টির প্রচণ্ড বিরূপতার কথাও মনে পড়ে। 'নীচের মহল'-এর রিহার্সাল চলছে। হঠাৎ মামিমণি একদিন বলল, 'ঋত্বিকের সঙ্গে একদম মিশো না—ও শিগ্‌গিরই পার্টি থেকে expelled হয়ে যাবে।' খোঁজ নিয়ে জানা গেল একটি ওয়ান-ম্যান-কমিশন বসেছে। প্রমোদ দাশগুপ্ত মেম্বার। যতগুলো চার্জ ছিল, প্রতিটির উত্তর দেখার পর পার্টি কিছু করতে পারে না।

এরপরে আমাদের বাড়ির ছাদে, পার্টির সেল মিটিংয়ে বহু কমরেডের সামনে আমার সম্বন্ধে agenda রেখে বলা হয়, 'ঋত্বিকের সঙ্গে মিশলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।' আমার বক্তব্য ছিল, 'আদর্শ থেকে ব্যক্তি বড়ো নয়, কিন্তু চার্জ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত আমি কাজ করে যাব।' জ্যোতি বসু চিঠি পাঠান নাটকের রিহার্সাল চালিয়ে যেতে। কিন্তু চিঠিটি চেপে দেওয়া হয়। নাটকের রিহার্সাল বন্ধ হয়।

নাটকটি মঞ্চস্থ হলে গণনাট্য সংঘের ইতিহাসে নামটি উজ্জ্বল হয়ে থাকত। কালী ব্যানার্জি, উমানাথদা, মমতাজ আহমেদ, অমল কর, জ্ঞানেশ মুখার্জি প্রভৃতি অনেকেই অভিনয় করেছিলেন। আমি মানুষটির সঙ্গে সরল মনে মিশতাম, পড়াশোনা করতাম। পরদিন সমস্ত শুনে পরিষ্কার বক্তব্য : 'তোমাকে আমার মা ও দিদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। আমাদের বাড়ির পরিবেশ একেবারে অন্য রকম।' আমি সেদিন মাসিমণির আপত্তি সত্ত্বেও ওঁর সঙ্গে যাই। মা ও দিদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার পর রোজ বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে গিয়ে পড়াশোনা করতাম। উমানাথদাও আসতেন। মা'র সঙ্গেও প্রায় রোজই কিছুক্ষণ বসে কথাবার্তা বলতাম। এবং সাউথ

স্কোয়াড থেকে ট্রান্সফার নিয়ে সেন্ট্রাল স্কোয়াড বা অনুশীলন সম্প্রদায়ে চলে এলাম।

মমতাজ আহমেদ একটি ছেলের লেখা নাটক নিয়ে এসে বলেন রি-রাইট করে দিতে। তিনটি দৃশ্য রি-রাইট করে শেষ তিনটি দৃশ্য নিজেই লেখেন। এবং নাটকটির নাম দেন 'ইস্পাত'। 'ইস্পাত' নাটকের রিহার্সাল আরম্ভ হয়। রিহার্সাল থেকে বাড়ি ফেরার পথে হাঁটতে হাঁটতে অনেক কথা শুনতাম।

এম. এ. পরীক্ষা না দিয়ে বিমল রায়ের 'তথাপি'-তে প্রথম অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করার পর তারাশঙ্করের লেখা 'বেদেনী' বইটির শুটিং আরম্ভ করেন ঘাটশিলায়। টাকার অভাবে ছবিটি শেষ হয়নি। আর যতটুকু শুটিং হয়েছে বোধহয় লাইট বেশি এক্সপোজ করায় একেবারে ডার্ক হয়ে গেছে। একটি ছবিও বোঝা যায়নি। প্রভা দেবী, কালী ব্যানার্জি প্রভৃতি অভিনয় করেছিলেন। এবারে 'নাগরিক' করার সমস্ত ইতিহাস শুনি। কিন্তু ছবিটি মুক্তি পায়নি। আর শুনি 'জীয়নকন্যা'র কথা। বোধহয় বিজনবাবু নাটক করবার কথা ভেবেছিলেন। শুনতে শুনতে রোজ বাড়ি পৌঁছোতাম।

ইতিমধ্যে মমতাজও একদিন ঋত্বিক ঘটকের বিরুদ্ধে চার্জ আনেন—অনেকেই সমর্থন করেন। মিটিং থেকে বেরিয়ে হাজরা পার্কে সেদিন আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'লক্ষ্মী! তুমি কি আসবে?' আমি 'আসব' বলে চলে আসি। এবং সেদিনই প্রস্তাব করি—এই পার্টি ও আই. পি. টি এ.-র চার্জ কোনও কাজ করতে দেবে না—সুতরাং সমস্ত ছেড়ে 'গ্রুপ থিয়েটার' নাম দিয়ে গ্রুপ গঠন করে নাটক করতে। ইতিমধ্যে স্টানিস্লাভস্কির গ্রুপ অ্যাকটিংই যে ওঁর আদর্শ সেটা বুঝতে পেরেছিলাম।

২

'সাঁকো' নাটকটি লেখা আরম্ভ করেছিলেন, কয়েক দিনের মধ্যেই শেষ হয়। এক দাঙ্গার সময় এক সাগর মহাসীনকে বাঁচিয়েছিল। পরবর্তী দাঙ্গায় আর-এক সাগর মহসীনকে না বুঝে ধরিয়ে দেয়। সাগর পূর্ববাংলা দেখেনি। ভাটিয়ালি গান শোনেনি।... ছোট বোন থাকত ঢাকায়। হঠাৎ

লেটার-বক্সে একটি চিঠি দেখে মাথাটা কী রকম হয়ে যায়। মহসীনের কাছে ভাটিয়ালি গান শুনে নিজেও গাইছিল। সুরটা চড়িয়ে দেয়—গুন্ডারা সার্চ করতে এসে মহসীনকে ধরে নিয়ে যায়।

নাটকের প্রথম অঙ্ক শেষ হয়। সাগর মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। ভাই শঙ্কর বলছে, 'সিংহাসন গ্রাম—এর পরের বাঁকে কী?' দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে সাগর গেছে সিংহাসন গ্রামে মহসীনের মা-বাবার কাছে ক্ষমা চাইতে। সেদিন ছিল ঈদের দিন। মহসীনের মা-বাবা অপেক্ষা করছেন ওঁদের একমাত্র মেয়ে জবার (গুলসান বিবি) জন্য। এমন সময় সাগরদের আবির্ভাব।

সাগর নাম শুনেই তাঁরা ধরে নেন এ ওই সাগর যে মহসীনকে বাঁচিয়েছিল। সাগর কিছুতেই বলবার সুযোগ পায় না।...আর রোজ মা'র কাছে শুনত—

'নানান বরণ গাভীরে ভাই, একই বরণ দুধ;
ভুবন ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।'

নাটকটি আমাকে মুগ্ধ করে। রিহার্সাল আরম্ভ হয়। গ্রুপ থিয়েটারকে পার্টি স্বীকার করে। সেল গঠন করা হয়। আমি সেল সেক্রেটারি হই। বালিগঞ্জ লোকাল কমিটির সেক্রেটারি শচীন সেন ও জ্যোতি বসুর কথা মনে পড়ে। খুব চাইতেন ঋত্বিক ঘটক কাজ করুক। গ্রুপ থিয়েটারে সাউথ স্কোয়াড থেকে এসেছিল উমাপ্রসাদ মৈত্র, ওর নিজের স্কোয়াড থেকে শৈলেন ঘোষ। বাইরে থেকে বুলবুল (সতীন্দ্র ভট্টাচার্য), সনৎ ও কেষ্ট মুখার্জি।

আমার পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সমস্যা বৃদ্ধি পায়। মামা ও মামিমণির তখন খুব আর্থিক সংকট। মামার ব্যবসা ভালো চলছিল না। আমার মেসোমশাই খুব অসুস্থ। আমাদের ছোটবেলায় 'মাসপয়লা' কাগজের সম্পাদক ছিলেন। একমাত্র ছোটভাই বায়ো-কেমিস্ট্রিতে রিসার্চ করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়ে শিলং গিয়েছিল বিশ্রাম নিতে। বাবা অবসর নিয়েছেন। আমিও টাইপ-শর্টহ্যান্ড শিখতে শিখতে চাকরির চেষ্টা করছিলাম। মনটা ভালো ছিল না।

রিহার্সাল এগিয়ে চলে। জবার অভিনয় করেছিলাম। নাটকের কয়েকটি কথা—'জীবনটা বহতা নদী, পলি পড়ে বহুকাল ধরে, চর জাগে হঠাৎ পরে।' ওই সময় বিহার সরকারের কয়েকটি ডকুমেন্টারির কাজ পেয়ে বিহার চলে যান। বুলবুল রিহার্সাল পরিচালনা করত। রাজগীর থেকে চিঠি আসে।...ওই সময় থেকে শেষ পর্যন্ত সব চিঠিই গুছিয়ে রেখেছি। মনে পড়িয়ে দেয় একুশ বছরের জীবনকে-যে জীবনে ভালোবাসা, আনন্দ, দুঃখ, বেদনা যেন একই সঙ্গে বাজছে।

প্রথম আলাপ-পরিচয়ের পর আমার শিলং জেলে বসে লেখা তিনটি খাতা (পাগলি, গণিকা, চোর ও খুনি মেয়েদের সম্বন্ধে) পড়ে আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। সে চিঠি এখনও আছে। আর বার বার একটা কথা : 'খাতাগুলো গুছিয়ে লিখে ফেলো, ছাপাবার বন্দোবস্ত করব।' আমার প্রতি সে সময়কার অসীম স্নেহ-ভালোবাসার কথা ভুলব না। আর একটা অসহায় ও আঁকড়ে ধরার ভাব : 'লক্ষ্মী! তোমাকে পেলে জীবনটা গুছিয়ে আরম্ভ করব।' আমি কোনও সময়ই কিছু বলতাম না, চুপচাপ থাকতাম।

আমি সাধারণ মেয়ে! বিরাট অভিনেত্রী নই। শুধুমাত্র অভিনেত্রী হবার কোনও ইচ্ছেও ছিল না। সাইড লাইন হিসেবে অভিনয় করতাম। শোভাদি (শোভা সেন), গীতা (মৃণাল সেনের স্ত্রী), কেতকী (প্রভা দেবীর মেয়ে) এবং প্রভা দেবীর কথা ওঁর মুখেই শুনেছি।

কিন্তু মানুষটির অসাধারণ ব্রেন ও দার্শনিক গভীরতা আমি বুঝতাম। জীবনের হতাশা (প্রায়ই শুনতাম, আমি সুইসাইড করব, কারণ 'নাগরিক' মুক্তিলাভ করেনি), অর্থাভাব, ছন্নছাড়া বোহেমিয়ানিজ্‌ম ছিল। ভাবতাম সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা একাত্ম হয়ে পড়ি। এই সময় একদিন মৃণাল সেন ও গীতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

বিহার থেকে ফেরার পর নাটকটি রঙমহলে অভিনীত হয়। বাবাকে চিঠি লিখেছিলাম। নাটক শেষ হবার পরই বাবার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার জন্য আমাকে নিয়ে শিলং যান।...মার্চের ঝরাপাতার দিনে একদিন তরুণীমনে যে বিষণ্ণ বেদনা জেগেছিল, বাবার কাছে কিছুদিন ওই সময়

থেকে এত বছর পর সে বিষণ্ণতার অবসান হয়। বাবা '৫৫ সালের ৮ মে (২৪ বৈশাখ) শিলংয়ে আমাদের বিয়ে দেন।

বিয়ের পর মা'র (শাশুড়ি) স্নেহ-ভালোবাসার কথা জীবনে ভুলব না। কিন্তু বিয়ের আট মাস পরেই তিনি মারা যান। শ্বশুরমশাইকে দেখিনি, আমার বাবার কাছে শুনেছিলাম তিনি খুব সুপুরুষ, বিদ্বান, সুবক্তা ও ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। বহরমপুরে বড় ভাসুর শ্রীমণীশচন্দ্র ঘটকের বাড়িতে আমাদের বউভাত হয়। বড়দা ও বড়দি বহরমপুরে বাড়ি করে এখনও ওখানেই আছেন। বড়দা 'কল্লোল' যুগের লেখক। 'যুবনাশ্ব' নামে লিখতেন। শৌখীন ও রাবীন্দ্রিক চেহারা। দিদি, ভলিদি, মিলিদি ও ভবীর (তপতী, সম্প্রীতি, ব্রততী, প্রতীতি) এবং আমার জা-দের স্নেহ-ভালোবাসায় আমার জীবন পূর্ণ হয়।

বিয়ের তারিখ ঠিক হবার পরই বোম্বে থেকে সলিলদার টেলিগ্রাম এসেছিল ফিল্মিস্থান স্টুডিয়োতে চাকরির ইন্টারভিউয়ের জন্য। বিয়ের পরই বোম্বে চলে যান। ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি হয়। মা'র বয়স হলেও তিনি ছেলের সঙ্গে আমাকে বোম্বে পাঠিয়ে দেন।

বোম্বেতে ফিল্মিস্থান স্টুডিয়োতে গল্প ও চিত্রনাট্যকার হিসেবে কয়মাস চাকরি করার পরই চাকরি ছেড়ে দেন। চাকরির মাইনে সামান্য ছিল। শশধর মুখার্জি স্নেহ করতেন।

বোম্বে যাবার পর কলকাতা-জেলা সম্পাদকের কাছ থেকে চিঠি আসে : পার্টি মেম্বারশিপ রোলে ঋত্বিক ঘটকের নামটা ভুল করে ঢুকে পড়েছিল, ওটা ড্রপ করা হল। বিমল রায়ের জন্য 'মধুমতী'র চিত্রনাট্য ও পরে হৃষিদার (হৃষিকেশ মুখার্জি) প্রথম বই 'মুসাফির'-এর চিত্রনাট্য লেখা শুরু করেন।

বোম্বেতে প্রথম নাটক করেছিলেন 'বিসর্জন'। নিজে রঘুপতি, অনীশ ও গীতা (অনীশ ও গীতা ঘটক) এবং সীতাদিও (সীতা মুখার্জি) অভিনয় করেছিলেন। নাটকটির বলিষ্ঠ পরিচালনা নাটকের বক্তব্যকে একটা গভীর ও উচ্চ মানবিক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। রঘুপতির 'এ মন্দিরে দেবী নাই' এবং অপর্ণার 'পিতা চলে এসো, পিতা চলে এসো' অনুরণন তুলেছিল

দর্শকদের মনে। সেটে একটি কালীমূর্তি ও বলির কাঠগড়া ছিল। এরপর আই. পি. টি. এ. থেকে 'মুসাফিরো কে লিয়ে'। অনেকগুলো গল্প ও চিত্রনাট্য ওই সময়কার লেখা।

আমাদের বড় মেয়েটির জন্ম হয়। ছোট ভাসুর (শ্রীলোকেশচন্দ্র ঘটক) ভীষণ ড্রিঙ্ক করতেন। জাহাজের চিফ অফিসার ছিলেন। ভালো লিখতেন ও আঁকতেন। ছোড়দাকে বোম্বে নিয়ে আসেন।

মেজো ভাসুর শ্রীসুধীশচন্দ্র ঘটকেরও ফিল্ম ডিভিশনের চাকরি (প্রথমে আসাম ও পরে নাগপুরে ইনচার্জ ছিলেন) তখন শেষ হয় এবং বোম্বে আসেন। তিনি দেবতুল্য লোক ছিলেন। ক্যামেরাম্যান হিসেবে খুবই নাম ছিল। কয়েকটি বই পরিচালনা করেছিলেন। বিলেত থেকে ক্যামেরা ও প্রথম টেলিভিশনের কাজ শিখে এসেছিলেন।

কলকাতায় সেজদার চাকরির অবস্থাও তখন ভালো ছিল না। আমরা বড় মেয়েটিকে নিয়ে' ৫৭ সালে কলকাতা চলে আসি।

৩

কলকাতায় আসার পর প্রথমে বি. এন. সরকারের 'নতুন ফসল' বইটি করবার কথা ছিল। কিন্তু তখন টাকা ছিল না। শিবশঙ্কর মিত্রের 'সুন্দরবনের আর্জান সর্দার' বইটি করবারও আলোচনা হচ্ছিল। এই সময় 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' বইটির চিত্রনাট্য বিমল রায়ের জন্য লেখেন।

পরে প্রমোদদা (শ্রীপ্রমোদ লাহিড়ী) 'অযান্ত্রিক' আরম্ভ করান। রাঁচিতে শুটিং আরম্ভ হয়। আমাদের ছোট মেয়েটির জন্ম হয়। একমাস পরে দুই মেয়ে সহ আমাকে নিয়ে যান।

অনেক দূরে দূরে লোকেশন। সারা দিন কাজ করার পর সবাই ক্লান্ত। একটু করে বিয়ার খাওয়া তখন শুরু হয়। একটু খেলে কিছু হবে না— এই ভাবেই শুরু।

একটানা শুটিংয়ের পর প্রশান্তদা (শ্রীপ্রশান্ত লাহিড়ী) এসে সমস্ত ধারদেনা শোধ করে নেতারহাট বেড়াতে নিয়ে যান। ফিরে আসার পর এডিটিং চলছে। হঠাৎ রিলিজের তারিখ ঠিক হয়ে যায়। একটানা আঠারো দিন রাতদিন জেগে বই শেষ হয়। পরিশ্রম করবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

'নাগরিক দেখে সত্যজিৎ রায় অনেক পরে একদিন বলেছিলেন : 'ঋত্বিকবাবু! বইটা সময়মতো রিলিজ হলে আপনিই পথিকৃৎ হতেন।' সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' ফিল্মের জগতে যে নতুন যাত্রাপথের শুরু করে সেখানে এসে হাত মেলায় 'অযান্ত্রিক'। দু'জন পরিচালক ফিল্মের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। পথিকৃৎ না হলেও ঋত্বিক ঘটকের নাম '৫৮ সালে ফিল্মের জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কিন্তু ছবি ব্যবসায়িক দিক থেকে সফল হয়নি! প্রচণ্ড হতাশা। ড্রিঙ্ক বাড়ে।

সেই সময় প্রমোদদা ও প্রশান্তদার বাড়িতে একটা ফ্ল্যাট পেয়ে আমরা দু'-তিন মাস ছিলাম। প্রমোদদা ও প্রশান্তদা এবং তাঁদের স্ত্রীরা (দুই বোন) দেবী ও দিদিভাই (নিজের ভাই না থাকায়) তাঁদের ঋত্বিককে নিজেদের ভাইয়ের মতো স্নেহ করতেন।

কোনও কাজ হয় না। আমি দুই মেয়েকে নিয়ে বাবার কাছে যাই। কিছু দিন পর 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' ও 'কত অজানারে' এই দুটি ছবির কন্ট্রাক্ট হয়। ভবানীপুরে বাসা ভাড়া করেন। কলকাতায় এসে একবার 'সাঁকো' করেছিলেন। এরপরে বনফুলের লেখা 'বিদ্যাসাগরে'র রিহার্সাল শুরু হয়। দিনেরবেলা শুটিং সন্ধ্যার সময় রিহার্সাল। বোম্বেতেও এই ছিল নেশা। গীতাদি (গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়) 'স্ত্রীর পত্র'র নাট্যরূপ লিখে একদিন দেখাতে নিয়ে আসেন। পরে বলেন—'ঋত্বিক! তুমিই পরিচালনা করো।' 'বিদ্যাসাগর'-এর রিহার্সাল বন্ধ হয়। 'স্ত্রীর পত্র'র রিহার্সাল আরম্ভ হয়। গীতাদির গ্রুপ ও আমাদের 'গ্রুপ থিয়েটার' এক হয়ে 'গ্রুপ থিয়েটার' নামই ধারণ করে। 'স্ত্রীর পত্র' মঞ্চস্থ হয়। দীর্ঘদিনের মতো নাটক করা এখানেই শেষ। গীতাদি 'গ্রুপ থিয়েটারে'র ব্যানারে নাটক এখনও করে যাচ্ছেন।

'বাড়ি থেকে পালিয়ে'র শুটিং শেষ হয়েছে। 'কত অজানারে'র শুটিং চলছে। 'কত অজানারে' বইটি শংকরের লেখা। কালী ব্যানার্জি 'বারওয়েল' সাহেবের পার্টে, অনিল চ্যাটার্জি শংকরের, ছবি বিশ্বাস আর-একজন ব্যারিস্টারের এবং অসীমকুমার, গীতা দে, করুণাদি (করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রভৃতি অভিনয় করেছিলেন। সমস্ত শুটিং শেষ, শুধু কোর্টের দৃশ্যটা বাকি

ছিল। প্রডিউসার মিহির লাহা ছবিটির কাজ বন্ধ করে দেন। এটা একটা বজ্রাঘাত! অনেক স্টিল আমার কাছে আছে। 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'ও '৫৯ সালে ব্যবসায়িক দিক থেকে সাফল্য লাভ করেনি।

ড্রিঙ্কের মাত্রা বাড়ে।

অনেক চেষ্টার পর নিজে প্রযোজক হিসেবে 'মেঘে ঢাকা তারা' বইটির শুটিং আরম্ভ করেন প্রথমে শিলংয়ে। আমি ওই বছরই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. ক্লাসে ভরতি হই। দুটি মেয়ে সহ শিলং যাই। সুপ্রিয়া বিশুবাবু ও মহেন্দ্র গুপ্ত (ডিস্ট্রিবিউটর) ছাড়া সবাই আমার বাবার বাড়িতেই ছিলেন।

ফিরে আসার পর গীতা (ঘটক) আসে অভিনয়ের জন্য ওর মেয়েকে নিয়ে। শুটিংয়ের তিন মাস আমাদের বাসায়ই ছিল। ইউনিটের ছেলেরাও ভোরে শুটিং থাকলে আমাদের বাসায়ই শুয়ে থাকত। শেষরাত্রে সবাই বেরিয়ে পড়তাম একসঙ্গে। স্টুডিয়োতেও শুটিং চলত একটানা—সবাই মিলে ছিল যেন একটি পরিবার। বেণু (সুপ্রিয়া) খুব খেটেছিল। আমাদের ছোট বোনের মতো ছিল।

'মেঘে ঢাকা তারা' '৬০ সালে মুক্তি পায়। ভীষণভাবে সকলের মনে দাগ কাটে। আমি তখন পঞ্চম বর্ষ থেকে ষষ্ঠ বর্ষে উঠেছি। ক্লাসের বন্ধুরা এসে জড়িয়ে ধরে। শ্রদ্ধেয় বিষ্ণু দে, প্রণতিদি, বৌধায়নবাবু ও অশোক সেনের সঙ্গে এই সময়ই হৃদ্যতা হয়। নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিনিকেতনে চলে যাবার পর কলকাতা এলেই দেখা করতে আসতেন। বিশেষ বন্ধুদের মধ্যে খালেদ চৌধুরী, কবি সিদ্ধেশ্বর সেন প্রভৃতির কথা মনে পড়ে।

'স্বরলিপি' বইটির গল্প ও চিত্রনাট্য এই বছরেই লেখেন। ছোটো দুই মেয়েকে নিয়ে আমরা পুরী ও কোণারকের মন্দির, ভুবনেশ্বরে উদয়গিরি খণ্ডগিরি বেড়াতে যাই। ভুবনেশ্বরে একটি মন্দিরের চত্বরে বসে অনেক কথা হয়েছিল।...

'কোমল গান্ধার' নিজে প্রডিউসার হিসাবে শুটিং আরম্ভ করেন। বোলপুরে খোয়াইয়ের দৃশ্য ('আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে'), লালগোলায় পদ্মার দৃশ্য (নদীর ওই পার দেখিয়ে নায়কের অঙ্গুলি নির্দেশ—

'ওটা অন্য দেশ'), কার্শিয়াং ও দার্জিলিংয়ে পাহাড়ের দৃশ্য ('আকাশভরা সূর্য তারা' গান) ভীষণ মনে পড়ে। বইটিতে ছিল আমার বাপের বাড়ির দেশের (সিলেটের) লোকসংগীত ও আই পি. টি. এ.-র 'নবজীবনের গান'।

তখনও সবাই মিলে একই পরিবার। শুটিং করতে করতে শেষের দিকে ড্রিঙ্কের মাত্রা বাড়ে। আমি পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। বইটি মুক্তি পায় '৬১ সালে। ক্লাসের বন্ধুরা এসে বলে: 'ছবিটা কিছু হয়নি।' 'স্বাধীনতা'য় বিরূপ সমালোচনা বেরোয়। হলের মধ্যে 'বোরিং' এই শব্দ শোনা যায়। ছবিটি সুপার-ফ্লপ হয়।

অসাধারণ খাটনি ও মানসিক চিন্তার এই ফল। ছবিটি বোধহয় এপিক ধরনেরও। অজিত লাহিড়ী ও পীযুষ গাঙ্গুলি প্রভৃতি এই সময় ইউনিট পরিত্যাগ করে চলে যান। বাংলা মদ খেয়ে পড়ে-থাকা আরম্ভ হয়। এই চেহারা কোনও দিন দেখিনি। পরীক্ষা সামনে। গাড়ি বিক্রি করে ড্রাইভারকে ছাড়িয়ে দিই। লোকটি ভালো ছিল। আমাকে মা ডাকত। এইবারও এসে দেখা করেছে। কাজের লোক একজন দেশে ও একজন কাজ ছেড়ে চলে যায়। তবু চেষ্টা করি। চারটি পেপার দিয়ে, ফিফ্‌থ পেপারের দিন দুটি মেয়ের অসুখ এবং কোনও নোট বা বই ছিল না। দশটা পর্যন্ত পড়ে জিজ্ঞেস করি, কী করব? বলেন : ড্রপ করো। নির্বোধের মতো পরীক্ষা ড্রপ করি।

...বছরের শেষে বোম্বেতে একটি কাজ ঠিক হয়। একটি ইনস্টলমেন্ট দেবার পর হঠাৎ রজনী প্যাটেল বোম্বেতে বলেন বইটি করবেন না। রাতদিন ড্রিঙ্ক। এই সময় রাধেশ্যাম ঝুনঝুনওয়ালা দেখা করে কথাবার্তা বলে 'সুবর্ণরেখা' আরম্ভ করান।

'৬২ সালে আমরা চাকুলিয়া যাই। একটানা এক মাস শুটিং করে প্রায় বই শেষ হয়। ফিরে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ করি। পরীক্ষা দেবার অনুমতি পাই। কিন্তু পরীক্ষা দেবার মতো কোনও অবস্থা ছিল না। আমার জীবনে এম. এ. ডিগ্রিটা লাভ করা হয়নি। এই বছরটিই শেষ। এর পরে অন্য জীবনের শুরু।...

'সুবর্ণরেখা'র কাজ অল্প বাকি ছিল। প্রডিউসার চলে গেছেন। তখন 'সিজার' নামে একটি পাবলিসিটি শর্ট করে ওই টাকা দিয়ে ছবিটি শেষ করেন। কিছু দিন পরে জানা যায় ছবিটা রাজশ্রী পিকচার্সে বাঁধা দিয়ে প্রডিউসার টাকা নিয়ে চলে গেছেন। ছবিটি মুক্তিলাভ করে না।

৪

ড্রিঙ্ক, ড্রিঙ্ক। এবং ড্রিঙ্ক। হরিসাধন দাশগুপ্ত '৬৩ সালের প্রথমে আসেন আলাউদ্দিন খাঁ-র ওপর ডকুমেন্টারি করাবার জন্য। গাড়ি করে মাইহার যাবার পথে সমস্ত রাস্তা ড্রিঙ্ক। গায়ে র‍্যাশ বেরোয়।...সেইবার ছিল আলাউদ্দিন খাঁ'র শতবর্ষ পূর্তির বছর। মাইহারে সবাই তাঁকে বাবা ডাকে। দিল্লি থেকে অনেকে আসেন বাবাকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য। বাবা মাইহার ব্যান্ড বাজান। আলী আকবর খাঁ, রবিশংকর, চতুর আলী প্রভৃতি অনেকে এসেছিলেন। রাত্রে সবাই ড্রিঙ্ক করেন। কিন্তু যা রোগ—'কিছু হয়নি আরও চাই' বলায় হরিসাধনবাবু রেগে চলে আসেন। কাজ হবে না মনে হয়। কিন্তু অবশেষে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ শেষ করেন। বাবার প্রতিটি মুড বুঝে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবের শট্ নেওয়া হয়।

এর আগে বাহাদুর খাঁ'র কাছে সরোদ শিখতে আরম্ভ করেছিলেন। ভাতখণ্ডের রাগরাগিণীর বই গভীরভাবে পড়াশোনা করা ছিল। বাঁশি বাজাবারও শখ ছিল। সংগীত সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান থাকায় বাবার জীবন নিয়ে একটি অনবদ্য সৃষ্টি হয়। অপেক্ষা করি কবে বইটি পরদায় দেখব। মনে পড়ে অন্নপূর্ণাদিদির কথা। আমাদের সবার অনুরোধে তিনি বীণা বাজান। নিজের ছেলেকে শিক্ষা দেওয়া ছাড়া জনসমক্ষে একেবারেই বাজান না। আসবার আগে বাবা আমাকে বার বার বলেন, 'তোর এবার ছেলে হবে।' মাইহারের স্মৃতি চিরদিন মনে থাকবে।

ফিরে আসার পর হরিসাধনবাবু একটি চিঠি পাঠান, 'আপনার সঙ্গে আমার temperament-এ মিলবে না। তাই আর একসঙ্গে কাজ করব না।' আমরা স্তম্ভিত হই। কিছু দিন পর হরিসাধনবাবু নিজের নামে ছবিটি বের করেন। একটি অনবদ্য সৃষ্টি ও প্রায় সব শট্ ঋত্বিক ঘটকের ব্রেনেই

থেকে যায়। কারণ সাউন্ড ছাড়াই শুটিং করতেন। এডিটিং ও ডাবিংয়ের সময় সব সঠিক রূপ পেত।

আর-একটি বিরাট সৃষ্টির সুযোগও এই সময় নষ্ট হয়। ছবিটি 'আরণ্যক'। এককালে 'আরণ্যক' পড়তে পড়তে প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখতাম। তিনি 'লক্ষ্মীমা!' ও 'আশীর্বাদক তোমার কাকাবাবু' লিখে উত্তর দিতেন।

সেই 'আরণ্যক'-এর সিনোপসিস লেখা হয়। দীর্ঘ সময় লাগবে ছবিটি করতে। কারণ বিভিন্ন ঋতুর শট্ নেবার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। হাজার টাকা জমা দেওয়া হয়। উকিলের টাকাও পাঠানো হয়। মন্ত্রী জগন্নাথ কোলে দাঁড়ান গ্যারান্টার, কিন্তু মিনিস্ট্রি বদলে যায়। গ্যারান্টারের অভাবে দরখাস্ত মঞ্জুর হয় না।

'৬৩ সালের শেষে আমার ছেলের জন্ম হয়। আমার শরীর ভালো ছিল না। আমার ভাই ছেলের জন্মের আগে আমাকে এসে মাইশোর নিয়ে গিয়েছিল ও পরে বাবার সঙ্গে পাঠিয়েছিল। ভাই ক্ষীরোদ মাইশোর সি. এফ. টি. আর. আইতে কাজ করে। ও বায়ো-কেমিস্ট্রিতে রিসার্চ করে ডি. এস্. সি. ডিগ্রি পেয়েছে।

ছেলে হবার আগে বার বার একটি কথাই শুনেছি, 'লক্ষ্মী! তোমার ছেলেই হবে। এবং ছেলে হলেই আমার মাথা ঠিক হয়ে যাবে।' কিন্তু '৬৪ সাল থেকে আরম্ভ হয় অ্যালকোহলিক ইনস্যানিটি। রাত দশটার সময় একদিন মহেন্দ্রকে দিয়ে ভাইকে টেলিগ্রাম করি। ভাই এসে বোঝায় নার্সিং হোমে ভরতি হওয়াই ভালো। প্রথমে রাজি হলেও, পরে 'কাজ পেলেই আমার মাথা ঠিক হয়ে যাবে' এই এক কথা।

ওই বছর প্রথমে একটি ভোজপুরি গল্প ডিস্ট্রিবিউটরের অভাবে এবং পরে নিজের লেখা একটি গল্প 'বগলার বঙ্গদর্শন'ও একটি সেটের শুটিং করে একই কারণে শেষ করা সম্ভব হয়নি। প্রডিউসার ছিলেন রমন মহেশ্বরী। মাঝে মাঝে পুণা গভর্ণমেণ্ট ফিল্ম ইনস্টিটিউটে-এ লেকচার দেবার জন্য ডাকত।

'৬৫ সালের প্রথমে শুরু হয় চোলাই মদ, স্নানখাওয়া বন্ধ। অস্বাভাবিকতার চূড়ান্ত। একবার করে যাওয়া, একবার করে আসা। তিনটি

ছেলেমেয়ে ও এই অস্বাভাবিকতার মধ্যে দিশেহারা ও অসুস্থ হয়ে পড়ি।...পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে ভাইস-প্রিন্সিপ্যালের চাকরির খবর আসে। আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাবার কাছে চলে যাই। মনে পড়ে একটি চিঠি ও টেলিগ্রামের কথা। তখনও চাকরি হয়নি। দুটোই পুণা থেকে পেয়েছিলাম। চিঠিটাতে লেখা ছিল : 'আমার volatile character-এর জন্য এইরকম করি।' আর টেলিগ্রামটা ছিল এই :

'It is always darkest before dawn. Mother is blessed when divine son comes. Plus two perfectly lucifer like daughters are there. It is ample compensation, Love—Ritwik.'

'৬৫ সাল থেকে আমার জীবন এই ক্ষতিপূরণের দিকেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। কারণ ওই অস্বাভাবিকতা আর স্বাভাবিক হয়নি। এ ইতিহাস বড় করুণ, বড় বেদনাদায়ক।

৫

শিলংয়ে আমি পাঁচ-ছয় মাস থাকতে বাধ্য হই, কারণ পুণা থেকে প্রায়ই অস্বাভাবিকতম অবস্থায় শিলং আসতেন। ছেলের জন্মের পর থেকেই আমার শরীর খারাপ চলছিল, এই সময় নার্ভাস শক, মাথা ঘোরানো, প্যালপিটেশন ইত্যাদিতে একটা দুঃস্বপ্ন গেছে। ডাক্তাররা কিছু করতে পারেননি। শেষে আমার নিজের জ্যাঠামশাই দীর্ঘ দিন চিকিৎসা করে আমাকে সুস্থ করে তোলেন। পাঁচ মাস পর পুণার চাকরি ছেড়ে শিলং এসে বাবাকে বলেন, আমাকে নিয়ে যাবেন, হাজার টাকা দিতে। ওই সময় একটানা সতেরো ঘণ্টা বসে 'পণ্ডিতমশাই' নামক গল্পটি লিখে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। হ্যালিউসিনেশন ও ডেলিরিয়ম চলে দু'দিন। জ্যাঠামশাই সুস্থ করেন।

কলকাতায় আসার পর স্বাভাবিক হবার কোনও আশা না দেখে ভাইকে চিঠি লিখি। এদিকে শ্বশুরবাড়িও যাই। ওখানে বলা হয়, 'তুমি চলে যাও, তোমার জন্য কেউ কিছু করবে না।' চলে আসি। ওই সময় থেকে গত দশ বছর পূর্বের স্নেহ-ভালোবাসা একটা স্মৃতি।

ভাই আসে। আবার অজ্ঞান। ডাক্তার বলেন হাসপাতালে ভরতি করতে। ভাই ভরতি করায়। হাসপাতালে ড্রিঙ্ক ছাড়া ভালোই থাকেন। ওই সময় কালী ব্যানার্জি এসে বলেন চিকিৎসার খরচ দেবেন। হাসপাতালে দশ দিন ছিলেন। বেরিয়ে ভাই চলে যাবার পরই আবার শুরু।

আমার মামামণি লুম্বিনীর সুপারিনটেনডেন্টকে নিয়ে আসেন। ডাক্তার দেখে বলেন ইনফ্যান্টাইল এবং ডবল পার্সোনালিটি। চিকিৎসা চলে। হরিসাধন দাশগুপ্ত এসে একটা ডকুমেন্টারির স্ক্রিপ্ট লেখান। এই সময় থেকে হরিসাধনবাবু ঋত্বিকবাবুর বিশেষ বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী।

অসিত চৌধুরী আসেন। একটি স্ক্রিপ্ট লেখান। উত্তমকুমার 'বনপলাশীর পদাবলী' করাবার জন্য আসেন ও কিছু টাকাও দেন। হেমেন গাঙ্গুলি 'চতুরঙ্গ' এবং তারাচাঁদ বারজাতীয়া অন্য একটি গল্প করাবেন বলেন। কিন্তু কিছুই করেন না। কয়েকটি ডকুমেন্টারি করবার সুযোগ আসে। তাও না করায় আমি '৬৭ সালে আমার মাসিমার কাছে চলে যাই।

চাকরির চেষ্টা শুরু করেছিলাম। লাইব্রেরিয়ানশিপ পড়বার জন্য অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়ে পাস করি। কিন্তু ইন্টারভিউ কমিটি সিট দেন না। বলেন, 'আপনার চাকরির কী দরকার?' কিন্তু চাকরি তো আমাকে করতেই হবে। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা একদিনের জন্যও বন্ধ করিনি।

দু'মাস পর হঠাৎ একদিন সেজদাও ভলিদিকে নিয়ে হাজির। গিয়ে শেষ দেখতে। শেষ দেখার কিছু নেই, তবে ডায়সেশন স্কুলের প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা করায় উনি বলেন মেয়েরা পড়া চালিয়ে যেতে পারবে। সূর্য উঠেছে, সূর্য অস্ত গেছে,—ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানো, বাজার-রেশনের ব্যবস্থা করা ও চাকরির চেষ্টা করা—এ ছাড়া পৃথিবী সম্বন্ধে কিছু জানতাম না।

একটা ডকুমেন্টারি করেন 'Scientists of Tomorrow'। আমি দেখিনি। '৬৮ সালে বিহারীলাল কলেজে পি. জি. ডিপ্লোমা ইনহোম সায়েন্সে ভরতি হই। এই সময় 'অভিনয় দর্পণ'-এর সম্পাদক ছিলেন উনি। 'রঙের গোলাম' নামে একটি গল্পের একটি সিকোয়েন্সের শুটিংয়ে পর আর হয়নি।

'৬৯ সালে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে পাস করি। এবং ডাক্তারবাবু বলায় ওঁকে মেন্টাল হসপিটালে ভরতি করি। জ্যোতি বসুর কাছে দরখাস্ত নিয়ে যাই। চার দিনের মধ্যে হেল্‌থ সার্ভিস থেকে গোবরা মেন্টাল হসপিটালে সিট হয়। ডাঃ ব্যানার্জির কথা ভুলব না। ইংল্যান্ডে দশ বছরের কনসালটেন্ট সাইকিয়াট্রিস্ট ছিলেন। আমার মাথার যন্ত্রণার জন্য আমাকেও আউটডোর পেশেন্ট করে ওষুধ দিতেন। হেমাঙ্গদা ও বউদি এই সময় রোজ খাবার পাঠাতেন। ভালো হবার পর হাসপাতালে বসে 'সেই মেয়ে' নাটক লেখেন ও 'কুমারসম্ভব'-এর অষ্টম সর্গ অনুবাদ করেন। 'সেই মেয়ে' নাটকটি হাসপাতালে অভিনয় করান, নিজেও অভিনয় করেন।

'কুমারসম্ভব'-এর অষ্টম সর্গ পরে রাজকুমার মৈত্রকে দিয়েছিলেন। '৭০ সালের প্রথমে 'পদ্মশ্রী' পাবার খবর আসে। ডাক্তারবাবু রাইটার্স বিল্ডিংয়ে গিয়ে জ্যোতি ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বলেন যে ডকুমেন্টারি করে পেশ করলেই চল্লিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করবেন। দীর্ঘ সাত মাস হাসপাতালে থাকার সময়ে বাবা ও ভাই টাকা পাঠিয়েছেন। অসিত চৌধুরীও এসেছিলেন।

প্রডিউসার হিসেবে সুশীল করণ আসেন। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে 'পুরুলিয়ার ছৌনৃত্য' করার পর টাকা মঞ্জুর হয়। সুশীল করণ আমাকে কিছু টাকা দেন। এরপর 'আমার লেনিন' করেন। ছবিটি আমি দেখিনি। আবার ড্রিঙ্ক শুরু। ছবিটা রিলিজ হয়নি। সুশীল করণ কোনও টাকাও দেননি।

৬

আমি সাঁইথিয়ায় একটা গার্লস হাই স্কুলে স্থায়ী চাকরি পেয়ে প্রথম ছেলেকে নিয়ে এসে কাজে যোগদান করি। বাবা এসে দুই মেয়ে ও জামাইকে দেখাশোনা করেছিলেন। বাবা না-আসা পর্যন্ত বাড়িওয়ালা মাসিমা ও বাপের বাড়ির আত্মীয়স্বজনরা দেখাশোনা করেছেন। '৭১ সালের পয়লা জানুয়ারি দুই মেয়েকেও এসে নিয়ে যাই। আমাদের বারো বছরের সংসার তুলে ও জীবনের একটি অধ্যায়ে যবনিকা ফেলে আমি চলে আসি। সেদিন ছিল

উৎসবমুখর কলকাতা। মনে পড়ছিল মা রোজ 'গীতাঞ্জলি' পড়ে শোনাতেন—

পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে
মনে ভেবে মরি কী জানি কী হবে,
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন
সে কথা যে ভুলে যাই—
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।

বাড়িওয়ালা রায়বাহাদুর রমেশচন্দ্র দে, মাসিমা ও পরিবারের সকলের কথা চিরদিন মনে থাকবে। মাসিমা বলেছিলেন, 'আমার ঘরের লক্ষ্মী চলে যাচ্ছে। আমার দুঃসময়ে বহরমপুর থেকে বড়দি সর্বদাই আমার ঘরের খোঁজখবর করেছেন। মহাশ্বেতাও আমার বাসায় সর্বদা আসত।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পরে বোম্বেতে বিশ্বজিতের সঙ্গে যোগাযোগ করে 'দুর্বার গতি পদ্মা' করেন। আমি দেখিনি।

এরপরে 'যুক্তি-তক্কো-গপ্পো'র স্ক্রিপ্টা শোনাতে আসেন। আমি চাকরিতে যোগদান করার পর 'Communal Harmony' নামে একটি ডকুমেন্টারি করিয়েছিলেন দীপঙ্কর বড়ুয়া ও রণেন চৌধুরী। রিলিজ হয়নি। ছবিটি আমি দেখিনি। 'যুক্তি-তক্কো-গপ্পো'র প্রডিউসার হিসেবে আমার নাম রাখেন। পার্টনার দীপঙ্কর বড়ুয়া।

ইতিমধ্যে বরুণ বক্সী নিজের বাড়িতে কিছু দিন রেখে সুস্থ করলে বাংলাদেশে কাজের যোগাযোগটি হয়।

'তিতাস একটি নদীর নাম' আরম্ভ হয়।

দুটি ছবি একসঙ্গে আরম্ভ করায় প্রচণ্ড খাটনি পড়ে। '৭২ সালের শেষে 'যুক্তি-তক্কো-গপ্পো' গলায় টিউমার নিয়ে শুটিং, অভিনয় ইত্যাদি করেন। শুটিংয়ের ব্যবস্থা ও অনেক সময় অনেক কিছু নিজেকে করতে হত।

বোম্বে থেকে এফ. এফ. সি. টাকা পাঠালে দীপঙ্কর বড়ুয়া প্রথমে আমার সই ও পরে নিজে সই করে সমস্ত টাকা ঘরে তুলতেন। একটি

পয়সা আমাকে স্পর্শ করতে দেননি। ওঁদের ঋত্বিকদার জন্য কোনও দিন গলার টিউমারের জন্য এক গ্লাস দুধ, বা একটি বিছানা বা কোনও কিছুর ব্যবস্থা করতেও দেখিনি। অনেক সময় ল্যাবরেটরিতে ক্যান মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকতেন। ছুটির সময় কলকাতায় এলে আমি মহেন্দ্রর বাসায় থাকতাম ও যতটুকু সম্ভব দেখাশোনা করতাম। মহেন্দ্রও করত। ছুটি শেষ হলে চলে আসি। এর পরেই বাংলাদেশে গিয়ে অজ্ঞান। হাসপাতাল থেকে চিঠি পাই। কয়দিন পরেই লাঠি হাতে সাঁইথিয়া। অসুস্থতার জন্য লাঠি নিয়ে হাঁটতেন।

'৭৩ সালের মার্চের প্রথমে আবার সাঁইথিয়া আসেন ১০৩ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে। ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করি। প্রডিউসারকে টেলিগ্রাম করব ভাবি। কিন্তু ভীষণ আপত্তি—'না গেলে ভাববে ঋত্বিক ঘটক কাজ শেষ করে না।'

যাবার পর কোনও খবর নেই। চিঠি লিখি, টেলিগ্রাম করি। এপ্রিলের শেষে রাত দুটোর সময় মৃণাল সেনের ট্রাংক-কল আসে : 'ঢাকা থেকে খবর এসেছে খুবই খারাপ অবস্থা। ভোরের ট্রেনেই যেন ছেলেকে নিয়ে যাই।'

ছেলেকে ও মহেন্দ্রকে নিয়ে ঢাকা যাই। মৃণাল সেন আগেই চলে গিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় ঢাকা থেকে কলকাতায় হেলিকপ্টারে করে দু'জন ডাক্তার সহ আনবার ব্যবস্থা করেন। পয়লা মে মেডিকেল কলেজে ভরতি করা হয়।

বাংলাদেশের প্রডিউসার লিখিয়ে নিয়েছিলেন 'তিতাস একটি নদীর নাম' এডিটিং নিজেরা শেষ করে ছবিটি রিলিজ করবেন। ১০৩ থেকে ১০৫ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে শুটিং শেষ করেছিলেন, এডিটিং তখনও শেষ করতে পারেননি। প্রডিউসার হাবিবুর রহমান প্রাপ্য টাকাও সব দেননি।

মেডিকেল কলেজে কেবিন ছিল না। নার্স, অ্যাটেন্ডেন্ট রাখতে হয়েছিল, খাবারের ব্যবস্থাও আমাকে করতে হত। তাই করে আমি ও মহেন্দ্র টি. আর. এ. চেস্ট হসপিটালে ভরতি করি।

দীপঙ্কর বড়ুয়া, হাবিবুর রহমান ও সুশীল করণ ('আমার লেনিন'

তখন মস্কোতে বিক্রি হয়েছে) কোনও টাকা না দেওয়ায় আমি তখন দিশেহারা হয়ে পড়ি। আমার হাজার টাকা শেষ হবার পর, উত্তমকুমার 'শিল্পী সংসদ' থেকে হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে চিঠি লিখি। চার মাস পর হাসপাতালে দুই হাজার টাকা পাঠান।

হাসপাতালে চিকিৎসা ও যত্নে ভয়াবহ অসুস্থতা কমে ক্রমশই সুস্থ হয়ে ওঠেন। আমার দুলুমাসি (ডাঃ অরুণা ব্যানার্জি) খুবই দেখাশোনা করতেন। তা ছাড়া সেক্রেটারি, আর. এম. ও. প্রভৃতি তো ছিলেনই।

ডিসেম্বর শেষে হঠাৎ হাসপাতালে সাত দিনের জন্য রিস্ক বন্ড সই করে সিরাজ ও ভোলাবাবুর সঙ্গে বোম্বে যান। বোম্বের কাজ শেষ হলে পুণা গিয়ে অবিরাম ড্রিঙ্ক করে আবার অজ্ঞান! ওখান থেকে মৃণাল সেনের কাছে ট্রাঙ্ক-কল আসে আমাকে ও মহেন্দ্রকে যাবার জন্য। এর পরই টেলিগ্রাম—একটু ভালো।

'৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে পুণা থেকে লাঠি হাতে সাঁইথিয়া। হাসপাতালে আর পাঠানো সম্ভব হয়নি। মহেন্দ্র এরপর ওর কাছে থেকে রেখে সুস্থ করে ও 'যুক্তি-তক্কো-গপ্পো'র শুটিং ও কাজ শেষ হয়। দীপঙ্কর বড়ুয়াকে এফ. এফ. সি. আঠাশ হাজার টাকা দেওয়ায় পার্টনারশিপ ডিসল্‌ভ হয়।

আমি ফেব্রুয়ারি মাসে পুড়ে গিয়ে তিন মাস শয্যাশায়ী ছিলাম। আমাকে টাকা পাঠান ও পরে দেখতে আসেন। ছেলেটিকে নিয়ে গিয়ে শান্তিনিকেতনে ভরতি করেন। বড় মেয়েকেও হায়ার সেকেন্ডারি পাস করার পর কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কলেজে ভরতি করেন। দিল্লি, বোম্বেও নিয়ে গিয়েছিলেন। ওই সময়ই ছেলে, মেয়ে ও মহেন্দ্রকে নিয়ে ঢাকা যান ও 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর এডিটিং করে আসেন। ছবিটি হাসপাতালে থাকার সময়ে ঢাকায় রিলিজ হয়েছিল। পরে ছবিটি ওদেশে প্রথম পুরস্কারও পেয়েছে।

৭

এর পরের ইতিহাস বড় বেদনাদায়ক। 'তিতাস একটি নদীর নাম' এদিকে আসেনি। 'যুক্তি-তক্কো-গপ্পো' এখনও পর্যন্ত রিলিজ হয়নি। চেষ্টার ত্রুটি

করা হয়নি। '৭৫ সালের মার্চে আমি, সিরাজ ও মহেন্দ্র ওঁকে নিয়ে বোম্বে যাই। চার জনের নামে ডিস্ট্রিবিউশন সই হয়।

বোম্বে থাকাকালীন CUNIC (Co-operative Union of New Indian Cinema)-এর মিটিং ডেকেছিলেন। এই সংগঠনটির চেয়ারম্যান ছিলেন নিজে। নতুন নতুন ডিরেক্টররা যাতে ছবি করবার সুযোগ পান, সেই জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল এই সংস্থা।

'যুক্তি-তক্কো-গপ্পো'র ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য এক মাসের মধ্যে সত্তর হাজার টাকা জমা দেওয়া সম্ভব হয়নি। আমরা এফ. এফ. সি.-কে জানিয়েছি ছবি নিজেরা রিলিজ করতে, কিন্তু কিছু হয়নি। 'সেই বিষ্ণুপ্রিয়া'র সিনোপসিস লিখে এফ. এফ. সি.-কে পেশ করেছিলেন।

এরপরে চিল্‌ড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি থেকে করার জন্য লেখেন ঠাকুমার ঝুলির 'Princess Kalavati' নামে 'বুদ্ধুভুতুম' গল্পটির সিনোপসিস।

'সেই বিষ্ণুপ্রিয়া' নাটক আকারে লেখেন 'জ্বলন্ত' নাম দিয়ে। 'স্টার'-এ করবার জন্য রিহার্সাল চলছিল। রঞ্জিতমল কাঙ্করিয়া বলেও ছিলেন করাবেন। কিন্তু করেননি। এরপরে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয়। পরে 'একাডেমি অব ফাইন আর্টস'-এ একটি শো হয়েছিল। আমার বড় মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল।

'রামকিঙ্কর বেজ-এর ওপর একটি রঙিন ডকুমেন্টারি করবার জন্য শান্তিনিকেতনে যান। শরীরটা ভালো ছিল না। থাকা-খাওয়ারও ভালো বন্দোবস্ত ছিল না। ডকুমেন্টারিটার শুটিং শেষ করার পর আবার সেপ্টেম্বর মাসে টেলিগ্রাম আসে : Ritwik Ghatak admitted in the Hospital. পি. জি. হাসপাতালে ছিলেন। জন্ডিস হয়েছিল। পরে প্রচণ্ড কাশি ও জ্বর।

ডিসেম্বর মাসে হাসপাতাল থেকে বেরোবার পর (বড়দিনের ছুটিতে) কলকাতায় কাজকর্ম সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হয়। এফ. এফ. সি.-কে 'যুক্তি তক্কো-গপ্পো' রিলিজ করবার জন্য আবার চিঠি লেখা হয়।

'মেঘে ঢাকা তারা' ও 'কোমল গান্ধার' ছবি দুটি পনেরো বছর পর স্বত্ব ফিরে পাবার সময় '৭৪ সালের জানুয়ারি মাসেই আমার নামে লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু চ্যাটার্জি ও রায়চৌধুরী নামে দু'জন ভদ্রলোক অনেক

কিছু সই করিয়ে নিয়েছিলেন। ছবি দুটো এখনও রিসেন্সর করিয়ে রিলিজের ব্যবস্থা করতে পারিনি। কবে পারব জানি না। কারণ সেন্সর অফিস থেকে চিঠি এসেছে কোর্টে গিয়ে ফয়সালা করতে। উকিল ঠিক করেছি।

'৭৬-এর ১১ জানুয়ারি ছেলে ও আমাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য সাঁইথিয়া যান। অনেকক্ষণ ছেলের গান শুনে বলেন—'লক্ষ্মী! তোমার ছেলে আমাকে ছাড়িয়ে যাবে। আরও কথাবার্তা হয়। আর বার বার একটা কথা—'যুক্তি-তক্কো-গপ্পো' ও মেঘে ঢাকা তারা' এবং 'কোমল গান্ধার' থেকে যা টাকাপয়সা আসবে সব তোমার, ছেলেমেয়েদের জন্য খরচ কোরো।' অত্যধিক ড্রিঙ্ক ও বার বার অসুস্থতার জন্য অনেক সময় রাগারাগি হলেও আমরা সব সময়ই ছিলাম বন্ধুর মতো ও তিনটি ছেলেমেয়ের মা-বাবা।

৬ ফেব্রুয়ারি আবার ট্রাঙ্ক-কল : Ritwik Ghatak in serious condition. সারা রাত ভেবেছি এই খবরটি আমাকে আর কত বার শুনতে হবে। পরদিন মৃণাল সেন খবর পাঠিয়েছেন : Ritwik Ghatak expired. খবরটি এত আকস্মিক! স্তব্ধ হয়ে গেছি। কিন্তু একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা তখনই নিয়েছি—জীবনের শেষ কর্তব্য আমাকে শান্তভাবে করতেই হবে।...

ধীর ও স্থিরভাবে সমস্ত করেছি।...ঋত্বিক ঘটক আমার জীবনে একটা সত্য, 'সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম, সে কখনো করে না বঞ্চনা'। এ আমার জীবনের মন্ত্র।

তাই জীবনের একুশটি বছর একটি চিন্তা ও ধ্যানে কেটে গেছে।...আজ আছে শুধু স্মৃতি, আর আমার জীবনের অ্যাম্পল কম্পেনসেশন তিনটি ছেলেমেয়ে!

জীবনটা 'জীবিতের, যারা বেঁচে আছে তাদের জন্য'—'সাঁকো' নাটকের কথা। এই কঠিন ও গুরু দায়িত্ব আমাকে করে যেতেই হবে। বারো বছর আগে আমার এক দুঃখের দিনে জন্ম হয়েছিল যে নবজাতকের—সেই পুত্রটিকে আমার মানুষ করবার কতটুকু ক্ষমতা আছে জানি না, আমার

একমাত্র প্রার্থনা ছেলেটি যেন তার বাবার চিন্তাধারাকে বহন করে নিয়ে যেতে পারে।

'জ্বালা' থেকে 'জ্বলন্ত', 'নাগরিক' থেকে 'যুক্তি-তক্কো-গপ্পো' একই চিন্তাধারায় সৃষ্টি। চরম অসুস্থতার মধ্যে সেই চিন্তাধারা ও সৃষ্টির ব্রেন ও দার্শনিক গভীরতার একটুও নষ্ট হয়নি। পি. জি. হাসপাতালেও গত পুজোর সময় লিখে গেছেন একটি স্ক্রিপ্ট— 'জ্বলন্ত' নাটকের সমস্ত গান নিজের লেখা, সুরও নিজের দেওয়া। 'আকাশ এত নীল কেন? পৃথিবী এত সুন্দর কেন? 'কোথাও একটা ভালো দেশ আছে, সেখানে মানুষ মানুষকে ভালোবাসে। সে দেশ কোথায় জানি না, কিন্তু তার কথা আগে মনে আসে।' ইত্যাদি।

আমার জীবনের সার্থকতা এইখানেই।

মৃত্যুর পরেও মানুষ বেঁচে থাকে সৃষ্টি ও মানুষকে প্রচণ্ড ভালোবাসার মধ্যে, এই সৃষ্টি ও ভালোবাসার মধ্যেই 'ঋত্বিক ঘটক' নামটি অমর হয়ে থাকবে।

পরিশিষ্ট

১

পরিশিষ্টে একটি মূল্যবান চিঠি দিলাম। চিঠিটি 'ঋত্বিক' বইটি লিখবার সময় খুঁজে পাইনি। বহু বছর পর এইবার মাইশোরে ভাইয়ের বাড়ি গিয়ে একটি খামের ভেতরে পেলাম।

১৯৫৪ সালের শেষে অথবা ১৯৫৫ সালের প্রথমে যখন আমরা অনেক কাছাকাছি এসেছি ও একাত্ম হয়েছি, এই রকম সময়ই চিঠিটা লেখা। অনেককিছুর পর জীবনে একটি সিদ্ধান্ত নেবার মুহূর্ত আসে, পরস্পরকে চেনা ও জানার পর একটি সংকল্প আসে মনে।—চিঠিটা লেখার পর আমরা দু'জনেই একসঙ্গে পড়ে কিছু অংশ বাদ দিই।—চিঠিটা থেকে প্রায় পুরো লেখাটিই এখানে দিলাম।

উপন্যাস লিখব ঠিক করে এ কাগজগুলো সেদিন কিনলাম। খরচ হল উপন্যাসের নায়িকার বাস্তব চাহিদায়।

এক একজন মানুষ আসে পৃথিবীতে, যাদেরকে হিসেবের মধ্যে ধরা যায় না।

—কথাগুলো গুছিয়ে বলার আগে আমার বলা সম্বন্ধে দুটো কথা বলে নিই। কথা আমি বলতে পারি অনেক, আর কথা শোনার বিরাট ট্রাডিশান তোমার রয়ে গেছে। তাই আমাদের হয়ে গেছে ধৃতিশক্তিটা ভোঁতা। সে কেমন?

যেমন ধর "দেবীর মত মেয়ে।" কথাটি আমি বললাম। বললাম যখন, তখন একটা বাস্তববোধ থেকে বলেছিলাম। কিন্তু ক'দিন পরে কথাটা যখন মনে পড়ল, তখন একটা নতুন সত্য হঠাৎ অনুভব করার

চমক লাগাটা হারিয়ে একটা প্রশংসাবাণীতে পরিণত হয়েছে কথাটা আমার কাছে। তুমিও হয়তো ভেবেছ, আমি বোঝাতে চাইছি,—তুমি মেয়েটি মোটের ওপর ভাল, আমার খুব ভাল লেগেছে তোমাকে। খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছি, ইত্যাদি। আমি এসব বোঝাতে চাইনি। আমি বোঝাতে চেয়েছি, 'দেবী' কথাটার যতগুলো connotation আছে,—ক্ষমা, স্নেহ, মমতা, নীরবতা, স্নিগ্ধতা। আরো যেন কী কী—সবগুলোর একত্রে বসবাস তোমার মধ্যে দেখেছি।—এই উপলব্ধি হঠাৎ ঝলকানির মত যে আমার মনে হয়েছে, তাকে ভাষায় ব্যক্ত করতে গিয়ে আটপৌরে উচ্ছ্বাসের মত শুনিয়েছে হয়তো।

আমি যখন লিখতে আরম্ভ করলাম, "হিসেবের মধ্যে ধরা যায়না," তখন কথা সাজাইনি। Literal মানেতেই বলেছি। লেখাটার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, বক্তব্যটা বেরোলনা। কথার অলঙ্কার সাজানোর চেষ্টা তো করতে চাই না! Simile, আর metaphor—এরা অলঙ্কার হয়ে উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করুক, এ কে চায়?...গুছোতে পারছি না। মনের ভাবকে ব্যক্ত করে কথা। কিন্তু আমাদের দুর্ব্যবহারে, কথারা বেঁকে বসেছে, তাদের Literal meaning তাদের সেই কথা সৃষ্টির আদি যুগের তাজা বাস্তববোধ নিয়ে ঋজু হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। শিশুর মত, আদিম মানুষের মত প্রকাশ কই? গ্রহণ কই?

কবিরা বোধহয় এইজন্যই কবিতা লেখেন। অনুভূতির সমস্ত তীব্রতা telegraphic হয়ে প্রাণশক্তিতে থর থর করে কাঁপে দুটো কথার ইঙ্গিতে। Wordsworth যখন বললেন—child is the father of man! তখন কতবড় সত্য কত সহজ করে বললেন। তার কোন ফুটনোট দিলেন না, ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন না। আজ আমি যখন ঐ লাইনটা তার Literal meaning-এ ধরি, তখন আচম্‌কা দম্‌-আটকানো সত্যোপলব্ধি এসে পড়ে। Keats যখন বলেন—The Poetry of earth is never dead! অথবা—...to cease upon the midnight...কী যে হয় তার অনুরণনে, বোঝাই কী করে? তাই মনে হয়, যত দামী কথা, তা' যে shape-এই প্রকাশ হোক, তারা সবাই slogan, তারা সবাই কবিতা। কবিতার আর

slogan-এর অদ্ভুত একটা একত্ব এদিক থেকে পাবে তুমি। Literal meaning-এ ধর, কতবড় জিনিষ প্রতিভাত হবে তোমার সামনে।

Philosophers have hitherto brooded over the problems of the world; the point is, however, to change it!—আর দরকার হয় না। Communist Manifesto কবিতাধর্মী এই জন্যেই। সব essential কথা তাই পরিণত। সংযত। সংহত। কিন্তু হায়, আমি কবি নই। আর সব আছে কী না জানি না, পরিমিতি আমার নেই। তাই আমাদের যথেচ্ছ ব্যবহারে ইতর ব্যবহারে কথাগুলো আমাদের হাতে ঘষে যাওয়া রাণীমার্কা পয়সার মত—shape আছে, ছাপ নেই। আমি অনেক চিন্তা নিংড়ে কাগজের ওপর দুটো কথা বসাব—দেখব মনের দ্যোতনা তাতে ধরা পড়েনি, নিরীহ ভালমানুষী ভাল কথা হয়েছে। সত্যবোধের passion নেই তার মধ্যে।

তবু একটা working agreement-এ আসা যায়। আমার সব কথাকে তুমি LIterally ধর। খারাপ মানে খারাপ। আর ভাল মানে ভাল। কিছুর মত বলা মানে তার গুণগুলো Literally আরোপ করা। উচ্ছ্বাস না।

এটুকু গেল মুখবন্ধ।

বক্তব্যের বিষয় হচ্ছে দুটো। তুমি আর আমি। তুমি দিয়েই শুরু করি।

তোমাকে আমি অনেক বিশ্লেষণ করেছি আগে, তোমাকে ভুলতে হবে তাদের। তারা ভুল। তোমাকে প্রশংসা করার প্রশ্ন আমার সামনে আজ নেই। আজ শুধু ধ্যানস্তিমিত ভাবে একটা ঘটনার পুরো চরিত্রটা ভাবার চেষ্টা।—

তোমাকে আমি চিনতে পারছি না। তবু, চেনার ক্ষমতা আমার নেই বোঝার মত চিনেছি। দুনিয়ার এক-একজন আসে, যারা প্রকাণ্ড বড় কিছু করতে আসে। আমরা বলি, প্রতিভা। তোমার মা প্রতিভা ছিলেন।

প্রতিভা আসে, কিন্তু করতে পারে না অনেকক্ষেত্রেই কিছু। Objectivity সম্বন্ধে আমার বলার কিছু নেই। তুমিও marxist, তুমি জান। প্রতিভার স্ফুরণের আর একটা দিক কিন্তু আছে। ইতিহাসের অগ্রগতির ধারাটাকে বুঝে তার পক্ষগ্রহণের মধ্যেই বৃহৎ মানবদের প্রকাশ। বুদ্ধ থেকে

লেনিনের জীবনী এই কথাই বলবে। এর পরের ধাপ হচ্ছে, এই general পক্ষ গ্রহণ করাকে জীবনের প্রতি খণ্ডে খণ্ডে ছড়িয়ে দিতে হয়। সেখানেই প্রতিভার প্রকাশের পরীক্ষা। সব প্রতিভার ব্যর্থতা আর সাফল্যকে এই দিনগত [দৈনন্দিন] দিক থেকে দেখলেই ব্যাখ্যা করা যায়। কারণ, পক্ষ গ্রহণ করাটা একটা দলে নাম লেখানোতে সমাপ্ত নয়, আরম্ভ। প্রতিক্ষণে একবার করে পক্ষগ্রহণের সমস্যা আসে, তার জন্য সত্যবোধকে জাগ্রত রাখতে হয়। হার হয় সেইখানেই, জিতও একই জায়গায়। Dialectics স্থাবরকে অস্বীকার করে, মহাবিশ্বের জঙ্গমত্ব একমাত্র স্থির—একথা বলে। প্রতিভাকে এই কথাটা অনুভব করতে হয়, অনুবাদ করতে হয় প্রতি প্রহরে, প্রতি পলে, অনুপলে।

আমার আজকের দৃঢ় ধারণা, তুমি প্রকাণ্ড বড় কিছু করার গঠনে তৈরী।

এ গড়ন যাদের, তাদের প্রাণের প্রদীপ জ্বলে কোন্ আলোতে, সাধারণ হিসেবে তা ধরা পড়ে না। আর সাধারণ যারা, অসাধারণ মাপকাঠি তাদের জানা নেই। কাজেই খুব করলে একটা কাজ করতে পারে। হাঁ করে বসে দেখতে পারে। জীবনের শেষ দিনে পর্যন্ত অসাধারণের প্রকাশ, যখন সে নেই, তখনই তাকে হিসেব করা যায়। Joan of Domremy থেকে Dolores Ibarurri [La Passionaria] পর্যন্ত এমনি হাঁ করে রেখেছিলেন সবাইকে।

এ গড়ন যাদের, সারাজীবন এই class society-তে তারা দগ্ধে দগ্ধে মরবে। বহু যাতনা আর ভালবাসার আগুনে পুড়ে পুড়ে একদিন মারা যাবে। তারপর ক্রমশঃ ধর্তব্যের মধ্যে আসতেও পারে তারা, নাও আসতে পারে।

তাই বলছি আমার হিসেব ভুলে যাও! তোমার Planning, তোমার Decision, তোমার attitude,—এ সবের জন্যে তোমার মধ্যেই আছে সহজাত বিবেচনা বোধ। তাকে বিশ্বাস কর। তা থেকে বাইরে যা প্রকাশ পায়, তার বেশীর ভাগই ছেলেমানুষী মনে হবার সম্ভাবনা। কারণ, তারা যে ছেলেমানুষীই। –Only set upon a higher ring of the spiral...তার

বেশীরভাগই তোমাকে misunderstood [stand] করাবে, suffer করাবে। এসব থেকেই রস আহরণ করা ছাড়া তোমার পথ নেই, উপায় নেই। সেই জীবনীরস আহরণ করে একদিন তুমি দিক উদ্ভাসিত করতেও পার, নাও করতে পার। কিন্তু suffering is your birthright. রবীন্দ্রনাথ History-এর এই operation এর কথাই বলেছিলেন—"চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার,

ওরে, সে নহে বিশ্রাম...
...নিন্দা দিবে জয়শংখনাদ,
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।"

—কবিতাটা ছাই মনেও পড়ছে না পুরো। কিন্তু কবিতাটার মানে, তোমার জাতের জন্যে খানিকটা কষ্ট পেতে হবে, কী glaring suffering বা মনগড়া ব্যথা পেতে হবে, এটা বোঝাচ্ছে না। Suffering is always unbearable, suffering is always hateful, which should not exit, which has no moral ground to stay—রবীন্দ্রনাথের ও-কবিতাটার literal meaning হচ্ছে তোমাদের জীবনের পথের বর্ণনা।

Fuchik বলেছিলেন, I lived for joy, I die for joy,—and so, let there be no angel of sorrow upon my grave!—এই কথার প্রত্যেকটা একদিন তোমার বুক নিংড়ে বের হয়ে আসবে। তবু তোমার মরণের ওপর হয়তো দুঃখের angel তার পক্ষ বিস্তার করে দেবে না।—কিন্তু তোমার জীবনের ওপর তার বিস্তার রোধ করবার ক্ষমতা তোমার নেই। You shall live for joy—in sorrow! মায়াকোভ্স্কিকে মনে পড়ে? মনে কর। গোর্কিকে বারে বারে পড়, তাঁর আত্মজীবনী বিশেষ ক'রে। আর literally ধরে।

তুমি Communist হয়েছ নিজের টানে, আজ আর্টিস্ট হতে চেয়েছিলে নিজেরই টানে, বিশ্বাস কর। মানুষকে ভালবাসা আর দেওয়া-নেওয়ার যে theory তোমার আছে, আজ তাকে criticise করার মত বিশ্বাসের জোর আমার নেই। তোমার নিজস্ব বোধ তোমাকে আলো দেখাবে, আর কিছুর ক্ষমতা নেই।

কিন্তু সেই আলোর পথ ধরে এগোতে গিয়ে বহু মৃত্যুকে বহু দুঃখকে তোমার পার হয়ে যেতে হবে। আর তার মধ্যেই পথে পথে ছড়িয়ে থাকবে তোমার নিজেকে তৈরী করার মালমশলা। আঘাতে অন্ধ হয়ে যদি তাদের আহরণ না কর, তার পুরো মূল্য আদায় করতে না পার; যদি শিক্ষা তোমার না হয়—জানি না পরিপ্রেক্ষিত তোমার পরিস্কার থাকবে কী না।

যদি দেখি, ঐ বিরাট পদ্মানদীটার মত স্রোতস্বিনী মন কোনদিনই জুনিপার বাঁধের মহাকাব্যে বাঁধা পড়লো না,—বুঝব ইতিহাসের ধারার সঙ্গে সকালে বিকেলের কোন মুহূর্তে তুমি নিজেকে align করতে পার নি, এমনি ধারায় তোমার মা বয়ে গেছেন, তুমিও যাবে কি?

কোথায় পথ? জীবনের এই সিদ্ধান্ত নেবার শেষ সন্ধিক্ষণে এই প্রাণস্রোতকে কোন্ খাতে বইয়ে দেবার তপস্যা করতে হবে তোমায়?

একসময় ভাবি, তুমি Florence Nightingale-এর সমধর্মী। পীড়িতদের মাঝে নিজের বুকঢালা ভালবাসা শুধুই দান করার মাঝেই তোমার পরমতম বিকাশ হবে। Nursing পড়বে?

আবার ভাবছি আজ, সত্যিই তো—পার্টির organisation building-এর কাজ বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে, যেখানে দীপশিখার মত হাজার হাজার বাঙ্গালীর মেয়ের সঙ্গে—সেইখানেই তুমি ফুটবে ভাল। এ কাজে intellect-এর প্রচণ্ড মূল্য আছে। আর তোমার মধ্যে খাঁটি বাঙ্গালী মেয়ে তার সব মাধুর্য নিয়ে বিরাজ করছে।...

কিন্তু তোমার নিষ্ক্রিয় চেহারা আর কল্পনা করতে পারছিনা। তুমিও যে পার না, তা বুঝি। আমাদের চাকাটা বন্ধ হয়ে ছিল বহুদিন, তাই যেন জং ধরে গেছে। কাজের উন্মাদনার মধ্যেই তোমার মত প্রাণ একমাত্র আনন্দ পেতে পারে, জীবনীরস আহরণ করতে পারে। এই সেই বর্ম, যার সাহায্যে তুমি যে misunderstanding-এর আঘাত পাবে, তাকে প্রতিহত করতে পার।...

—তুমি জেনে রাখ, তোমার মনের অন্তরতম প্রদেশকে তোমার পাশে যারা আছে, চিনবে না।

তোমরা বড় একাকী। একেবারে ভেতরে একদম একাকী। সমষ্টির

মধ্যে মনকে ব্যাপ্ত করতে কোনদিনই পারবে না, কাজকে ব্যাপ্ত করে দাও। কাজের সেতু ধরে মন এগোয়, তোমার বাঁচোয়া হবে। কিন্তু পুরো জানা তোমায় কেউ জানবে না।

—একজন হয়তো জেনেছিল। সে তাই নিশ্চিন্ত। বছরের পর বছর সে নিশ্চিন্ত। তুমিও। কিন্তু আর ও-আশা তুমি কোর না। অন্তত বর্তমানের এই পরিবেশে যা তোমাকে খেতেই হবে, আর কাজও করতেই হবে। এর থেকে ভাল পরিবেশ পাবে না।

তোমাদের জাতের জন্য আমার দুঃখ হয়। আমিও ঐ জাতের হলেও হতে পারতাম। তাই বোধহয় খানিকটা বুঝেছি।

অতএব কাজ কর। সঙ্গীদের না বোঝার বোঝা বহন কর। কষ্ট কর এবং আনন্দ আহরণ কর।

সব কটা পুরোনো কথা। নতুন করে বুঝছি। আশ্চর্য—একেবারে নতুন কথাগুলো।

আমি।

—তোমাদের ধাঁচে একদিন গড়া ছিলাম। তিলতিল করে সরতে সরতে অন্য জায়গায় এসে গেছি। বিরাট একটা কিছু করব, বিপুলভাবে নাড়া দেব, সংস্কৃতি জগতের মোড় ঘোরাব—এসব স্বপ্ন আর দেখি না।

আমার অনেক গুণ আছে। সেগুলোকে শৃংখলাবদ্ধ করতে পারলে বিরাট কিছু না হোক, দেশের জনতার প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করতে পারব।

শৃংখলাবদ্ধ করিনি, কারণ দুটো। এক—বিবেচনা বলে পদার্থটা আমার একদম নেই। সমস্ত কাজ Hasty, অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে, gambling-এর ভঙ্গীতে unmarxist unbolshevik.—এইটাকে কাটাবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে, এটা তুমি শিখিয়ে দিলে।

জীবনে যেন নোঙ্গর ছিল না। তোমার সঙ্গ আমার নিজের মধ্যে সেই নোঙ্গর দেখাল। হাজার বক্তৃতাবাজী আর পড়াশুনো আমার একেবারে ভেতরের এই বেপরোয়াভাব মোছাতে পারেনি। আজ সেটা হয়েছে। এখন থেকে এইটেই আমার প্রাপ্তি।

দুই—আমার মধ্যে একটা প্রচণ্ড ধ্বংসশক্তি যেন কাজ করছে। আজ বুঝছি বিশেষ করে। এও class vice—কিন্তু এমন অনুভব করিনি। আমার সব বিবেচনার মধ্যে ভাঙ্গন আনে এটা। এটাকে বোঝাতে পারছি না, কিন্তু এটা আছে।

এ আমাকে টিঁকতে দেবে কিনা, জানি না। কাজ করতে দেবে কিনা জানি না। একেই আমার ভয়।

...

আমার উপন্যাসটিকে আমি ছকে ফেলেছি খানিকটা। ওটা লিখব। কারণ তোমার মা, তোমার মামীমা, ও তোমার জীবনধারাটাকে আমার জনতার সামনে তুলে ধরার একটা তাগিদ অনুভব করছি অনেকদিন থেকেই। তোমার মা ও তুমি,—বাংলার মেয়েদের চিরকেলে চেহারার ধারাটাকে পরিপূর্ণ বহন করছ, তোমাদের মধ্যে আমার বাংলার মেয়েদের পরিপূর্ণ পরম বিকাশ। এই বাংলা, আর তার মা-দের আর প্রাণশক্তি মেয়েদের আমি কতটা ভালবাসি তুমি জান। সেই মানবতাবোধের স্নিগ্ধধারা যা সবসময় বাংলাদেশের মানুষকে বুঁদ করে দিয়েছে, বাঙালী সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কীর্তির প্রত্যেকটির উপজীব্য যে রস আর যে প্রাণীগুলো—বাস্তবক্ষেত্রে তোমরা দুজনে মিলে সেই ধারাকে বহন করে এনে আন্তর্জাতিক মানবতার ধারা তথা সাম্যবাদের উত্তরাধিকার করে তুলেছ। স্বদেশীয়ানার গোঁড়ামি নেই, দেশকে পাগলের মত ভালবাসার জন্য সাম্যবাদী আন্তর্জাতিক মজুরদের দলে নাম লেখানো—এমন নায়িকা বাস্তবে আমার দেশে ছিল না। তাই তুলনা পাইনি। সর্বপ্রথম তুলনা পেয়েছি আজ, কতদূর উৎরোবে জানি না, তবে এই হচ্ছে লেখার মত জিনিষ। দেশমানসের মর্মবাণী চিৎকার করে উঠতে পারবে আমার লেখায়। যদি শক্তিসংগ্রহ করতে পারি আমি। আমার কল্পনা আবার ডানা মেলেছে রে!

আর তাই, তোমার গতি পরিণতি আমার এ খাটুনির লেখায় প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করবে। কখনো ছোট হবে না, তাহলে আমার উপন্যাস ছোট হয়ে যাবে। আরো হাজার হাজার মেয়ের বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসার পথে প্রতিবন্ধক হবে।

শেষটায় একটু কাব্যি করি, কেমন?

...আমার একটা মুখ চিরদিন মনে থাকবে।

কার মুখ?

বলা যায় না। একজন মানুষের কি একটাই মুখ?

না। সমুদ্রের মত ঢেউ খেলে যায় আবেগের, তোমরা কেউ দেখেছ তেমন মুখ?—দেখেছ?

তোমরা, যারা আকণ্ঠ ভালবেসেছ, দেখেছ। তার খানিকটা ছিল বাস্তবে, আর খানিকটা নিজের চোখ দিয়ে তৈরী করে দেখেছ।

আমি তেমন মুখ দেখেছিলাম।

...সামনে রাতের কালী পড়ে নিস্তরঙ্গ কালো জল হলকাচ্ছে অতি মৃদু। দূরে দূরে যেসব আলো, তার প্রতিফলনে মৃদুকম্পিত ভীরু আভা প্রতিভাত হচ্ছিল সেই মুখটাতে। শ্যামলা লাগছিল মেয়েটাকে দেখতে, আর কেমন যেন কেউ তার নেই, মনে হচ্ছিল। তারার চাপা জ্যোতিতে ভরা আকাশ তার মুখের পটভূমি হয়েছিল। ধূসর শ্লেট রঙের আকাশ। রুক্ষ রুক্ষ চূর্ণ কুন্তলে জ্যোতিমণ্ডলের সৃষ্টি করেছিল সে মুখের চারপাশে। সেই স্বপ্নলোকে তার সমস্ত মুখের আকারটা কেমন আবছা হয়ে গেছিল, অস্পষ্ট লাগছিল এত বেশী কাছে থেকেও। অস্পষ্টতার সঙ্গে রহস্যের একটা সম্পর্ক আছে। তাই না?...সব আবছা, চাপা,—যা দেখা যাচ্ছে, তার থেকে অনেক বেশীর ইঙ্গিত দিচ্ছে যেন। সীমার অস্পষ্ট রেখায় অসীমের ইশারা।...

বাংলাদেশের গায়ের রঙের মত তাকে শ্যাম্‌লা লাগছিল।

আর তার চোখ।

গভীর...গভীর...অতল গভীর একটা অজানা দেশ। তার দুটো বাতায়ন। কোথায় কোন্ তলে কী আলোড়ন ওঠে, দুটো একটা তারই আভাস ভেসে আসছে তারা দুটোতে, বড় বড় পক্ষ্মে। কোণার কুন্তলে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। যেমন হয়ে যাচ্ছে ওর মাথার ওপর দিয়ে শহরের আলোর আভাষ লালচে হয়ে ওঠা মেঘগুলো তির্যক গতিতে নৈঋত কোণের দিকে। আকাশে মিছিল—মেঘের। ওর চোখে মিছিল—কীসের?

ঠোঁট দুটোর কোণায় একটুখানি হাসির আভাস। ছোট্ট একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। আমার কানে শব্দটা বড় হয়ে বাজল,—শহরের কোলাহল অনেক আগেই দূর থেকে দূরে চলে গিয়ে একটা স্তিমিত আবহে পরিণত হয়েছিল।...

আমি তাকাতে পারলাম না বেশীক্ষণ। চোখ বুজলাম। মাথার মধ্যে ছবিটাকে চিরস্থায়ী করে রাখার জন্যে অনুভব করতে লাগলাম। এমন ছবি আমার চোখ যেন আর দেখেনি। কত তো দেখেছে সে, রেটিনার কোলে প্রতিবিম্ব ধরেছে কত পাহাড় নদী আর ধানক্ষেত আর আদিগন্ত মাঠের ব্যাপ্তির। এমন কিছু দেখেছ কোনদিন?

...চোখ খুললাম। কেমন যেন অসহায় ক্লান্ত লাগছে মেয়েটিকে। নিরুপায় সে যেন নিরন্তর মাথা খুঁড়ে চলেছে...

মুহূর্তটা কেটে গেছে।

—ও মেয়েকে আমি বহ্নিশিখার মত জ্বলে উঠতে দেখেছি। কিন্তু এই ছবিটিই আমার মনে থাকবে চিরটাকাল। আমার বাংলাদেশের মত শ্যামল বাংলার মেয়ে।

২

For attention of Mr. Principal.

Memorandam connecting integrated course of Direction.

Some notes :–

(1) I have carefully gone through again the entire Direction. Course of all the years (1st. 2nd and 3rd year). I have come to certain conclusions and I had to qualify certain of my views after deep thinking which I would like to record below :

(2) The course of Direction which includes the Film Appreciation (and for first 2 years Screenplay Writing also) will have to be integrated in such a way that an all-round

training can be imparted. Apart from the theoretical trainings that we have worked out in fullest possible detail, I would like to put stress on practicals very much and also on keeping contact with the industry so that in future the students may get fruitful employment in the Industry.

(3) The film on National Integration could not be made within this vacation which I propose to take up as the 20 minutes Staff film to be made in collaboration with 2nd year students during the first term of this year.

(Incidentally 'Fear' can be completed within this vacation and can be made ready for the next press show as also during convocation showing.)

(4) For the practicals of 1st and 2nd years, certain equipments and staff units will be necessary as I have pointed out in my earlier memo. Since 3rd year students are not making their diploma films this term and completing their theoretical papers only, appearing in the examination for those papers at the end of this term and being free to take up their diploma films in the last semester of this session, 3rd year boys are not coming in the way for working out the practicals of the 1st and 2nd years.

The equipment which I will require for conducting the 1st and 2nd year practicals are as follows. These will be required for all through the weeks teaching in this term :

(1) A camera with an Instructor of camera with necessary attendant gadgets.

(2) One sound unit with an Instructor.

(3) One editing table with all other facilities for editing along with one Instructor.

(4) Projection facility as and when required.

(5) Floor space and necessary set materials as and when required for making those films. In this connection it can be pointed out that maximum use will be made of the permanent sets on the Stage no. I and the outdoor lot.

(6) Raw film stock as worked out with A.P.P. and as intended for.

5. It may be pointed out that though I have asked for Instructors for every equipment, if the professors concerned desire so, students of their departments can participate according to their convenience. It may further be pointed out that as I have made up the time-table now, these units will be required for 4 days in a week. But over and above that, if we make that 20 minute staff-film, we will need a permanent unit who will do both the work.

6. I deeply feel that guest from the industry are necessary. Previously I was of the opinion that guest disturb the smooth running of the time-table. But if we can somehow arrange a smooth time schedule for different guests, I think it is not only worth trying, but also it is vital, because I feel that if the guest stop coming, the students and the Institute itself will be completely out of touch with the Industry, thereby losing its own very base. At the same time if they have to come, they must come in the first semester because in the second semester all the students will be busy for preparation of their examination and at that time these casual leatures may create confusion.

Guests' coming will also broaden the taste and outlook of the students who, as you know, come with all kinds of

wrong notions in their brains, being particularly glamour struck. As I understand this Institute's role to be in the context of Indian cinema,–we are here to foster and promote purposeful, healthy, entertaining and artistic films. To put too much stress upon commercialism to the detriment of others, what happens normally with the students should not be encouraged. So for both the reasons of guiding them towards the proper line and at the same time keeping them in touch with the industry, we must have guests.

The following gentlemen from the industry I propose to invite. Please remember that this is strictly for Direction course of 2nd and 3rd year. Also I have tried to select people who may be prospective future employers of the boys.

From Bombay :

(1) Shri Hiten Choudhury.
(2) Shri Hrishikesh Mukherjee.
(3) Shri Rajendra Singh Bedi.
(4) Shri K. A. Abbas.
(5) Shri Salil Chaudhury.
(6) Shri Viswamitra Adil.

From Calcutta :

(1) Shri Satyajit Ray.
(2) Shri Mrinal Sen.
(3) Shri Chidananda Dasgupta.
(4) Shri Barin Saha.

(5) Shri Hari S. Dasgupta.

(6) Shri Ashit Chaudhury.

I propose to call them one by one according to following time-table in my schedule between 15th of July to 15th of September.

(1) Every Tuesday and Wednesday–I have kept provisions for such lectures. Both the days between 10 to 1 the guest will meet 2nd year students and between 2 to 5 they will meet 3rd year students.

(2) If you want to have general lectures by any of the guests, that also can be arranged for.

(3) The dates available in my hand are :

– July : 20, 21, 27, 28.

– August : 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31.

– September : 7, 8, 14, 15.

To organise the whole programme properly and to ensure that the gentlemen concerned come on the specific dates, I feel that personal contact and discussion are of highest importance over and above our official correspondence with them. As the Principal knows very well, all gentlemen mentioned in the memorandum are intimately known by me. I propose that I shall be allowed to proceed on tour to Bombay on 24th next, after completion of the Viva Voce here on 23rd and after a day or two proceed on tour to Calcutta returning by 30th to attend the inaugural classes on 1st of July, 1965.

7. I propose that all the new entrants who come in this time, should be given a gentle orientation lecture on the

very first day that should clearly point out to them what is expected of them here and after they pass out from this Institute. Principal may kindly discuss with me and prepare a lecture on the issue.

I request the Principal to go through the whole thing carefully. if necessary have discussions with me and take immediate action so that things can be organised from now on.

Thaking you.

Sd./Ritwik Ghatak
Vice-Principal
10.6.65

Enclosed :

(1) Detailed Practicals of 1st & 2nd years.

(2) Revised Theoreticals of 3rd year.

Third year theory :

As it is proposed that there will be no practical work, for the 3rd year students in first term, it will be advisable to finish all the theory work for these students in first term itself and if possible their examinations on these papers should be completed either before or just after the next vacation so that they are relieved of their burden of theoretical papers and can concentrate on their diploma films completely free.

I have pursued the text prescribed in the tentative syllabus already cyclostyled, and I propose certain changes. As

it is there are only Eisenstein books prescribed. I consider Eisenstein to be a must, but he is also dated. Film form has gone much forward and students must be acquainted with the most recent development and trends in cinemar.

So I suggest one book that has recently come out in the market which to me is one of the most comprehensive books on cinema. i.e. 'Cinema' by Ivor Montagu. At the same time to keep them abreast of day to day happenings in the cinema, I suggest as text the following periodicals :

(1) Sight and Sound.

(2) Films and Filming.

(3) Film Culture.

(4) Film Quarterly. (all brought out within last 2 years).

Of course I do not mean that all the articles coming out in the se magazines should be included in the text. A selection of them will have to be made.

In so far as film music is concerned, I think this is very much neglected in our syllabus. I suggest 'Film Music' by Kurt London should be included in the text. They must have a basic grounding for use of music in cinema.

In so far as 'recommended books' are concerned, I would like to add certain books in the list. There is a very excellent series of biographies of different directors that is coming out. Already 3 of them have come out. Those on Antonioni, Bunuel and Bergman. Another book of this series is being planned to come out soon. i.e., 'Satyajit Ray' by Miss Marie Seaton. This series should be recommended.

Since there is no good book on Indian Cinema and at the same time some knowledge of Asiatic Cinema should be

there, I propose a very excellent book : 'Japanese Cinema' written by Ritchi.

This will not help by itself. So I propose to prepare a paper, collecting data about Indian Cinema mostly on Bombay and Calcutta activities and I would like to use it as a text. It is unfortunate that nothing can be done by me about South. A competent person has to be found out who can write such a text for South India. These tekts can be cyclostyled and used in consecutive years About the general basic theory and approach. I propose to use a reference book :'Theory of Film : Redemption of Physical Reality by Dr. Kracauer.

The programme for practicals of 1st, 2nd and 3rd years.

1st term–1st year.

There will be a 5 minutes film sequence planned by the teacher which will as a demonstration sequence be observed by the students of 1st year in which the following method will be pursued :

(1) How to plan out a sequence on paper from writing point of view, production planning point of view, and development of character point of view.

(2) Diagrams to be made to indicate pan, track and other camera movements on paper for that particular sequence. Every student will be asked to work out on paper the whole thing.

(3) Choice of location and/or set. How to select, what point to keep in mind and how to oraganise a particular spot

for a proposed sequence of film. This will be done by every individual student and discussed by the teacher.

(4) How to use a director's view-finder. How to select lenses; what are the guiding principles in choosing a particular lens and set up.

(5) Doing mock shooting by moving an empty camera by which will be shown the effect of camera movement, object movement, camera and object both movements and static camera. These will be explained to the students in fullest possible details.

(6) Use of camera angles to enhance the telling of the story and distortions and its place in creating mood.

(7) Elements of lighting conditions. High-key and Low-key sharp contrast, soft contrast, etc. How they help telling the story.

(8) Continuity of Shots ; how to go from shot to shot for a smooth flow of telling the story. Camera's use as a subjective factor. Camera's movement is always along the psychological growth of the sequence. These will be exercises done by every student and corrected by teacher.

(9) After all these things are done, then these very sequence will be shot by the teacher in collaboration with the students in which maximum scope for discussion will be given to the students and their errors to be pointed out. By shooting and showing it on the screen, teacher will be able to explain whether different effects, as desired will be able to explain whether different effects, as desired, have come or not. The difference between imagination and realisation.

What are the factors governing this big difference. This film will be silent.

2nd year–1st term :

In the 1st week of July, the teacher will start picturising a song and dance sequence using back projection and other special effects like models, and tricks (SHUFFTAN). In this one sequence students will be taught how to picturise a song, how to utilise all kinds of elements. This will be the practical exercise for the second year students for all these above subjects.

(2) The teacher will start making a 20 minute documentary or television film probably on a subject which can be sold outside, i.e. subjects like National Integration or Family Planning, or some such thing. In this the students will collaborate collectively at every stage.

(3) At the same time, the students will submit their ideas for 5 minute talkie films and write the scenario for it; make all the production planning and get generally prepared for shooting their own 5 minute films in the 2nd term.

3rd year :

There will be no practical in the first term for 3rd year students excepting all the pre-shooting preparations of their 10 minutes diploma films to be made in 2nd term. I propose that they should be given subjects of our own choice on which they will write their scenario and make other arrangements.

CONFIDENTIAL

CONDITIONS OF THE DIRECTION DEPTT.

1. Condition of the Direction Department is impossible. If such conditions prevail. it will be extremely difficult for me to conduct any classes. If the tentative time-table drawn up by me is persued, it will be seen that I have taken up myself 36 hours of lecture work load quite apart from other duties that I have to perform.

I have only one temporary hand Mr. Mital. He is an ex-student newly come out from this very institute. I can entrust him the work of First Year classes, but beyond that I do not think him competent to hold any serious classes. I myself, therefore, have taken up the Second and Third year leaving aside the First year to him.

2. This is one of the reasons why I have come out with the scheme of having Guest-lecturers for the first term this year. These Guest-lecturers will take away some load from me in Second and Third year classes.

3. I personally think that this need not mean that I should be relieved of guiding other departments under me, because they are also vitally connected with the Direction Coaching. In fact, I would like to think more so on the departments of Acting and Music that hitherto giving any work to the Head of the Department of Direction. I think so because I consider these two departments are vitally inter connected with the work of Direction.

4. I propose that the Principal kindly take up the matter with the Ministry for some ad-hoc appointment for the

Prof. and Asstt. Prof. of Direction. In my opinion, there are only two candidates whom we can give ad-hoc appointments immediately. One is Mr. Barin Saha and another is Mr. N. Banerjee. This is one of the reasons why I have included Mr. Saha's name in my list of Guest-lecturers.

Principal may be acquainted with him personally and form his own opinion.

In any case Principal may kindly press the matter and exert his powers to fill up the posts as soon [as] possible.

Dt. 11th June, 1965.

Ritwik Ghatak
Vice-Principal.

ঋত্বিককুমার ঘটকের চলচ্চিত্রপঞ্জি

বেদেনী/অরূপকথা ১৯৫১-৫২ অসম্পূর্ণ
(Bedeni/Arup Kathe)

প্রযোজনা	সুনীলকৃষ্ণ রায়
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
কাহিনী	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
আলোকচিত্র	শচীন দাশগুপ্ত

অভিনয় ঃ শাপলা—প্রভা দেবী, পিঙ্গলা—শোভা সেন, চিতি—কেতকী দত্ত, গোখরী—মিতা চ্যাটার্জি, ধনা—অভি ভট্টাচার্য, সর্দার—মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, এ ছাড়া বিজন ভট্টাচার্য, মমতাজ আহমেদ্ খান, পারিজাত বোস, কেষ্ট মুখার্জি প্রমুখরাও অভিনয় করেছিলেন।

['নাগিনী কন্যার কাহিনী' নামের ছোট গল্প হল 'বেদেনী'র মূল কাহিনী। ১৯৫০ সালে অর্থাৎ প্রথমে এই ছবির পরিচালক ছিলেন নির্মল দে। শুটিং হয় পার্কসার্কাসের রূপশ্রী স্টুডিয়োতে। সেটি আগুনে পুড়ে যাওয়ার পরে ইন্দ্রলোক স্টুডিয়োয়। অর্থাভাবে ছবির কাজ বন্ধ হয়। ১৯৫১ সালে ছবিটি সম্পূর্ণ করার জন্য ভারপ্রাপ্ত হন শ্রীঘটক। কাহিনী পরিবর্ধন এবং নতুন করে চিত্রনাট্য লিখে তিনি ছবির নাম দেন 'অরূপকথা'। কানু মুখার্জি এবং শিশির বটব্যালের পরিবর্তে আসেন—যথাক্রমে বিজন ভট্টাচার্য এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। ১৯৫২ সালের শুরুতে বোলপুরে এবং ঘাটশিলার সুবর্ণরেখা নদীর ধারে সর্বমোট কুড়ি দিনের আউটডোর শুটিং হয়। কিন্তু ক্যামেরায় ত্রুটি থাকায় ফিল্ম এক্সপোজড হয় না। ফলত ছবিটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় মধ্যপথে পরিত্যক্ত হয়। পানু পাল, শম্ভু ভট্টাচার্য ও বটু পাল এই ছবির নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন। জ্যোতি লাহা ছিলেন সহকারী ক্যামেরাম্যান।]

নাগরিক ১৯৫২-৫৩ সাদা কালো ৩৫ মি.মি. ১২৫ মিনিট
(The Citizen)

প্রযোজনা	ফিল্ম গিল্ড, প্রমোদ সেনগুপ্ত, ভূপতি নন্দী ও ঋত্বিক ঘটক
কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
আলোকচিত্র	রামানন্দ সেনগুপ্ত
সম্পাদনা	রমেশ যোশী

সংগীত	হরিপ্রসন্ন দাস
গীতিকার	গোবিন্দ মুনিশ
রূপসজ্জা	গনেশ দাস
ধারাভাষ্য	ঋত্বিককুমার ঘটক
শিল্প নির্দেশনা	ভূপেন মজুমদার
প্রচার পরিকল্পনা	দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

গান : (১) মাঝি যে তো মাঝধার হ্যায়...।

(২) মঝু প্রাণ কঠিন কঠোর...।

অভিনয় : মা—প্রভা দেবী, সীতা—শোভা সেন, উমা—কেতকী চ্যাটার্জি, শেফালী—গীতা সোম, রামু—সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, সাগর—অজিত ব্যানার্জি, বাবা—কালী ব্যানার্জি, যতীন—কেষ্ট মুখার্জি, বাড়িওলা—গঙ্গাপদ বসু, পিণ্টু—শ্রীমান পিণ্টু, বেহালাবাদক—পারিজাত বোস, সুশান্ত—মমতাজ আহ্‌মেদ খান এবং অনিল চট্টোপাধ্যায়, উমানাথ ভট্টাচার্য, অনিল ঘোষ, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

মুক্তির তারিখ : ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭

প্রেক্ষাগৃহ : নিউ এম্পায়ার, কলকাতা

[পরিচালকের জীবদ্দশায় এ ছবি মুক্তিলাভ করেনি। জীবনের প্রথম সম্পূর্ণ ছবি মুক্তি পায় মৃত্যুর দেড় বছর পরে। শ্রী ব্রহ্মা সিং ও শ্রী রমেশ যোশী ফিল্মটির positive একটি প্রিণ্ট উদ্ধার করেন বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরি থেকে। মূল নেগেটিভ হারিয়ে গেছে। সময়ের ক্ষতচিহ্ন (এই প্রিণ্টটা ১৯৫৩-এ করা গুটিকতকের একটি) ছিল এর সর্বাঙ্গেই প্রায়। পুণা এফ. টি. আই.-এর কিউরেটর শ্রী পি. কে. নায়ার ছবিটির একটি ডুপ্লিকেট নেগেটিভ করে ১৯৭৭ সনে ছবির প্রিণ্ট তৈরি করেন। ছবিটি পঁচিশ বছর পরে মুক্তি পায়। তবে ১৯৫৩ সাল নাগাদ হাওড়া জেলার একটি মফস্‌সল প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি কয়েকদিন চলে এবং আইনগত কারণে প্রদর্শন বন্ধও হয়ে যায়।] ইউনাইটেড সিনেল্যাবে পরিস্ফুটন হয়।

আদিবাসীওঁ কা জীবনস্রোত ১৯৫৫ হিন্দি তথ্যচিত্র সাদা কালো ১৫ মিনিট

(Life of the Adivasis)

প্রযোজনা	বিহার সরকার
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
ফিল্ম ইউনিট	অরোরা সিনেমা কোম্পানি

বিহার কে দর্শনীয় স্থান ১৯৫৫ হিন্দি তথ্যচিত্র সাদা-কালো ১৬ মিনিট

(Historic Places in Bihar)

প্রযোজনা	বিহার সরকার
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
ফিল্ম ইউনিট	অরোরা সিনেমা কোম্পানি

ওরাওঁ (Oraon) ১৯৫৭

[রাঁচি অঞ্চলের আদিবাসী এবং রানি খাটাঙ্গা গ্রামের ওরাওঁ-দের জীবনকে ভিত্তি করে যে পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র নির্মিত হবার কথা ছিল এটা তার একেবারে প্রাথমিক বা প্রস্তুতিপর্বের কাজ।]

অযান্ত্রিক ১৯৫৭-৫৮ সাদা-কালো ৩৫ মিমি ১২০ মিনিট

(Pathetic Fallacy)

প্রযোজনা	এল. বি. ফিল্মস ইণ্টারন্যাশনাল
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
কাহিনী	সুবোধ ঘোষ
আলোকচিত্র	দীনেন গুপ্ত
শিল্প নির্দেশনা	রবি চ্যাটার্জি
সম্পাদনা	রমেশ যোশী
সংগীত	আলি আকবর খান
শব্দগ্রহণ	মৃণাল গুহ ঠাকুরতা ও সত্যেন চ্যাটার্জি
রূপসজ্জা	শক্তি সেন
নৃত্য ও লোকগান	ধুমকুড়িয়ার (রাঁচি) আদিবাসীবৃন্দ রানি খাটাঙ্গা গ্রামের ওরাওঁ গ্রামবাসীরা
সেতার বাদন	নিখিল ব্যানার্জি
বেহালা বাদন	শিশিরকণা ধর চৌধুরী
আদিবাসী-বিষয়ক উপদেষ্টা	জুলিয়াস টিগা
প্রচার পরিকল্পনা	খালেদ চৌধুরী

অভিনয় : জগদ্দল—শেভ্রলে (১৯২০ মডেল) বিমল—কালী ব্যানার্জি, হাসি—কাজল চ্যাটার্জি, সুলতান—শ্রীমান দীপক, গৌর—জ্ঞানেশ মুখার্জি, বুলাকি—কেষ্ট মুখার্জি, মামা—গঙ্গাপদ বসু, তরণী—সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, তুলসী—তুলসী চক্রবর্তী, বচন সিং—পিয়ারা সিং, প্রসাদী—ঝুর্ণি। এ ছাড়া অনিল চ্যাটার্জি, সীতা মুখার্জি, দেবী নিয়োগী, সুশীল রায়, লুথার টিগা ইত্যাদিরা।

মুক্তির তারিখ : ২৩মে, ১৯৫৮

প্রেক্ষাগৃহ : বীণা, বসুশ্রী, অঞ্জন, সীরশ্রী এবং আলোছায়া।

[সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প 'অযান্ত্রিক'-কে সম্প্রসারিত করে রচিত হয় এই ছবির চিত্রনাট্য। ঋত্বিকের জীবনে প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি হল অযান্ত্রিক। এর অন্তর্দৃশ্য টেকনিশিয়ানস স্টুডিয়োতে গৃহীত।] CHEVROLET এর '1920' মডেলটি ব্যবহৃত হয়েছিল 'জগদ্দল' এর ভূমিকায়। ১৯৫৯-এ ছবিটি ভেনিসে স্পেশাল এনট্রি হিসেবে প্রদর্শিত হয়, non-competitive section-এ]

বাড়ি থেকে পালিয়ে ১৯৫৯ সাদা-কালো ৩৫ মি.মি. ১২৪ মিনিট

(The Runaway)

প্রযোজনা	এল. বি. ফিল্মস ইণ্টারন্যাশনাল
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
কাহিনী	দীনেন গুপ্ত
সম্পাদনা	রমেশ যোশী
গীতরচনা ও সংগীত	সলিল চৌধুরী
শিল্প নির্দেশনা	রবি চ্যাটার্জি
শব্দ	মৃণাল গুহ ঠাকুরতা (গ্রহণ) ও সত্যেন চট্টোপাধ্যায় (পুনর্লিখন)
প্রচার পরিকল্পনা	খালেদ চৌধুরী
কণ্ঠ সংগীত	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, সবিতা চৌধুরী
নেপথ্যে-কণ্ঠ	গীতা দে

গানঃ (১) ওরে-ওরে, নরে-নরে, শংকুরে...বুলবুল ভাজা।

(২) ও-আমি অনেক, ঘুরিয়া...কইলকাত্তা।

(৩) মাগো আমায় ডেকোনাকো আর।...

অভিনয় : হরিদাস—কালী ব্যানার্জি, বাবা—জ্ঞানেশ মুখার্জি, মা—পদ্মা দেবী, কাঞ্চন—শ্রীমান পরমভট্টারক লাহিড়ী, জাদুকর—কেষ্ট মুখার্জি, ট্রাফিক পুলিশ—জহর রায়, চন্দন—শ্রীমান দীপক, মিনির বাবা—সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, মিনির মা—নিতি পণ্ডিত, ফেরিওয়ালা—নৃপতি চ্যাটার্জি, মিনি—শ্রীমতী কৃষ্ণজয়া, নন্দ—শৈলেন ঘোষ; এ ছাড়া মহম্মদ ইজরায়েল, মণি শ্রীমাণি, বিজন ভট্টাচার্য, সীতা মুখার্জি, গুপী ব্যানার্জি, বেচু সিংহ, গোপাল চ্যাটার্জি,। শক্তি সেন, সতু মজুমদার এবং সজল রক্ষিত।

মুক্তির তারিখ : ২৪ জুলাই, ১৯৫৯।

প্রেক্ষাগৃহ : মিনার, বিজলী, ছবিঘর।

[অন্তর্দৃশ্য নিউ থিয়েটার্স-এ এবং বহির্দৃশ্য সূর্যপুর ও কলকাতা শহরে গৃহীত। ছবিটির পরিস্ফুটন হয় বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে। ১৯৬০ সালে এই ছবিটি ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে Information section-এ অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রদর্শিত হয়।]

কত অজানারে ১৯৫৯ অসম্পূর্ণ

(Kato Ajanare)

প্রযোজনা	মিহির লাহা
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
কাহিনী	শঙ্কর
আলোকচিত্র	দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদনা	রমেশ যোশী

অভিনয় : শঙ্কর—অনিল চ্যাটার্জি, রেম্পিনী—ছবি বিশ্বাস, বারওয়েল—কালী ব্যানার্জি, ডাচ নাবিক—উৎপল দত্ত; এ ছাড়াও অসীমকুমার, করুণা ব্যানার্জি, গীতা দে প্রমুখরা ছিলেন।

[ছবিটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যক্ত। তবে ছবিটির অধিকাংশ চিত্রগ্রহণই প্রায় হয়ে গিয়েছিল। টেকনিশিয়ানস্ স্টুডিয়োয় অন্তর্দৃশ্য এবং হাইকোর্ট (ভেতরে এবং বাইরে) এলাকায় বহির্দৃশ্য গৃহীত হয়েছিল। সব মিলিয়ে প্রায় কুড়ি দিনের মতো চিত্রগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছিল, কোর্টের দৃশ্যটা বাকি ছিল। যা থেকে প্রায় সাত রিল সম্পাদিত ছবি পাওয়া যায়।]

মেঘে ঢাকা তারা ১৯৬০ সাদা-কালো ৩৫ মি.মি. ১২৬ মিনিট

(The cloud-clapped star)

প্রযোজনা	চিত্রকল্প
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
কাহিনী	শক্তিপদ রাজগুরু
আলোকচিত্র	দীনেন গুপ্ত
সম্পাদনা	রমেশ যোশী
সংগীত	জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র
শিল্প নির্দেশনা	রবি চ্যাটার্জি
রূপসজ্জা	শক্তি সেন

শব্দ	সত্যেন চ্যাটার্জি ও মৃণাল গুহ ঠাকুরতা
প্রচার পরিকল্পনা	রঞ্জিৎকুমার মিত্র
নেপথ্যে কণ্ঠ	এ. টি. কানন, দেবব্রত বিশ্বাস, রণেন রায়চৌধুরী এবং গীতা ঘটক
আবহ সংগীত	বাহাদুর হুসেন খাঁ, লক্ষ্মী ত্যাগরাজন এবং মহাপুরুষ মিশ্র

গান : (১) জয় মাত বিলম তজত...লাগি পতি সখি সন। [সংগ্রহ]
(২) করিম নাম তেরো...। [সংগ্রহ]
(৩) আয় গো উমা কোলে লই...। [সংগ্রহ]
(৪) নিদিয়া ন জগাও রাজা, গারি দুঙ্গী।
(৫) কান্দিয়া আকুল হইলাম...। [সংগ্রহ]
(৬) যে রাতে মোর...। [রবীন্দ্রসংগীত]

অভিনয় : নীতা—সুপ্রিয়া চৌধুরী, শঙ্কর—অনিল চ্যাটার্জ, বংশী দত্ত—জ্ঞানেশ মুখার্জি, তারণ মাস্টার—বিজন ভট্টাচার্য, মা—গীতা দে, গীতা—গীতা ঘটক, মন্টু—হিজু ভাওয়াল, সনৎ—নিরঞ্জন রায়, বাউল—রণেন রায় চৌধুরী। এ ছাড়াও সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, নারায়ণ ধর, কামিনী চক্রবর্তী, আরতি দাস, শক্তি সেন, সুরেশ চ্যাটার্জি, সনৎ দত্ত, দেবী নিয়োগী, মিসেস বোস, মধু ও চন্দন।

মুক্তির তারিখ : ১৪ এপ্রিল ১৯৬০।

প্রেক্ষাগৃহ : শ্রী, প্রাচী ও ইন্দিরা।

কোমল গান্ধার ১৯৬১ সাদা-কালো ৩৫ মি.মি. ১৩৩ মিনিট

(E Flat)

প্রযোজনা	চিত্রকল্প
কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঋত্বিক ঘটক
আলোকচিত্র	দিলীপরঞ্জন মুখার্জি
সম্পাদনা	রমেশ যোশী
শিল্প নির্দেশনা	রবি চ্যাটার্জি
সংগীত	জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র
শব্দ	মৃণাল গুহ ঠাকুরতা, সুজিত সরকার, দেবেশ ঘোষ (অন্তর্দৃশ্য) এবং সত্যেন চ্যাটার্জী (পুনর্লিখন)
প্রচার পরিচালনা	রঞ্জিৎকুমার মিত্র

গীত রচনা	জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সলিল চৌধুরী, বিজন ভট্টাচার্য, সুকান্ত ভট্টাচার্য
লোকসংগীত সংগ্রাহক	হেমাঙ্গ বিশ্বাস, রণেন রায়চৌধুরী
নেপথ্যে কণ্ঠ	দেবব্রত বিশ্বাস, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, প্রীতি ব্যানার্জি সুমিত্রা সেন, বিজন ভট্টাচার্য, মণ্টু ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, রত্না সরকার, শ্রীজাতা চক্রবর্তী, চিত্রা মণ্ডল এবং রণেন রায়চৌধুরী
সরোদ বাদন	ওস্তাদ বাহাদুর খান

গান রেকর্ডিং

(১) হেঁইও হো হেঁইও হো...বদর বদর। কথা ও সুর ঃ জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

(২) এসো মুক্ত করো...এ অন্ধকার। কথা ও সুর ঃ জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

(৩) মিস্তিরি বানাইছে পিঁড়ি...সীতার বিয়া। সংগ্রহ

(৪) আমের তলায় ঝামুর ঝুমুর...দিয়া। সংগ্রহ

(৫) এপার পদ্মা ওপার...শিব সদাগর। কথা ও সুর ঃ হেমাঙ্গ বিশ্বাস

(৬) প্রাণবন্ধু কই বল গো...আমারে। সংগ্রহ

(৭) আকাশ ভরা সূর্যতারা...আমার গান। রবীন্দ্রসংগীত

(৮) (ভাই সব) ঘুরঘুট্টি আন্ধার রাতে...রাতে। কথা ও সুর ঃ বিজন ভট্টাচার্য

(৯) (হায় হায়) নিস লো চেয়ে...না করে। কথা ও সুর ঃ বিজন ভট্টাচার্য

(১০) ওই বুঝি প্রভাতের প্রথম...দেখা যায়। কথা ও সুর ঃ জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

(১১) এই তো ভাল লেগেছিল...আরো বড়ো। রবীন্দ্রসংগীত

(১২) আজ, জ্যোৎস্নারাতে...তাহার মনে। রবীন্দ্রসংগীত

(১৩) অবাক পৃথিবী....সেলাম। কথা : সুকান্ত ভট্টাচার্য সুর : সলিল চৌধুরী।

(১৪) আমি ঝড়ের কাছে....নিশানা। কথা ও সুর ঃ সলিল চৌধুরী।

অভিনয় ঃ অনসূয়া—সুপ্রিয়া চৌধুরী, জয়া—চিত্রা মণ্ডল, শান্তা—গীতা দে, ভৃগু—অবনীশ ব্যানার্জি, ঋষি—অনিল চ্যাটার্জি, শিবনাথ—সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, গগন—বিজন ভট্টাচার্য, স্পিকার—মণি শ্রীমানী, প্রভাত—সত্যব্রত চ্যাটার্জি, দেবু বোস—জ্ঞানেশ মুখার্জি, পাখি—সুনীল ভট্টাচার্য; এ ছাড়াও মণ্টু ঘোষ, হিজু ভাওয়াল, নির্মল ঘোষ, তিলোত্তমা ব্যানার্জি, দেবী নিয়োগী, মহম্মদ ইসরাইল, কেতকী দেবী, নৃপেন চ্যাটার্জি এবং দেবব্রত বিশ্বাস।

মুক্তির তারিখ : ৩১ মার্চ ১৯৬১

প্রেক্ষাগৃহ : রাধা, পূর্ণ, লোটাস এবং পূরবী

[অন্তর্দৃশ্য টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে এবং ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে পরিস্ফুটিত।]

সুবর্ণরেখা ১৯৬২ সাদা-কালো ৩৫ মি.মি. ১৩৯ মিনিট

(The Golden Thread)

প্রযোজনা	জে. জে. ফিল্মস কর্পোরেশন
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
মূল কাহিনী	রাধেশ্যাম ঝুনঝুনওয়ালা
আলোকচিত্র	দিলীপরঞ্জন মুখার্জি
সম্পাদনা	রমেশ যোশী
শিল্প নির্দেশনা	রবি চ্যাটার্জি
রূপসজ্জা	মনতোষ রায়
সংগীত	ওস্তাদ বাহাদুর খান
শব্দ	সত্যেন চ্যাটার্জি, শ্যামসুন্দর ঘোষ এবং জ্যোতি চ্যাটার্জি (নেপথ্যে শব্দ লেখনী)
প্রচার পরিকল্পনা	বাগীশ্বর ঝা ও খালেদ চৌধুরী (টাইট্‌ল লিখন)
নেপথ্য কণ্ঠ :	আরতি মুখার্জি এবং রণেন রায়চৌধুরী

গান : (১) আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র...সকাল বেলা। রবীন্দ্রসংগীত

(২) আলী, দেখা ভোর ভই...কাঁহা জাগে। প্রাচীন ধ্রুপদ সংগ্রহ।

(৩) আজ কী আনন্দ, আজ কী আনন্দ ঝুলত ঝুলনে শ্যামরচন্দ। প্রাচীন রাজপুত সংগ্রহ।

(৪) মোর দুখুয়া কা সে কহুঁ...আজ। প্রাচীন সংগ্রহ।

(৫) খেলন আয়ে হোরী...কুহার ফুহার। প্রাচীন হোরী সংগ্রহ।

অভিনয় : ঈশ্বর—অভি ভট্টাচার্য, হরপ্রসাদ—বিজন ভট্টাচার্য, সীতা (ছোট)—ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী, কৌশল্যা (বাগদি বউ)—গীতা দে, অভিরাম (ছোট)—শ্রীমান অরুণ, বাউল—রণেন রায়চৌধুরী, হরিবাবু—অবনীশ ব্যানার্জি, ম্যানেজার—রাধাগোবিন্দ ঘোষ, সংগীতশিক্ষক—ঋত্বিক ঘটক, সীতা—মাধবী মুখার্জি, অভিরাম—সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, ফোরম্যান মুখার্জি—জহর রায়, অখিলবাবু—উমানাথ ভট্টাচার্য, কাজল দিদি—সীতা মুখার্জি, রামবিলাস—পীতাম্বর, গুরুদেব—অরুণ চৌধুরী, বেণীমাধব—শ্যামল ঘোষাল, বিনু—শ্রীমান অশোক ভট্টাচার্য; এ ছাড়াও বাহাদুর খাঁ, সেকেন্দার আজম, নারায়ন ধর, রবি চ্যাটার্জি, অজিত লাহিড়ী, পীযুষ গাঙ্গুলী, কঙ্কনা জানা ও রুবি মিত্র

মুক্তির তারিখ : ১ অক্টোবর, ১৯৬৫।

প্রেক্ষাগৃহ : বসুশ্রী, বীণা, লোটাস।

[১৯৬২ সালে নির্মিত হলেও নানা রকম বাধা-বিপত্তির দরুন মুক্তি পেতে

তিন বছর সময় লাগে।] রাজশ্রী পিকচার্স মাত্র ৬৫,০০০ টাকায় এই ছবির স্বত্ব কিনে নেয় এবং পরিবেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই ছবির অন্তর্দৃশ্য টেকনিশিয়ানস স্টুডিয়োতে গৃহীত এবং ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে পরিস্ফুটিত।

সিজারস্ ১৯৬২ বিজ্ঞাপন চিত্র

(Scissors)

প্রযোজনা	ইম্পিরিয়াল টোবাকো কোম্পানি
পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
আলোকচিত্র	মহেন্দ্র কুমার

[সুবর্ণরেখা ছবিটি সম্পূর্ণ করার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই ছবিটি নির্মিত হয়।]

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খান

(Ustad Allauddin Khan)

প্রযোজনা	হরিসাধন দাশগুপ্ত
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক

[প্রায় সমগ্র ছবিটির চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত হবার পরে প্রযোজক বলেন আর কাজ করাবেন না। হরিসাধন নিজে একটি ছবি তৈরি করেন, সেইটি পরে মুক্তি লাভ করে।]

বগলার বঙ্গদর্শন ১৯৬৪ অসম্পূর্ণ কাহিনীচিত্র

(Bagalar Banga Darshan)

প্রযোজনা	রমনলাল মাহেশ্বরী
কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
কাহিনীসূত্র	ইতালির ব্রাসেত্তি'র লেখা একটি ঘটনা
আলোকচিত্র	দিলীপরঞ্জন মুখার্জি
সম্পাদনা	রমেশ যোশী
সংগীত	হৃদয়রঞ্জন কুশারী
শিল্প নির্দেশনা	রবি চ্যাটার্জি
স্থির চিত্র	মহেন্দ্র কুমার
নেপথ্যে কণ্ঠ	প্রতিমা বড়ুয়া, আরতি মুখার্জি

অভিনয় : বগলা—সুনীল ভট্টাচার্য, কাঞ্চনমালা—ইন্দ্রাণী মুখার্জি; এ ছাড়াও

ছিলেন পদ্মা দেবী, রেণুকা রায়, জহর রায়, মমতাজ আহমেদ খান, কেষ্ট মুখার্জি, তরুণ ঘোষ, শ্রীমান দীপক।

[ছবিটির চিত্রগ্রহণের কাজ হয়েছিল মাত্র এক সপ্তাহের জন্য। তারপর ছবিটি অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়। সম্প্রতি ঋত্বিক মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উদ্যোগে ছবিটি একটি অবয়ব পেয়েছে। এই সংস্করণটিতে ছবিটির মূল কাহিনী ইংরাজিতে অনুবাদ করে ও সম্পাদনার পরে শ্যুটিং-কৃত অংশ ছয়টি গান (যা আগেই গৃহীত হয়েছিল এই ছবির জন্য) সংযোজন করে ছবিটি চার রিল করা হয়েছে। এই সংস্করণটি এখন প্রদর্শণযোগ্য অবস্থায় বর্তমান।]

ফিয়ার ১৯৬৫ স্বল্পদৈর্ঘ্যের চিত্র কালো-সাদা ৩৫ মি.মি. হিন্দি

(Fear)

প্রযোজনা	ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট, পুনে
কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংগীত ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
আলোকচিত্র	লাল জসোয়ানী
সম্পাদনা	ভিশ্রাম রেভঙ্কর

অভিনয় ঃ বিজ্ঞানের ছাত্র—সুভাষ ঘাই, তার স্ত্রী—সুধা রানী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ মেয়েটি—উর্বশী দত্ত, ধনী লোকটি—গোবর্ধন শর্মা, গ্রামের মেয়েটি—প্রতিমা নায়ক, শান্ত লোকটি—আসরানি, মিউজিসিয়ান—এস শাহ, পকেটমার—এস. দেশাই, বৈজ্ঞানিক—ডি. কে মালহোত্রা, কর্নেল—এ. উমারানী, ক্যাপ্টেন—রণজিৎ কাম্ভ, মাতাল লোকটি—নুরউদ্দীন।

[এই শর্ট ফিল্ম ১৯৬৪-৬৫ সালের—'অভিনয় শিক্ষা' বিভাগের শিক্ষার্থীদের নিয়ে তৈরি করা হয়। পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ছাত্র-ছাত্রীরাই ছিলেন এর অভিনেতা-অভিনেত্রী।]

রাঁদেভু ১৯৬৫ স্বল্প-দৈর্ঘ্যের চিত্র সাদা-কালো ৩৪ মি.মি. হিন্দি

(Rendezvous)

প্রযোজনা	ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট, পুনে
পরিচালনা	রাজিন্দর নাথ শুক্লা
আলোকচিত্র	অমরজিৎ
সংগীত	রামকদম
সম্পাদনা	বিক্রম রাজপুত

অভিনয়	সুধারানী শর্মা, এস দিনকর এবং গোবর্ধন লাল প্রমুখ
তত্ত্বাবধায়ক	ঋত্বিককুমার ঘটক

[১৯৬৫ সালে পুণায় ভাইস প্রিন্সিপাল থাকার সময় ঋত্বিক ঘটকের তত্ত্বাবধানে ইনস্টিটিউটের ছাত্র-ছাত্রীরা এই ডিপ্লোমা ফিল্মটি তৈরি করেন।]

সিভিল ডিফেন্স ১৯৬৫
(Civil Difence)

প্রযোজনা	ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট পুণা
পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক

(ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় তৈরি হয়)।

সায়েন্টিস্টস্ অফ টুমরো ১৯৬৭ সাদা-কালো তথ্যচিত্র
(Scientists of Tomorrow)

প্রযোজনা	ফিল্ম ডিভিশন
কাহিনী, চিত্রনাট্য সংগীত ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
আলোকচিত্র	অমরজিৎ
সম্পাদনা	রমেশ যোশী
ধারাভাষ্য রচনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
ধারাভাষ্য পাঠ	বিজয় মেনন

রঙের গোলাম ১৯৬৮ সাদা-কালো অসম্পূর্ণ কাহিনীচিত্র
(Ranger Golam)

কাহিনী	প্রবোধকুমার সান্যাল
প্রযোজনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
আলোকচিত্র	মহেন্দ্র কুমার
অভিনয়	অনিল চ্যাটার্জি, সীতা মুখার্জি, জহর রায়, শর্বাণী এবং মণি শ্রীমানী

[অতি দ্রুত প্রায় এক সপ্তাহ চিত্রগ্রহণের কাজ হয় বোলপুরের কাছে। ছবিটির এক-চতুর্থাংশ কাজও প্রায় শেষ হয়েছিল। অর্থাভাব এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ঋত্বিক ঘটক ছবিটির কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হন।]

পুরুলিয়ার ছৌ ১৯৭০ সাদা-কালো তথ্যচিত্র ৩৪ মি.মি.

(Chhou Dance of Purulia)

প্রযোজনা	সুমনা ফিল্মস
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
আলোকচিত্র	ধ্রুবজ্যোতি বসু, দীপক বসু ও দীপক দাস
সম্পাদনা	রমেশ যোশী
সংগীত	বাহাদুর খান
ধারাভাষ্য রচনা	ঋত্বিককুমার ঘটক

আমার লেনিন ১৯৭০ সাদা-কালো তথ্যচিত্র ২০ মিনিট

(My Lenin)

প্রযোজনা	সুমনা ফিল্মস
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
আলোকচিত্র	ধ্রুবজ্যোতি বসু ও শক্তি ব্যানার্জি
সংগীত	জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও বিনয় রায়
সম্পাদনা	রমেশ যোশী
নেপথ্য কণ্ঠ	প্রীতি ব্যানার্জি, বিনয় রায়, মন্টু ঘোষ, অণিমা দাশগুপ্ত ও রেবা রায়চৌধুরী।
অভিনয়	অরুণকুমার প্রমুখরা।

তৎকালে ছবিটি ভারতবর্ষে নিষিদ্ধ ছিল। তবে তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ায় এটি প্রদর্শিত ও পুরস্কৃত হয়। লেনিনের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে এই ছবিটি নির্মিত হয়েছিল।

ইয়ে কিঁউ ১৯৭০ সাদা-কালো স্বল্প-দৈর্ঘ্যের চিত্র, হিন্দি

(Why/The question)

প্রযোজনা	চিত্র প্রার্থনা
কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
আলোকচিত্র	মহেন্দ্র কুমার
সম্পাদনা	অমলেশ শিকদার
সংগীত	কমলেশ মৈত্র
নেপথ্য কণ্ঠ	প্রীতি ব্যানার্জী, মন্টু ঘোষ, বাচ্চু রহমান,

অভিনয়	অরুণকুমার, অতনু রায়, মানস দে, রাধাগোবিন্দ ঘোষ, বুলা সেনগুপ্ত।

[এই ছবিটি Ye Kium/Why/Communal Harmony/The question ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত।]

দুর্বার গতি পদ্মা ১৯৭১ আংশিক রঙিন স্বল্পদৈর্ঘ্যের চিত্র ৩৫ মি.মি.

(There flows Padma, The Mother)

প্রযোজনা	ট্রায়ো ফিল্মস
কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক

অভিনয় ঃ বিশ্বজিৎ, শচীন দেব বর্মন, ধর্মেন্দ্র, দিলীপকুমার প্রমুখ প্রায় চল্লিশ জন বোম্বের খ্যাতনামা অভিনেতা অভিনেত্রী।

[বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় নির্মিত এই স্বল্প-দৈর্ঘ্যের চিত্রটির শেষ সিকোয়েন্সটি রঙিন।]

ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭২ অসম্পূর্ণ তথ্যচিত্র

(Indira Gandhi)

প্রযোজক	রাম দাস
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
আলোকচিত্র	এ. কে. গুর্হা (Gurha), ও প্রমোদ মাথুর

[হায়দ্রাবাদে ছবিটির কিছু অংশের চিত্রগ্রহণ হয়। এ ছাড়া কলকাতায় শেখ মুজিবর রহমান ও ইন্দিরা গান্ধীর চিত্রও ময়দানে গৃহীত হয়েছিল। পরে এই প্রকল্পটি পরিত্যক্ত হয়।]

তিতাস একটি নদীর নাম ১৯৭৩ সাদা-কালো ৩৫ মি.মি. ১৫৯ মিনিট

(A River Called Titas)

প্রযোজনা	পূর্ব প্রাণ কথা চিত্র (বাংলাদেশ)
সংগীত চিন্তা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
কাহিনী	অদ্বৈত মল্লবর্মণ
আলোকচিত্র	বেবী ইসলাম
সম্পাদনা	বদির হোসেন
শিল্প নির্দেশনা	মুনসী মহিউদ্দীন

সংগীত	বাহাদুর খান ও আহিদুল হক
মূল নেপথ্য গায়ক	ধীরাজউদ্দীন ফকির
নেপথ্য কণ্ঠ	রথীন্দ্রনাথ রায়, নীনা হামিদ, আবিদা সুলতানা, ধর্মিদান বড়ুয়া।

অভিনয় : বাসন্তী—রোজী সামাদ, রাজার ঝি—কবরী চৌধুরী, বাসন্তীর মা—রউসন জামিল, মুংলি—রাণী সরকার, উদয়তারা—সোফিয়া রুস্তম, কিশোর—প্রবীর মিত্র, রামপ্রসাদ এবং কাদের মিয়া—গোলাম মুস্তাফা, তিলকচাঁদ—ঋত্বিক ঘটক, নিবারণ কুণ্ডু—ফজরুল হাসান বৈরাগী, অনন্ত—সফিকুল ইসলাম, মগন সর্দার—সিরাজুল ইসলাম, মোড়ল—নারায়ণ চক্রবর্তী, বাসন্তীর বাবা—এম. এ. খৈর, সুবলা—চন্দ এবং আরও অনেকে।

বিশ্ব পরিবেশক ঃ ঋত্বিক মেমোরিয়াল ট্রাস্ট।

ভারতীয় পরিবেশক ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

বাংলাদেশে মুক্তি ঃ ২৭ জুলাই ১৯৭৩ ঢাকার মধুমিতা, গুলিস্তান, লায়ন, জোনাকি, মুন, ডায়ানা প্রেক্ষাগৃহে; নারায়ণগঞ্জের হংস, গুলশন এবং চট্টগ্রামের জলসা, সিনেমা প্যালেস এবং লায়ন প্রেক্ষাগৃহে।

ভারতবর্ষে মুক্তির তারিখ ঃ ১১মে, ১৯৯১।

প্রেক্ষাগৃহ ঃ নন্দন, কলকাতা।

যুক্তি তক্কো আর গপ্পো ১৯৭৪ সাদা-কালো ৩৫ মি.মি. ১২০ মিনিট

(Reason, Arguement and Story)

প্রযোজনা	ঋত চিত্র
কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংগীত ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
আলোকচিত্র	বেবী ইসলাম
সম্পাদনা	অমলেশ সিকদার
শিল্প নির্দেশনা	রবি চ্যাটার্জি
শব্দ	শ্যামসুন্দর ঘোষ
নৃত্য পরিচালনা	শম্ভু ভট্টাচার্য
প্রচার পরিকল্পনা	খালেদ চৌধুরী
নেপথ্য কণ্ঠ ঃ	দেবব্রত বিশ্বাস, রণেন রায়চৌধুরী, আরতি মুখার্জি, বীণাপাণি রায়চৌধুরী ও সুশীল মল্লিক

অভিনয় ঃ নীলকণ্ঠ—ঋত্বিক ঘটক, দুর্গা—তৃপ্তি মিত্র, বঙ্গবালা—শাঁওলী মিত্র, জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য—বিজন ভট্টাচার্য, নচিকেতা—সৌগত বর্মন, পঞ্চানন ওস্তাদ—জ্ঞানেশ মুখার্জি, নকশাল নেতা—অনন্য রায়, পুলিশ ইনস্‌পেক্টর—শ্যাম ঘোষাল, সত্য—ঋতবান ঘটক; এ ছাড়াও উৎপল দত্ত, জহর রায়, গোবিন্দ চক্রবর্তী, পার্থপ্রতিম চৌধুরী, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

মুক্তির তারিখ ঃ ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭।

প্রেক্ষাগৃহ ঃ মিনার, বিজলী ও ছবিঘর। কলকাতা

[এটিই ঋত্বিক ঘটকের শেষ কাহিনীচিত্র। ছবিটি মৃত্যুর দেড় বছর পরে মুক্তি পায়। ১৯৭৭-এর ৩০ সেপ্টেম্বর একই দিনে প্রথম ও শেষ ছবি মুক্তি লাভ করে নিউ এম্পায়ার ও পূরবীতে।]

রামকিংকর ১৯৭৫ রঙিন ১৬ মি.মি. অসম্পূর্ণ তথ্যচিত্র

(Ramkinkar)

আর্থিক সহায়তা	মোহন বিশ্বাস
প্রযোজনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
আলোকচিত্র	নির্মল, সুনীল জানা

[সামান্য কিছু দৃশ্য বাদে প্রায় পুরোটাই চিত্রগ্রহণ এবং প্রাথমিক সম্পাদনার কাজ করা হয়েছিল। ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ডট্র্যাকের কাজ শুরু হওয়ার মুখে ঋত্বিককুমার ঘটকের মৃত্যু ঘটে। এই তথ্যচিত্রটি এখনও সাধারণ্যে কোনও ভাবেই প্রদর্শিত হয়নি।]

অন্যের ছবিতে ঋত্বিককুমার ঘটক

চিত্রনাট্য :

মধুমতী/হিন্দি/১৯৫৫/বিমল রায় (পরিচালক)
মুসাফির/হিন্দি/১৯৫৫/হৃষিকেশ মুখার্জি (পরিচালক)
স্বরলিপি/বাংলা/১৯৬১/অসিত সেন (পরিচালক)
কুমারী মন/বাংলা/১৯৬২/চিত্ররথ
দ্বীপের নাম টীয়ারঙ/বাংলা/১৯৬২/গুরু বাগচী
রাজকন্যা/বাংলা/১৯৬২/সুনীল ব্যানার্জি
হীরের প্রজাপতি (১৯৬৬)

অভিনয় :

তথাপি/১৯৫০/মনোজ ভট্টাচার্য [মুক ও বধির বিদ্যালয়ের সুপারিন্‌টেনডেন্ট-এর ভূমিকা]

তিতাস একটি নদীর নাম (১৯৭৩)

ছিন্নমূল/১৯৫১/নিমাই ঘোষ

কুমারী মন/১৯৬২/চিত্ররথ

যুক্তি তক্কো গপ্পো (১৯৭৪)

সহকারী পরিচালক ঃ চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

তথাপি/১৯৫০/মনোজ ভট্টাচার্য

ঋত্বিক বিষয়ক তথ্যচিত্র ও দূরদর্শন চিত্র

বিস্ফোরণ/পরিচালনা সোমনাথ মুখার্জি ও সমীর চক্রবর্তী।

ঋত্বিককুমার ঘটক : পোট্রেট অফ এ ডিরেক্টর—দূরদর্শন প্রযোজিত, রমেশ শর্মা পরিচালিত এবং ন্যাশনাল নেটওয়ার্ক প্রদর্শিত। প্রথম প্রদর্শন : ২৬ আগস্ট, ১৯৯০ রবিবার সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে।

ঋত্বিক রচিত চিত্রনাট্য বা চিত্রনাট্যর খসড়া

সাত লহরী (১৯৫৬), যাদের কেউ মনে রাখে না (১৯৫৬), রাজা—হিন্দি (১৯৫৬), নতুন ফসল (১৯৫৭), অমৃত কুম্ভের সন্ধানে (১৯৫৭), অকাল বসন্ত (১৯৫৭), আর্জান সর্দার (১৯৫৮), বলিদান (১৯৬২), আরণ্যক (১৯৬৩), নস্কী কাঁথার মাঠ (১৯৬৩), শ্যাম সে নেহা লাগেই—ভোজপুরী (১৯৬৪), জন্মভূমি/পণ্ডিতমশাই (১৯৬৫), চতুরঙ্গ (১৯৬৬), হীরের প্রজাপতি (১৯৬৬), সংসার সীমান্তে (১৯৬৮), ভিয়েতনাম নিয়ে যে ছবি করতে চাই (১৯৬৮), কুমারসম্ভবের অষ্টম সর্গ (১৯৬৯), সেই বিষ্ণুপ্রিয়া (১৯৭৪)। ম্যানিকুইন (১৯৭৪), হাত, বুদ্ধু ভুতুম/প্রিন্সেস কলাবতী (১৯৭৫) এবং লজ্জা (১৯৭৫)।

ঋত্বিক ঘটককে কী কেবল তাঁর চলচ্চিত্র দিয়ে বিচার করা যাবে? বোধ হয়, না। এই ব্যক্তি মানুষটিকে সব চাইতে নিকট থেকে দেখেছেন তাঁর জীবনসঙ্গিনী সুরমা ঘটক।

সুরমা ঘটক বাম আন্দোলনে এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। নারী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে তিনি কারান্তরালে কাটিয়েছেন দীর্ঘদিন। তাঁর বই **'শিলং জেলের ডায়েরী'** থেকে সেইসব দিনের কাহিনি জানা যায়।

আর সেই প্রেক্ষিত থেকেই **'ঋত্বিক'** নামক এক সংগ্রামী চলচ্চিত্র—ব্যক্তিত্বকেই তিনি দেখেন নি, দেখেছেন এক বিদ্রোহী মানুষকে যাকে একদিন বামপন্থীরাও স্বস্তিতে থাকতে দেয় নি। সেইসব দলিল, আর ঋত্বিকের জীবন নিয়ে দুটি বই। একটি **'ঋত্বিক'** ও আর একটি **'পদ্মা থেকে তিতাস'**। ঋত্বিককে জানতে হলে **'ঋত্বিক'** ও অন্য বইটিও পড়তে হবে।

বাংলা চলচ্চিত্রকে যে সামান্য কয়েকজন গরিমামণ্ডিত করেছেন ঋত্বিক ঘটক তাঁদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিত্ব। ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র প্রয়াসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দেশভাগ, দেশত্যাগের এবং চল্লিশ-পঞ্চাশের ভারতের এক কঠিন ইতিহাস। সেই ইতিহাসের এক খণ্ড-প্রকাশ ঋত্বিকের জীবন, তাঁর সংগ্রাম, তাঁর শৈল্পিক অভিব্যক্তি ও বিকাশ। ঋত্বিক বাঙালীর কাছে এক অসম্পূর্ণ প্রতিভার প্রকাশ। অগোছালো, বাউণ্ডুলে এই মানুষটির জীবন ও তাঁর জীবনকে ঘিরে বিভিন্ন ঘটনার ইতিবৃত্ত রচনা করে চলেছেন সুরমা ঘটক। অনুষ্টুপ থেকে ঋত্বিকের জীবনের ঘটনা ও তাঁকে ঘিরে নানা বিতর্ক নিয়ে তথ্যমূলক একটি বই ১৯৯৫ সালেই প্রকাশিত হয়েছে। বইটির নাম **'পদ্মা থেকে তিতাস'**।

১৯৭৭ সালে প্রকাশিত **'ঋত্বিক'**-এর অনুষ্টুপ সংস্করণ প্রকাশিত হল ১৯৯৬ সালের বইমেলায়। দুটি বই একত্র করলে ঋত্বিককে যেমন কিছুটা বোঝা যায়, তেমন বোঝা যায় সেই সময়ের ইতিহাস ও তাঁর যন্ত্রণাকে। **'ঋত্বিক'** এই বইটিতে সুরমা ঘটক আলেখ্য রচনা করেছেন সেই মানুষটির যাঁকে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন। সঙ্গে সঙ্গে নির্মোহভাবে তিনি তুলে ধরেছেন সব তথ্য। লেখিকা হিসেবে এক মহান দায়িত্ব পালন করেছেন সুরমা ঘটক।

ISBN 81-85479-55-0

9 788185 479552

দাম : ১৫০